.... কে
উপহার দিলাম।

উপহারদাতা : ....
তারিখ : ....

স্বত্বাধিকারী–
নাম : ....
গ্রাম/মহল্লা : ....
থানা : ....
জেলা : ....

www.maktabatulabrar.com

বিশেষ দ্রষ্টব্য

মাকতাবাতুল আবরার-এর যাবতীয় প্রকাশনা "আল-কুরআন পাবলিকেশন্স" (যাত্রাবাড়ি বড় মাদ্রাসা সংলগ্ন কিতাব মার্কেট) থেকেও একই মূল্যে (পাইকারি/খুচরা) সংগ্রহ করা যায়।

ফোন : ০১৭৬৪-১৮৫৬৫৪

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

চিন্তা-চেতনার ভুল

রচনা
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
লেখক, আহকামে যিন্দেগী, ফাযায়েলে যিন্দেগী,
ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, ইসলামী মনোবিজ্ঞান,
ফিকহুন্ নিছা, বয়ান ও খুতবা প্রভৃতি

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

www.maktabatulabrar.com

চিন্তা-চেতনার ভুল

রচনা
মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রকাশকাল
আগস্ট ২০১৭ ইংরেজি, যিলকদ ১৪৩৮ হিজরী

সর্বস্বত্ব
লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার, ঢাকা
: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

মূল্য: ২০০ (দু'শ) টাকা মাত্র

Chinta-Chetonar Bhul
(Wrong in Think and Conciousness)
Written by Maolana Md. Hemayet uddin in bengali
Published by Maktabatul Abrar
Islami Tower, 11/1 Banglabazar, Dhaka-1100

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সূচিপত্র

বিষয়বস্তু — পৃষ্ঠা নং

লেখকের কথা.. ০৯

প্রথম অধ্যায়

- চিন্তা-চেতনার পরিচয়...১১
- চিন্তা-চেতনার উপর ইসলামের নিয়ন্ত্রণ ১৩
- চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব ১৪
- চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়...................................১৫
- কীভাবে চিন্তা-চেতনা ভুল পথে চালিত হয় ২৭

অতিমাত্রায় বিজ্ঞানমনস্কতা.......................................২৭
ইসলামের পাশ্চাত্যায়ন-চিন্তা ২৯
ইসলামের সাম্প্রতিকায়ন-চিন্তা ২৯
মুক্তচিন্তার নামে লাগামহীন চিন্তা.................................৩১
সহজিয়া পন্থার সন্ধান...৩৪
খাহেশাতকে সামনে রেখে চিন্তাকে অগ্রসর করা ৩৪
চার দলীলের বাইরে অন্য কোন দলীলের ভিত্তিতে কোন কিছু চিন্তা করা.........৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

- জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা বড় ভুল চিন্তা ৪০
- জীবনে বড় হতে চাওয়ার চিন্তায় কিছু ভুল ৪২
- ধন-সম্পদ বিষয়ক কিছু ভুল চিন্তা ৪৭
- দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত কিছু ভুল চিন্তা ৫২
- নব বধুদের কিছু ভুল চিন্তা ৫৯
- সন্তানাদির বিষয়ে কিছু ভুল চিন্তা ৬২
- ব্যবসায়ীদের কিছু ভুল চিন্তা ৬৭
- চাকরিজীবিদের কিছু ভুল চিন্তা ৭০
- যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় না.................৭৪

পরিবার ও সমাজে আদব-কায়দা ও মুরব্বী মান্যতার বিষয়....... ৭৪
লজ্জা-শরম প্রসঙ্গ ৮৫

- যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ নয়, অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় ৮৬

যিনি যে শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ তাকে শুধু সে শাস্ত্রেই বিশেষজ্ঞ ভাবা উচিত অন্য শাস্ত্রে নয়.. ৯২

- যাকে উন্নতির নিয়ামক ভাবা হয় অথচ তা অবনতির কারণ কিংবা ভাবা হয় অবনতির কারণ অথচ তা উন্নতির নিয়ামক............. ৯৪

উন্নতি বা অবনতি কাকে বলে? ৯৫
কোন্টা উন্নতি আর কোন্টা অবনতি–এ বিরোধ নিস্পত্তির উপায়...... ৯৭
উন্নতির নিয়ামক ও অবনতির কারণ................................ ৯৯

- যা ভাবা হয় কঠিন অথচ তা সহজ ১০১

'কঠিন' ও 'সহজ'–এর সংজ্ঞা ১০১
শরীয়তের বিধান কি কঠিন? ১০৩
নজর হেফাজত করা কি কঠিন? ১০৩
সুদ ঘুষ থেকে বেঁচে থাকা কি কঠিন? ১০৪
শরীয়তের বিভিন্ন বিধান কঠিন বোধ হওয়ার কিছু কারণ.......... ১০৫

- যা ভাবা হয় সহজ অথচ তা কঠিন ১০৭

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ঘাটিগুলো কি সহজ? ১০৮
কুরআনের তাফসীর করা কি সহজ? ১০৯
ইজতিহাদ করা বা মুজতাহিদ হওয়া কি সহজ? ১১০
কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া কি সহজ? ১১১

- যা মনে করা হয় ভাল অথচ তা মন্দ ১১২
- যা মোটাকথা, তবুও অনেকের মাথায় ঢোকে না.................. ১১৯
- বহু চিন্তা-ভাবনা করেও যেসব বিষয়ের কুল-কিনারা করা যায় না........... ১৩০

আল্লাহর সত্তার বিষয় নিয়ে ভেবে কুল কিনারা করা যায় না....... ১৩০
তাকদীর নিয়ে ভেবে কুল-কিনারা করা যায় না..................... ১৩৪
জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের আযাবের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে ভেবে কুল-কিনারা করা যায় না....................................... ১৩৭

- যেসব বিষয় নিয়ে ভাবা উচিত কিন্তু ভাবা হয় না ১৩৯

মৃত্যু তথা পরকাল নিয়ে ভাবা উচিত.............................. ১৩৯
নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ভাবা উচিত.............................. ১৪০
ঈমান-আমলের উন্নতি নিয়ে ভাবা উচিত ১৪১

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

শুধু নিজেকে নিয়ে নয় অন্যকে নিয়েও ভাবা উচিত ১৪২
● যা নিয়ে ভাবা উচিত নয় কিন্তু অনেক ভাবা হয়.....................১৪৩
অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে খুব ভাবা উচিত নয় ১৪৩
ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা নিয়ে ভাবার দরকার নেই......... ১৪৫
ঈমান-বিরোধী ভাবনা উচিত নয় ১৪৮
কারও ক্ষতি বা পাপের চিন্তা উচিত নয়.............................১৪৯
● যা আগেভাগেই জেনে নেয়া হয় না, বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায় ১৪৯
ছাত্র জীবনের গুরুত্ব ১৫০
যৌবনের গুরুত্ব ১৫১
স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করার কলা-কৌশল ১৫২
দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর করার কলা-কৌশল.................................১৫৩
সন্তানকে গড়ে তোলার নিয়ম-নীতি ১৫৫
স্বামী-স্ত্রীর কদর..১৫৭
পিতা-মাতার কদর...১৫৮
জ্ঞানী-গুণীদের কদর..১৫৯
● জেনে-বুঝেও যা করা হয় না...১৬০
* ব্যক্তিগত জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না..........১৬১
ছাত্রজীবনের মূল্যায়ন...১৬১
পরীক্ষার অনেক আগ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন ১৬২
শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই পাঠদানে যথাযথ গতি আনয়ন............১৬২
যৌবনে ইবাদত-বন্দেগী...১৬৩
আগামীর চক্করে না পড়া..১৬৩
কতক্ষেত্রে মানুষ আগামীর চক্করে পড়ে থাকে ১৬৩
* পারিবারিক জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না ১৬৫
রাগের মাথায় পারিবারিক পদক্ষেপ নেয়া....................................১৬৫
শুরু থেকেই স্ত্রী সন্তানদেরকে দ্বীনের পথে চালানো.....................১৬৬
পরিবারের একে অপরকে সালাম প্রদান ১৬৬
* রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না ১৬৭
বিশেষ ক্ষমতা আইন রহিত করা ১৬৭

www.maktabatulabrar.com

পুলিশ রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধ করা ১৬৭
ক্রস ফায়ার নামক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা ১৬৮
হরতাল- অবরোধ নিষিদ্ধ করা... ১৬৯
মহিলা গৃহকর্মী বিদেশে পাঠানো বন্ধ করা ১৭০
● জেনে-বুঝেও যা বলা হয় না ১৭২
বর্তমান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান গোষ্ঠি বিশেষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস.. ১৭৩
আলেম সমাজ আদৌ সন্ত্রাসী বা জঙ্গী নন......................... ১৭৪
মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী তৈরি হয় না... ১৭৫
ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিত............................. ১৭৬
বহু পুরুষ নারী কর্তৃক নির্যাতিত হয়............................... ১৭৭
নারী নেতৃত্ব ইসলামে সমর্থিত নয়.................................. ১৭৯
মসজিদ-মাদ্রাসার স্টাফদের বেতনে অবিচার চলছে ১৭৯
তবুও বলতে হয় তুমি কত ভাল!.................................... ১৮২
● যা মনে হয় বুঝি আসলে বুঝি না.................................. ১৮৭
● না বুঝে দৌড়-ঝাপ দেয়ার প্রবণতা ১৯০
● যাদের বন্ধু ভাবা হয় আসলে বন্ধু নয় ১৯৩
● যেগুলো শেখা ফরয/ওয়াজিব অথচ সেগুলো শেখার প্রয়োজনই বোধ করা হয় না... ১৯৫
আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা করা প্রসঙ্গ ১৯৫
কুরআন মাজীদ পাঠ শিক্ষা করা প্রসঙ্গ ১৯৬
তায্কিয়া তথা আধ্যাত্মিক সাধনা প্রসঙ্গ ১৯৬
● যেগুলো যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন কিন্তু প্রয়োজন মনে করা হয় না.. ২১৫
ওয়াজ-নসীহত, বইপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফেসবুক প্রভৃতি থেকে ধর্মীয় বিষয় শেখার ক্ষেত্রে করণীয় ২১৫
● গ্রন্থপঞ্জী ২২৯

সূচি সমাপ্ত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

লেখককের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم.

نحمده ونصلي علي رسوله الكريم، أما بعد!

চিন্তা-চেতনা মানুষের সব কর্মকাণ্ডের গোড়ার জিনিস। মানুষ যা কিছুই করে, কোন না কোন চিন্তা-চেতনা থেকেই তা করে। মানুষের উঠাবসা, চলাফেরা, বলা-কওয়া, লেনদেন, আচার-আচরণ সবকিছুর পেছনেই কোন না কোন চিন্তা-চেতনা সক্রিয় থাকে। চিন্তা-চেতনা ভাল হলে তা থেকে উৎসারিত হয় কোন ভাল কর্ম, আর চিন্তা-চেতনা মন্দ হলে তা থেকে উৎসারিত হয় কোন মন্দ কর্ম। তাই জীবনকে ভাল কর্মে মণ্ডিত করতে চাইলে চিন্তা-চেতনা ভাল করা বৈ গত্যন্তর নেই। এজন্য জানা দরকার কোন্ চিন্তা-চেতনা সঠিক আর কোন চিন্তা-চেতনা বে-ঠিক।

"চিন্তা-চেতনার ভুল" গ্রন্থটি মূলত ভুল চিন্তা-চেতনাকে চিহ্নিত করে তা থেকে বেঁচে থাকা এবং সংশ্লিষ্ট স্থানে সঠিক চিন্তা-চেতনা কি তা জেনে সেভাবে চিন্তা-চেতনাকে দোরস্ত করে নেয়ার মাধ্যমে জীবনকে ভাল কর্মে মণ্ডিত করার উদ্যোগ থেকেই রচিত। আমাদের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনের অনেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন রকম ভুল চিন্তা-চেতনা রয়েছে। সেই সব ভুল চিন্তা-চেতনা চিহ্নিত করে তা থেকে বেঁচে থাকতে পারলে আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনের অনেক কিছুই

www.maktabatulabrar.com

সুকর্মে মণ্ডিত হবে, ভুল চিন্তা-চেতনা জনিত কুকর্মের ক্ষতি থেকে রক্ষা পাবে এই আশা নিয়েই "চিন্তা-চেতনার ভুল" গ্রন্থটি রচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার বিষয়টি একটি মৌলিক বিষয়। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ হিসেবে "চিন্তা-চেতনার ভুল" শীর্ষক এ গ্রন্থটি জীবনের জন্য একটি মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ বিবেচিত হওয়ার কথা। বিজ্ঞ পাঠকমণ্ডলীর নিকট গ্রন্থটি সেভাবে বিবেচিত হলে এবং এর দ্বারা সকলে কাংখিত উপকার লাভে সক্ষম হলে আমি আমার প্রয়াস সফল হয়েছে মনে করব।

আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করছি তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবূল করেন এবং এই ক্ষুদ্র গ্রন্থটি দ্বারা সকলের জীবনের কাংখিত উপকার সাধন করেন। আমীন!

বিনীত

(মাওলানা) মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

২৫ রমজান, ২০১৭ ইংরেজি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

প্রথম অধ্যায়
চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি প্রসঙ্গ

চিন্তা ও চেতনার পরিচয়

শুরুতে "চিন্তা" ও "চেতনা" শব্দ দু'টোর অর্থ ও উভয়ের মধ্যকার পার্থক্য সম্বন্ধে একটু জেনে নিতে হয়। প্রথমে চেতনা তারপর চিন্তা শব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করা হচ্ছে।

"চেতনা" শব্দটি মূলত উদ্ভূত হয়েছে চেত থেকে। চেত থেকে চেতন (চেত+অন=চেতন), চেতন থেকে চেতনা (চেতন+আ=চেতনা)। চেত অর্থ চিত্ত, মন, হৃদয়, অন্তকরণ। এ থেকে শব্দটি যখন হয় চেতন তার অর্থ হয় মনের বা হৃদয়ের জীবন্ত হওয়া, সজীব হওয়া। তাই জাগ্রত অবস্থাকে বলা হয় চেতন, কেননা জাগ্রত অবস্থায়ই মন সজীব তথা সক্রীয় থাকে। জাগ্রত অবস্থায় যেহেতু টের পাওয়া যায়, তাই চেতন পাওয়া অর্থ টের পাওয়া। আর টের পাওয়া অর্থ হুঁশ হওয়া, জ্ঞান হওয়া, সংজ্ঞা পাওয়া, অনুভূতি লাভ হওয়া। চেতনা শব্দটি এই হুঁশ, জ্ঞান, সংজ্ঞা ও অনুভূতি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

www.maktabatulabrar.com

"চিন্তা" অর্থ ভাবনা। এই চিন্তা বা ভাবনা হচ্ছে চিন্তন ক্রিয়াকে এগিয়ে নেয়া। চিন্তন অর্থ মনকে চালানো। অতএব চিন্তা অর্থ হচ্ছে মন চালানোর কাজকে এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া বিশেষ তথা মনের মধ্যে যে হুঁশ, জ্ঞান, সংজ্ঞা ও উনুভূতির জাগরণ ঘটে সেগুলোকে করণীয় গন্তব্যে এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া। এই হুঁশ, জ্ঞান, সংজ্ঞা ও অনুভূতিকে যেহেতু চেতনা বলা হয় আর চিন্তা হচ্ছে এগুলোকেই এগিয়ে নেয়া, তাই বলা যায় **চিন্তা হচ্ছে চেতনাকে এগিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া**। অনেক সময় কোন কিছু নিয়ে চিন্তা করার পরও ভিন্ন একটা চেতনা জাগ্রত হতে পারে, সেই হিসেবে কিছু চেতনা চিন্তার পরবর্তী স্তরও হয়ে থাকে। তবে সেই চেতনার পরও সেটাকে এগিয়ে নেয়ার জন্য চিন্তার প্রক্রিয়া চলমান থাকে। তাই সার্বিক বিবেচনায় চেতনা হচ্ছে চিন্তার পূর্ববর্তী স্তর।

বস্তুত চিন্তার চেয়ে চেতনার জন্ম হয় আগে। আগে চেতনা তারপর চিন্তা। যেমন আপনার মধ্যে ক্ষুধার অনুভূতি জাগল, অর্থাৎ আপনার ক্ষিদে পেল, এটা হচ্ছে একটা চেতনা। এই চেতনা জাগ্রত হওয়ার পর আপনার মন এই চেতনাকে এগিয়ে নিল অর্থাৎ কীভাবে ক্ষুধা নিবারণ করা যায়, তার ব্যবস্থা কি হবে, কখন ক্ষুধা নিবারণ করতে হবে ইত্যাদি নিয়ে ভাবল, এই ভাবনা তথা চেতনাকে এগিয়ে নেয়ার কাজটিই হচ্ছে চিন্তা। আরও একটা উদাহরণ দেয়া যাক। মনে করুন- দূর থেকে মনে করছেন সামনে রাস্তার উপর একটা রশি পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখলেন ওটা রশি নয় একটা সাপ। তখন আপনার মধ্যে হুঁশ জাগ্রত হল। এই হুঁশটা হচ্ছে একটা চেতনা। তারপর এই হুঁশ মোতাবেক আপনার যা করণীয় সে কাজটিকে এগিয়ে নেয়ার কথা ভাবলেন যে, এখন কীভাবে আত্মরক্ষা করতে হবে, আস্তে করে পাশ কেটে চলে যেতে হবে, না দৌড় দিতে হবে, না কি সাপটাকে কোনভাবে মেরে ফেলতে হবে। এই ভাবনাটা হচ্ছে চিন্তা।

এই চিন্তা বা ভাবনা স্তর, গভীরতা কিংবা প্রকার ভেদে কখনও হয় স্বাভাবিক মনন, কখনও হয় ধ্যান, কখনও একাগ্রচিত্তে স্মরণ, কখনও উদ্বেগ, কখনও আশংকা ইত্যাদি। তাই চিন্তা শব্দটির অর্থে মনন, ধ্যান, একাগ্রচিত্তে স্মরণ, উদ্বেগ, আশংকা ইত্যাদিও লেখা হয়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

চিন্তা-চেতনার উপর ইসলামের নিয়ন্ত্রণ

ইসলাম শরীরের জাহিরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেমন বিভিন্ন বিধি-বিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করেছে, মনকে তথা মনের চিন্তা-চেতনাকেও নিয়ন্ত্রণ করেছে। জাহিরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেমন যা ইচ্ছা তা করার জন্য বল্গাহীন ছেড়ে দেয়নি, মনের চিন্তা-চেতনাকেও যা ইচ্ছা তা চিন্তা করা, যেভাবে ইচ্ছা চেতনাকে পরিচালিত করা যাবে– এমন বল্গাহীন ছেড়ে দেয়নি। তাই মনের চিন্তা-চেতনাকে ইসলামের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, লাগামহীন ছেড়ে দেয়া যাবে না।

মনের উপরও তথা মনের সাথে সংশ্লিষ্টও ইসলামের অনেক বিধান রয়েছে। মন অহংকার করতে পারবে না এটা মনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিধান। মন হিংসা করতে পারবে না এটাও মনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিধান। মন কারোর ভাল কিছু দেখে হিংসা বা পরশ্রীকাতরতা বোধ করতে পারবে না এটাও মনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিধান। মন কোন পাপের চিন্তা করতে পারবে না এটাও মনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিধান। মন কারও ক্ষতির চিন্তা করতে পারবে না এটাও মনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিধান। দ্বীনের কাজ করার ক্ষেত্রে মন মানুষকে খুশি করার চিন্তা রাখতে পারবে না এটাও মনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিধান। এভাবে পদে পদে মনের উপর তথা মনের সাথে সংশ্লিষ্ট বহু বিধান রয়েছে। মনের সাথে সংশ্লিষ্ট এসব বিধি-বিধানের মাধ্যমে মন তথা মনের চিন্তা-চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। বরং জাহিরী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিধানের চেয়ে মনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিধি-বিধানের গুরুত্ব বেশি তথা মনের চিন্তা-চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করার গুরুত্ব বেশি। কারণ মন হল দেহের সম্রাট। সম্রাট যদি ঠিক হয়ে যায়, তাহলে পুরো রাজত্ব ঠিক হয়ে যায়। যেমন দেশের সম্রাট তথা পরিচালক ঠিক হয়ে গেলে গোটা দেশ ঠিক হয়ে যায়। পরিচালক গোষ্ঠির মধ্যে গলদ থাকলে গোটা সমাজের মধ্যে, গোটা

www.maktabatulabrar.com

দেশের সমস্ত মানুষের মধ্যে গলদ এসে যায়। তদ্রূপ মনের মধ্যে তথা মনের চিন্তা-চেতনার মধ্যে গলদ থাকলে সবকিছুর মধ্যে গলদ এসে যায়। তাই চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব অনেক।

নিম্নে চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু কথা পেশ করা হল।

চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব

মানুষ যদি পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হতে চায়, তাহলে প্রথমে তাকে নিজের মনকে দ্বীনদার বানাতে হবে। অর্থাৎ, নিজের মন-মানসিকতা, নিজের চিন্তা-চেতনা ও নিজের বিচার-বিবেচনা– এগুলোকে দ্বীনের আলোকে ঢেলে সাজাতে হবে। এভাবে মন যদি দ্বীনদার হয়ে যায়, তাহলে মানুষ দ্বীনদার হতে পারবে। আর মন যদি দ্বীনের চেতনায় গড়ে না ওঠে, তাহলে সে দ্বীনদার হতে পারবে না। ইসলাম তাই প্রথমে মনকে দোরস্ত করার উপর জোর দিয়েছে। হাদীছে এসেছে, রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري برقم ٥٢)

অর্থাৎ, জেনে রাখ! তোমার দেহের মধ্যে যে একটা গোস্তের টুকরা আছে সেটা যদি ঠিক হয়ে যায় তাহলে তোমার গোটা দেহ ঠিক হয়ে যাবে। আর সেটা যদি ঠিক না থাকে, তাহলে তোমার গোটা দেহ নষ্ট হয়ে যাবে। জেনে রাখ সেটা হল হৃৎপিণ্ড। (বোখারী: হাদীছ নং ৫২)

এখানে বোঝানো হয়েছে হৃৎপিণ্ড ঠিক না থাকলে যেমন গোটা দেহ অঠিক হয়ে যায়, কারণ হৃৎপিণ্ড হল গোটা দেহের পরিচালক। তদ্রূপ ঐ হৃৎপিণ্ডে অবস্থিত মন হল গোটা চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার পরিচালক, সেই মন ঠিক না হলে চিন্তা-চেতনা এবং মন-মানসিকতাও ঠিক হবে না। আর চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা ঠিক না হলে মানুষ ঠিক হবে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

চিন্তা-চেতনা মানুষের সবকিছুর পরিচালক। মানুষ যা কিছুই করে, কোন না কোন চিন্তা-চেতনা থেকেই তা করে। ক্ষুদার চেতনা থেকে খাদ্য গ্রহণ করে, রোগ নিরাময়ের চিন্তা থেকে চিকিৎসা গ্রহণ করে, জীবন-জীবিকার চিন্তা থেকে কর্মস্থলে গমন করে, আবার বিশ্রাম গ্রহণ, নিদ্রা গমন ও জীবনোপভোগের চিন্তায় বাসস্থলে ফিরে আসে। এভাবে যা কিছুই মানুষ করে সবকিছুই কোন না কোন চিন্তা-চেতনা থেকেই করে। উঠাবসা, চলাফেরা, বলা-কওয়া, লেনদেন, আচার-আচরণ সবকিছুর পেছনেই কোন না কোন চিন্তা-চেতনা সক্রিয় থাকে। প্রত্যেকটা ছন্দ-পতনের পেছনেই কোন না কোন চিন্তা-চেতনা সক্রিয় থাকে। ভাল বা মন্দ যা কিছুই করে তার পেছনে কোন না কোন চিন্তা-চেতনা সক্রিয় থাকে। চিন্তা-চেতনা ভাল হলে তা থেকে উৎসারিত হয় কোন ভাল কর্ম, আর চিন্তা-চেতনা মন্দ হলে তা থেকে উৎসারিত হয় কোন মন্দ কর্ম। তাই জীবনকে ভাল কর্মে মণ্ডিত করতে চাইলে চিন্তা-চেতনা ভাল করা বৈ গত্যন্তর নেই। জীবনের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে চিন্তা-চেতনা নিয়ন্ত্রণ করা বৈ গত্যন্তর নেই। তাই চিন্তা-চেতনার বিভ্রান্তি দূর করার তথা চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব অপরিসীম।

নিম্নে চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায় সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিত আলোচনা পেশ করা হল।

চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়

চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করা বলতে বোঝায় দ্বীনের আলোকে চিন্তা-চেতনাকে গড়ে তোলা, দ্বীনের আলোকে চিন্তা-চেতনাকে ঢেলে সাজানো। আর দ্বীনের আলোকে চিন্তা-চেতনাকে গড়ে তুলতে চাইলে এবং দ্বীনের আলোকে চিন্তা-চেতনাকে ঢেলে সাজাতে হলে মৌলিকভাবে যে কয়টা কাজ করতে হবে তা হচ্ছে–

১। যুক্তির ভিত্তিতে নয় কুরআন সুন্নাহর কথার ভিত্তিতে চিন্তা-চেতনাকে পরিচালিত করতে হবে।

কুরআন সুন্নায় বর্ণিত অনেক কিছু সাধারণ যুক্তির বাইরে মনে হয়, এ ক্ষেত্রে যুক্তিতে ধরে না বলে চিন্তাকে তার বিরুদ্ধে পরিচালিত করা

www.maktabatulabrar.com

যাবে না। যেমন আল্লাহ তা'আলার অস্তিত্বে বিশ্বাস করা কুরআন সুন্নায় বর্ণিত সবচেয়ে মৌলিক বিষয়। এ বিষয়টা যুক্তিতে নাও ধরতে পারে। মনে হতে পারে সবকিছুর একজন সৃষ্টিকর্তা আছে এবং থাকতে হয়, অথচ আল্লাহ তা'আলার কোন সৃষ্টিকর্তা নেই। তাহলে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্তা ছাড়া কীভাবে হয়ে গেলেন? এভাবে এ বিষয়টা যুক্তিতে না ধরলেও আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এবং চিন্তা-চেতনাকে সেভাবে পরিচালিত করতে হবে। আল্লাহ তা'আলার অস্তিতের বিষয়টা যুক্তিতে না ধরলেও (যদিও তারও যুক্তি আছে।) চিন্তাকে আল্লাহর অস্তিত্ব না থাকার দিকে পারিচালিত করা যাবে না। এমনিভাবে ফেরেশতা, জান্নাত, জাহান্নাম, কবরের আযাব, পুলসিরাত, আমলের ওজন হওয়া ইত্যাদি ঈমান-সংক্রান্ত বিষয়াদি যুক্তিতে না ধরলেও আমাদেরকে মেনে নিতে হবে এবং চিন্তা-চেতনাকে সেভাবে পরিচালিত করতে হবে। যুক্তিতে ধরে না বলে এগুলো অবিশ্বাস করার দিকে চিন্তাকে পরিচালিত করা যাবে না।

২। কুরআন-সুন্নাহর বিষয়াদিকে বস্তুর ভিত্তিতে বিচার করা ছাড়তে হবে।

আমাদের চিন্তা-চেতনার একটা মৌলিক গলদ হল আমরা সবকিছু বস্তু দিয়ে বিচার করি। অথচ দ্বীনের এমন অনেক বিষয় রয়েছে যা বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগীর ব্যতিক্রম। সেগুলোকে বস্তুর ভিত্তিতে চিন্তা করা তথা বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগিতে বিচার করা গলদ। বস্তুবাদী দৃষ্টিভংগিতে বিচার করলে সেগুলো সঠিক বলে মনে হবে না, তবুও সেগুলো বিশ্বাস করতে হবে। মনের মধ্যে বস্তুর ভিত্তিতে সবকিছুর বিচার করার প্রবণতা থাকলে সেই প্রবণতা তথা গলদকে দূর করতে হবে। চিন্তা-চেতনার মৌলিক ভিত্তি পাল্টে ফেলতে হবে।

আমরা সবকিছু বস্তু দিয়ে বিচার করি। কিন্তু ইসলাম সবকিছুকে বস্তুর ভিত্তিতে বিচার করেনি। যেমন– মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্মানী কে– এ বিষয়টা আমরা বিচার করি বস্তু দিয়ে। তাই যার টাকা-পয়সা, অর্থকড়ি সবচেয়ে বেশি, সমাজে যার প্রভাব-প্রতিপত্তি সবচেয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বেশি, সমাজে যার পদ সবচেয়ে বড় তাকেই আমরা সবচেয়ে সম্মানী মনে করি। এভাবে বিষয়টাকে আমরা বস্তু দিয়ে বিচার করি। কিন্তু কুরআনে কারীম বলেছে,

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বড় পরহেযগার সে হল তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সম্মানী ব্যক্তি। (সূরা হুজুরাত: ১৩)

দুনিয়াতে ধনী বা গরীব কে তা আমরা বিচার করি বস্তু দিয়ে অর্থাৎ, অর্থকড়ি দিয়ে, টাকা-পয়সা দিয়ে। যার টাকা-পয়সা, অর্থকড়ি আছে তাকে আমরা ধনী মনে করি, আর যার টাকা-পয়সা, অর্থকড়ি নেই তাকে গরীব মনে করি। অথচ ইসলাম কি বলছে শুনুন। হাদীছে এসেছে–

عن أبي هُريرةَ – رضي الله عنه – : أنَّ رسولَ الله – صلى الله عليه وسلم – قَالَ : « أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ ؟» قالوا : المفْلسُ فِينَا رسول الله مَنْ لا دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاع ، قَالَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم : «المُفْلسُ مِنْ أُمَّتي مَنْ يأتي يَومَ القيامَةِ بصلاةٍ وصيامٍه وزكاته ، ويأتي قَدْ شَتَمَ هَذَا ، وقَذَفَ هَذَا ، وَأَكَلَ مالَ هَذَا ، وسَفَكَ دَمَ هَذَا ، وَضَرَبَ هَذَا ، فيقعد فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا، أُخِذَ مِنْ خَطَاياهُم فَطُرِحَ عَلَيهِ ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ ».(رواه الترمذي برقم ٢٤١٨ وقال : هذا حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা গরীব কাকে মনে কর? সাহাবায়ে কেরাম বললেন ইয়া রসূলাল্লাহ! গরীব তো সেই, যার দেরহাম-দীনার নেই অর্থাৎ, যার টাকা-পয়সা নেই। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, (না, তোমাদের চিন্তার ভিত্তি এখনও ঠিক

www.maktabatulabrar.com

হয়নি।) গরীব হল সেই, যে কেয়ামতের দিন উপস্থিত হবে এমন অবস্থায় যে, সে নামায পড়ে এসেছে, রোযা রেখে এসেছে, যাকাত দিয়ে এসেছে কিন্তু আবার গোনাহের কাজও করে এসেছে– কাউকে গালি দিয়ে এসেছে, কারও প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে এসেছে, অন্যায়ভাবে কারও মাল গ্রাস করে এসেছে, অন্যায়ভাবে কারও রক্তপাত করে এসেছে, অন্যায়ভাবে কাউকে আঘাত করে এসেছে। তখন যাদেরকে গালি দিয়েছে, যাদের উপর জুলুম করে এসেছে, তাদেরকে এর নেকি দিয়ে দেয়া হবে। দিতে দিতে যখন তার নেকী আর অবশিষ্ট থাকবে না, তখন তাদের গোনাহ এর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে একে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। (এ-ই হল আসল গরীব।)

{তিরমিযী: হাদীছ নং ২৪১৮}

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ."(رواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, টাকা-পয়সা সামান বেশি থাকলে ধনী হওয়া যায় না। বরং মনের ধনী হওয়াই আসল ধনী হওয়া। (তিরমিযী)

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে– কারও কাছে টাকা-পয়সা থাকলেই সে ধনী নয়। বরং যার মন ধনী, আল্লাহ যা দিয়েছেন তাতেই যে তৃপ্ত, সেই আসল ধনী।

আমরা বস্তু দিয়ে ভাল-মন্দ বিচার করি। তাই যদি কেউ তার মেয়েকে এমন ছেলের কাছে বিয়ে দিতে পারে যার একটা বড় চাকরি আছে, যার অনেক টাকা-পয়সা আছে, গাড়ী-বাড়ি আছে, তাহলে মনে করে মেয়েকে ভাল বিয়ে দিতে পারলাম, সুন্দর বিয়ে দিতে পারলাম। ছেলেকে বিয়ে করানোর সময়ও এরকম মনে করা হয়। ভাল টাকা-পয়সাওয়ালা বা পার্থিব মর্যাদাওয়ালার মেয়ে আনতে পারলে আমরা মনে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করি ছেলেকে ভাল বিয়ে করাতে পারলাম, সুন্দর বিয়ে করাতে পারলাম। অথচ গরীবের দ্বীনদার মেয়ে আনতে পারলে সেটাকে কামিয়াবী মনে করি না। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কী বলেছেন, নারীকে বিয়ে করা হয় অনেক কিছু দেখে– টাকা-পয়সা দেখে, রূপ সৌন্দর্য দেখে, বংশ দেখে। আবার দ্বীনদারী দেখেও বিয়ে করা হয়। এভাবে অনেক কিছু দেখেই বিয়ে করা হয়। কিন্তু তোমরা দ্বীনদারীর দিকটাকে প্রাধান্য দিয়ো। বোঝানো হয়েছে, দ্বীনদারী দেখে বিয়ে দিতে পারলে সেটাই হবে সফল বিয়ে। দ্বীনদারীর বিষয়টা দেখা বর্জন করে বিয়ে হলে সেটা সফল বিয়ে নয়, সেটা ভাল বিয়ে নয়। কাজেই কোন্ বিয়ে ভাল? যে বিয়েতে দ্বীনদারী আছে। কোন্ সন্তান ভাল? যে সন্তান দ্বীনের লাইনে চলে। যে সন্তান দ্বীনের উপর চলে সে সন্তান আমার জন্য ভাল, যদিও সে আয়-উপার্জন কম করতে পারে।

৩। পূর্বসূরীদের চিন্তার আলোকে চিন্তা করতে হবে।

চিন্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে কিতাবুল্লাহ তথা আল্লাহর কিতাব– কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে চিন্তাকে চালাতে হবে পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যার আলোকে। আহ্‌লে হকের চিন্তাধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তারা কিতাবুল্লাহ ও রিজালুল্লাহ উভয়কে ভিত্তি করে কুরআন-হাদীছ অনুধাবন, মাসলাক-মাশরাব নির্ধারণ ও চিন্তা-চেতনাকে পরিচালিত করে থাকেন। তারা কিতাবুল্লাহ তথা কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীছকে বাদ দিয়ে যেমন কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুকরণে লিপ্ত হয়ে সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্যুত হন না, তেমনিভাবে রিজালুল্লাহ তথা হক্বপন্থী আস্‌লাফ ও পূর্বসূরীদেরকে বাদ দিয়ে নিজেদের খেয়াল খুশিমত কুরআন-হাদীছ অনুধাবন করেও সিরাতে মুস্তাকীম থেকে বিচ্ছিন্ন হন না। তারা রিজালুল্লাহ তথা আস্‌লাফ এবং পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যা ও নীতির আলোকে কুরআন হাদীছ অনুধাবন করে থাকেন। তারা কিতাবুল্লাহ্‌র ভিত্তিতে রিজালুল্লাহ্‌কে বিচার করেন এবং সেই রিজালুল্লাহর আশ্রয়ে কুরআন-হাদীছ অনুধাবন ও হেদায়েত সন্ধান করেন।

বাতিল ফির্‌কাসমূহের মতবাদ ও চিন্তাধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পূর্বসূরী ও আসলাফের কৃত কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা এবং

www.maktabatulabrar.com

তাদের অনুসৃত নীতি ও চিন্তাধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বল্গাহীনভাবে নিজেদের চিন্তাকে পরিচালিত করাই তাদের অধিকাংশ দলের গোমরাহীর মূল কারণ।

সঠিক পথে থাকার জন্য কিতাবুল্লাহ্‌র সাথে সাথে রিজালুল্লাহ্‌কেও আকঁড়ে থাকার অপরিহার্যতা বুঝে আসে সূরা ফাতেহার নিম্নোক্ত আয়াতদ্বয় থেকে–

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.﴾

অর্থাৎ, আমাদেরকে পরিচালিত কর সঠিক পথে– তাদের পথে যাদেরকে তুমি এনআম দিয়েছ।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, সিরাতে মুস্তাকীম বা সঠিক পথের পরিচয় দিতে গিয়ে রিজালুল্লাহর পথের কথা বলা হয়েছে, এতে বুঝা যায় হক পথে থাকতে হলে কিতাবুল্লাহর সাথে সাথে রিজালুল্লাহ্‌কেও আকঁড়ে থাকতে হবে। কিতাবুল্লাহকে বুঝতে হবে রিজালুল্লাহ্‌র আলোকে।

৪। চিন্তা-চেতনা দোরস্ত হওয়ার দুআ করা।

চিন্তা-চেতনা দোরস্ত হওয়া ও দোরস্ত থাকার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতে হবে। কেননা মনের উপর আমাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। কখন মনের মধ্যে কোন্ ধরনের চিন্তা-চেতনা জাগ্রত হয় এবং কোন্ দিকে মনের ঝোঁক প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তা নিয়ন্ত্রণ করা এত সহজ বিষয় নয়। বস্তুত: মন সম্পূর্ণ আল্লাহর নিয়ন্ত্রণে। তাই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনকে আল্লাহর আনুগত্যের দিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করতেন। মুসলিম শরীফের হাদীছে এসেছে–

« إِنَّ قُلُوبَ بَنِى آدمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ».

(صحيح مسلم برقم ٢٦٥٤)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, বনী আদমের সমস্ত অন্তর দয়াময় আল্লাহর দুই আঙ্গুলের মাঝে একটা অন্তরের মত, যেভাবে তিনি চান সেভাবে তাকে ঘুরান। তারপর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে অন্তরসমূহ ঘুরানেওয়ালা! তুমি আমাদের অন্তরসমূহকে তোমার আনুগত্যের উপর ঘুরিয়ে আন।

৫। চিন্তার মধ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

চিন্তা-চেতনাকে দোরস্ত করতে চাইলে চিন্তার ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। সব ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি বর্জন করতে হবে। ইসলামে আকীদা, আমল ও কর্মপদ্ধতি সব ধরনের চিন্তাতে মধ্যমপন্থা তথা ভারসাম্য রয়েছে, কোথাও বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি নেই। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا.﴾

অর্থাৎ, আমি তোমাদেরকে বানিয়েছি মধ্যপন্থী উম্মত।

(সূরা বাকারা: ১৪৩)

মধ্যমপন্থা গ্রহণ করার অর্থ কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি না করা বরং মাঝামাঝি পন্থা গ্রহণ করা তথা ভারসাম্য অবলম্বন করা। মূলত ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস ও আমল সব ক্ষেত্রেই রয়েছে ভারসাম্য। কোনো ক্ষেত্রেই বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যেমন:

*** আল্লাহ্র সত্তার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রে ভারসাম্য**

আল্লাহর সত্তার প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা একেবারে খোদাকেই স্বীকার না করার মত ছাড়াছাড়ি করে, তারা হল নাস্তিক। আর যারা খোদাকে স্বীকার করে কিন্তু একাধিক খোদাকে স্বীকার করে, তারা বাড়াবাড়ি করে। যেমন: খৃষ্টান, ইয়াহুদী ও হিন্দু সম্প্রদায় এরূপ বাড়াবাড়ির শিকার।

www.maktabatulabrar.com

*** রিসালাতের ক্ষেত্রে ভারসাম্য**

রেসালাতের প্রতি ঈমানের ক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য– বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। রসূলদের ব্যাপারে আগের যুগেও বাড়াবাড়ি-ছাড়াছাড়ি ছিল এখনও আছে। খৃষ্টানরা হযরত ঈসা (আ.)কে খোদা বা খোদার পুত্র সাব্যস্ত করে তাঁর ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করেছিল। ইয়াহুদীরা হযরত ওযায়ের (আ.)কে আল্লাহ্র পুত্র বলে বাড়াবাড়ি করেছিল। পক্ষান্তরে যারা নবী রসূলদেরকে অমান্য করেছে, এমনকি নবীদেরকে হত্যা পর্যন্ত করেছে, তারা নবীদের ক্ষেত্রে ছাড়াছাড়ি করেছে।

এক শ্রেণীর লোক রয়েছেন যারা বলেন রসূল মানুষ নন, তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর খোদার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই বলতে চান, তারা বাড়াবাড়িতে আছেন। যেমন: দেওয়ানবাগীর পীর এবং তার অনুসারীরা বলে থাকেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, তিনি মানুষ ছিলেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحٰى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلٰهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ.﴾

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, আমি তো তোমাদের মত মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ।

(সূরা কাহাফ: ১১০)

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা সরাসরি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে খোদা বলেন না, তবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এমন বিষয় আরোপ করেন যা আল্লাহ্র জন্য খাস বিষয়, যেমন: তারা বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন অর্থাৎ, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অদৃশ্যের কথা জানেন। এভাবে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে বাড়াবাড়ি করে তাকে খোদার স্তরে পৌঁছে দেন।

*** ইবাদতের ক্ষেত্রে ভারসাম্য**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য– বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা মনচাহী যিন্দেগী চালায়, খাহেশাতের যিন্দেগী চালায়, তারা ছাড়াছাড়ি করে, যাদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

﴿الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا.﴾

অর্থাৎ, তারা ক্রিড়া-কৌতুককে তাদের ধর্ম বানিয়েছে এবং পার্থিব জীবন তাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। (সূরা আ'রাফ: ৫১)

আবার যদি কেউ ইবাদতে লিপ্ত হয়ে, দ্বীনী কাজে লিপ্ত হয়ে বিবি বাচ্চার খোঁজ-খবর রাখা পর্যন্ত ছেড়ে দেন, কিংবা বিয়ে-শাদী পর্যন্ত না করতে চান, তাহলে সেটাও হবে এক ধরনের বাড়াবাড়ি। এ শ্রেণীর লোকেরা হচ্ছে সন্যাসী গোছের লোক। ইসলামে সন্যাসবাদ নেই। এক হাদীছে এসেছে, একদিন হযরত উছমান ইবনে মাজউন (রা.)-এর স্ত্রী খাওলা বিনতে হাকীম অপরিপাটি কাপড়-চোপড় পরিহিত অবস্থায় হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.)-এর নিকট এলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এ অবস্থা কেন? খাওলা উত্তর দিলেন, আমার স্বামী সারাদিন রোযা রাখেন, সারা রাত নফলে লিপ্ত থাকেন, (আমি সেজেগুঁজে থাকব কার জন্য?) হযরত আয়েশা (রা.) বিষয়টি নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অবহিত করলেন। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হযরত উছমান ইবনে মাজউনকে বললেন,

يا عثمان! إِنَّ الرَّهْبَانِيَّةَ لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْنَا أَمَا لَكَ فِيَّ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

(ابن حبان برقم ٩)

অর্থাৎ, হে উছমান! আমাদেরকে সন্যাসবাদের বিধান দেয়া হয়নি। আরে তোমার জন্য কি আমার মধ্যে উত্তম আদর্শ নেই?

(সহীহ ইবনে হিব্বান: হাদীছ নং ৯)

ইসলামে কোন সন্যাসবাদ নেই। বরং ইবাদতও করতে হবে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘর-সংসার এবং সমাজের সাথে সম্পর্ক সামঞ্জস্যও রাখতে হবে। বিবি বাচ্চার খোঁজ-খবরও রাখতে হবে, তাদের হক আদায় করতে হবে, তাদের ব্যাপারে ইসলাম যে দায়িত্ব অর্পন করেছে তাও পালন করতে হবে।

*** সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ভক্তির ক্ষেত্রে ভারসাম্য**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য– বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা বাড়াবাড়ি করেছে, –যেমন: এক দল গালী শীআ (কট্টর শীআ)

www.maktabatulabrar.com

হযরত আলী (রা.)কে অতি ভক্তির কারণে খোদা পর্যন্ত বলে ফেলেছিল– তারা বাড়াবাড়ি করে হকপন্থী জামাআত থেকে বের হয়ে গেছে। আবার একদল লোক (যারা "শীআ" নামে পরিচিত) হযরত আলী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের সদস্য হেতু তাঁর প্রতি অতিভক্তিতে বলে ফেলেছে যে, হযরত আলী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর প্রথম খলীফা হওয়ার যোগ্য, যেহেতু তিনি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পরিবারের লোক। এভাবে বাড়াবাড়ির কারণে তারা হকপন্থী দল থেকে বের হয়ে গেছে।

শীআ সম্প্রদায় হযরত আলী (রা.)-এর প্রতি অতিভক্তির কারণে একদিকে বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়েছে, আবার তিন খলীফাসহ অন্য অনেক সাহাবীর ব্যাপারে কঠোর সমালোচনায় জড়িত হয়ে ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়েছে। এভাবেও তারা হকপন্থী জামাআত থেকে বের হয়ে গেছে। আবার কোন এক ঘটনার প্রেক্ষিতে কতিপয় খারিজী হযরত আলী (রা.)কে কাফের পর্যন্ত বলে ফেলেছিল, এরাও সাহাবীর ব্যাপারে ছাড়াছাড়িতে লিপ্ত হয়ে হকপন্থী দল থেকে বের হয়ে গেছে।

*** উলামায়ে কেরামের প্রতি ভক্তি ও তাঁদের অবস্থান সম্বন্ধে ভারসাম্য**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য– বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। এ ক্ষেত্রেও আহ্‌লে হক ভারসাম্যনীতি বজায় রাখেন। এর বিপরীত যারা উলামায়ে কেরামকে একেবারেই মানেননা, অহেতুক তাঁদের সমালোচনায় লিপ্ত হন, তারা আলেম সমাজের ব্যাপারে ছাড়াছাড়িতে আছেন। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান তবে জ্ঞানীজনকে জিজ্ঞাসা কর।

(সূরা নাহ্‌ল: ৪৩)

আবার একদল লোক আছেন, যারা কোন আলেম বা পীর-ভক্তির ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করে তাদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলেছেন। যেমন করেছিল ইয়াহুদীরা। তাদের সম্পর্কে কুরআনে কারীমে এসেছে–

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ.﴾

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ্কে ছেড়ে তাদের ধর্মীয় পণ্ডিত ও দরবেশদেরকে খোদা বানিয়ে নিয়েছে। (সূরা তাওবা: ৩১)

এখানে বোঝানো হয়েছে, তারা তাদের ধর্মীয় নেতাদেরকে খোদা বানিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ, খোদার কথা যেমন বিনা যুক্তিতে মানতে হয়, কোন বিচার-বিবেচনা ছাড়াই মানতে হয়, তারা ধর্মীয় গুরুদের বেলায়ও তা-ই করে।

*** পীর মাশায়েখ ও বুযুর্গদের ব্যাপারে ভারসাম্য**

পীর মাশায়েখ ও বুযুর্গদের ক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য। বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। যারা মনে করেন পীর না ধরলে মুক্তি নেই, তারা বাড়াবাড়িতে আছেন। পীর ধরা ফরয/ওয়াজিব নয়, পীরের হাতে বায়'আত হওয়া ফরয/ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে কোন কোন সাহাবী বায়'আত হয়েছেন এই মর্মে যে, আমরা শির্ক করব না, যেনা করব না, চুরি করব না, কোন পাপ কাজ করব না, ভাল কাজ করব ইত্যাদি। এটাকে বায়'আতে সুলূক বলা যায়। কোন কোন সাহাবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাতে এরূপ বায়'আত হয়েছেন আবার অনেকে হননি। বায়'আত হওয়া ফরয/ওয়াজিব হলে সব সাহাবীই বায়'আত হতেন। পীর মাশায়েখ হলেন রূহানী ডাক্তার। তাঁরা হলেন আধ্যাত্মিক চিকিৎসক। আধ্যাত্মিক রোগ-ব্যধির চিকিৎসার জন্য তাদের স্মরণাপন্ন হতে হয়। এখন কেউ যদি নিজেই নিজের আত্মিক রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার করার পদ্ধতি নির্বাচন করতে সক্ষম হন তাহলে তার পক্ষে পীর ধরা জরুরী নয়। তবে অনেক সময়ই নিজের রোগ নিজে নির্ণয় করা কঠিন হয়ে থাকে তাই হক্কানী উপযুক্ত পীর ধরা উপকারী।

আবার কেউ যদি মনে করেন পীর ধরলে পীর-মাশায়েখ মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করে বা কবরে হাশরে মুরীদদেরকে তা'লীম ও তাল্‌কীন দিয়ে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করবেন, যেমন মাইজভাণ্ডারী ও আটরশির পীরদ্বয় মনে করেন, তাহলে সেটাও হবে পীর মাশায়েখ সম্বন্ধে

www.maktabatulabrar.com

বাড়াবাড়িমূলক ধারণা এবং কুরআন-হাদীছ বিরোধী ধারণা। কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে,

﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.﴾

অর্থাৎ, কেউ কারও পাপের বোঝা বহন করবে না।

(সূরা আন্‌আম: ১৬৪)

কেউ নিজে আমল করে নিজের নাজাতের ব্যবস্থা করতে না পারলে কোনো পীর তাকে নাজাত দিতে পারবে না। কোন পীর তো রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বড় হতে পারে না। স্বয়ং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর গোত্র বনূ হাশেম, বনূ আব্দিল মুত্তালিব ও নিজ কন্যা ফাতেমাকে ডেকে তাদেরকে নিজেদের নাজাতের ব্যবস্থা নিজেদেরকে করতে বলেছেন। ইরশাদ করেছেন,

«يَا بَنِى هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا ».

অর্থাৎ, হে বনী হাশেম! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর। হে বনূ আব্দিল মুত্তালিব! তোমরা নিজেদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর। হে ফাতেমা! তুমি নিজকে জাহান্নাম থেকে রক্ষার ব্যবস্থা কর, আমি আল্লাহ্‌র আযাব থেকে তোমাকে রক্ষায় কিছুই করতে পারব না।

(মুসলিম: হাদীছ নং ২০৪)

আবার যারা মনে করেন পীর-মাশায়েখের কাছে যাওয়ার কোনো দরকারই নেই, তারা ছাড়াছাড়িতে রয়েছেন।

*** অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারসাম্য**

এক্ষেত্রেও রয়েছে ভারসাম্য– বাড়াবাড়িও নেই ছাড়াছাড়িও নেই। ইসলাম সাম্যবাদের ন্যায় ব্যক্তি-মালিকানাকে একেবারে অস্বীকারও করেনি, আবার পুঁজিবাদের ন্যায় অবাধ ও বল্গাহীন মালিকানাকেও প্রশ্রয়

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দেয়নি। বরং হালাল-হারামের বন্ধনী এটে দিয়ে বল্গাহীন সম্পদ অর্জনের পথকে রুদ্ধ করেছে। আবার ধনীর সম্পদে গরীব মিসকীনের অধিকার প্রবর্তিত করে সর্বশ্রেণীর মাঝে সম্পদ আবর্তিত হওয়ার ব্যবস্থা করেছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ.﴾

অর্থাৎ, যাতে কেবল তোমাদের মধ্যকার বিত্তবান লোকদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন করতে না থাকে। (সূরা হাশ্‌র: ৭)

এমনিভাবে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-আমল, মু'আমালা-মু'আশারা ইত্যাদি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইসলামের সবকিছুতে মধ্যমপন্থা তথা ভারসাম্য রয়েছে। অতএব চিন্তা-চেতনাকে দোরস্ত করতে চাইলে ইসলাম ও দ্বীনের সাথে সংশ্লিষ্ট সবকিছুকে ভারসাম্যের সাথে চিন্তা-বিবেচনা করতে হবে, যেখানে চিন্তার মধ্যে না থাকবে বাড়াবাড়ি না থাকবে ছাড়াছাড়ি, না থাকবে অতিরঞ্জন না থাকবে প্রান্তিকতা।

কীভাবে চিন্তা-চেতনা ভুল পথে চালিত হয়

পূর্বের পরিচ্ছেদে চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করা ও দোরস্ত রাখার গুরুত্ব এবং চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এবার আমরা আলোচনা করব সঠিক চিন্তা-চেতনা থেকে কীভাবে সরে যাওয়া হয়। অর্থাৎ, চিন্তা-চেতনা কীভাবে ভুল পথে চালিত হয়।

চিন্তা-চেতনায় কয়েকটা মৌলিক গলদ থাকার কারণে ইসলামী চিন্তা-চেতনা ভুল পথে চালিত হয়। নিম্নে এরূপ ছয়টা মৌলিক গলদ সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করা হল।

অতিমাত্রায় বিজ্ঞানমনস্কতা

ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় বিজ্ঞানমনস্কতা একটা মৌলিক গলদ। এই অতিমাত্রায় বিজ্ঞানমনস্কতার কারণে বহু মানুষ ইসলামের অনেক কিছুর বিকৃত ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং হয়ে থাকে। বিজ্ঞানের সামনে পরাভূত হয়ে ইসলামের কোন কিছুকে সে আলোকে

www.maktabatulabrar.com

ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। অনেকে বিজ্ঞানের সামনে পরাভূত হয়ে আম্বিয়ায়ে কেরামের মু'জিযা এবং আউলিয়ায়ে কেরামের কারামতকে অস্বীকার বা তার বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে হক্ক থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

ইসলামে বিজ্ঞানমনস্কতা সমূলে নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে সমূহ সমস্যার কারণ ঘটে। বিজ্ঞানমনস্কতা কতটুকু মাত্রায় অনুমোদিত এবং কোন্ মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে অনুমোদনের গণ্ডি পেরিয়ে যায় এ সম্বন্ধে মুফতী শফী সাহেব (রহ.) মাআরিফুল কুরআনে যা বলেছেন তার সারকথা হল–

১. বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য যদি চাক্ষুসভাবে সত্য ও বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে তার আলোকে কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যা দেয়া যেতে পারে। তবে উল্লেখ্য যে, চাক্ষুসভাবে সত্য ও বাস্তব বলে যেসব বিষয় প্রমাণিত হয় ইসলামের কোন তথ্যের সঙ্গে তার সংঘর্ষ থাকে না। কারণ ইসলামে অসত্য ও অবাস্তব কোন কিছু বর্ণিত হয়নি বরং কুরআন হাদীছের সবকিছুই সবকিছুর রহস্য সম্বন্ধে সম্যক অবগত মহাজ্ঞানী ও হেকমতের অধিকারী সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আগত। তাই সেগুলো অসত্য বা অবাস্তব হওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এবং আজ পর্যন্ত কেউ প্রমাণ করতেও পারেনি এবং কোনদিন পারবেও না যে, কুরআন হাদীছের কোন প্রতিষ্ঠিত বিষয় বৈজ্ঞানিকভাবে অসত্য ও অবাস্তব বলে সাব্যস্ত হয়েছে। তবে হাঁ এতটুকু হতে পারে যে, কুরআন হাদীছের কোন প্রতিষ্ঠিত বিষয় বৈজ্ঞানিকভাবে এখনও প্রমাণিত হয়নি। সেক্ষেত্রে বলা হবে, বিজ্ঞান এখনও সেগুলো উদঘাটন করতে পারেনি।
২. বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য যদি কুরআন হাদীছের সুস্পষ্ট ভাষ্যের বিপরীত হয়, তাহলে তার ভিত্তিতে কুরআন হাদীছের কোন বিষয় অস্বীকার করা যাবে না বা তার আলোকে কুরআন হাদীছের প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়ের অন্যরকম ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। বরং সেক্ষেত্রে মুমিনের এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, বৈজ্ঞানিক এ তথ্য যেহেতু কুরআন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য-বিরোধী তাই বৈজ্ঞানিক এ তথ্য সঠিক নয়, বরং কুরআন হাদীছের বক্তব্যই সঠিক। বুঝতে হবে বিজ্ঞান এ ব্যাপারে এখনও চূড়ান্তে উপনীত হতে পারেনি।

৩. বৈজ্ঞানিক কোন তথ্য যদি এমন হয়, যে ব্যাপারে কুরআন হাদীছে স্পষ্ট কোন ভাষ্য আসেনি, যে ব্যাপারে কুরআন হাদীছের বক্তব্য স্পষ্ট নয়, সেরূপ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সেই তথ্যকে আমরা অস্বীকারও করব না, আবার অতি বিশ্বাসবশত কুরআন-হাদীছের কোন তথ্যকে সে অনুযায়ী অকাট্যভাবে ব্যাখ্যা দিতেও যাব না।

ইসলামের পাশ্চাত্যায়ন-চিন্তা

ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যায়ন-চিন্তাও একটা মৌলিক গলদ। এই চিন্তা ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ভুল পথে চালিত করে। পাশ্চাত্য চিন্তায় অতিমাত্রায় প্রভাবিত হওয়ার কারণে যারা ইসলামের কোন আকীদা-বিশ্বাস বা ইসলামী চিন্তা-চেতনা বা ইসলামী রীতিনীতিকে দুমড়ে-মুচড়ে পাশ্চাত্য চিন্তার সমান্তরালে আনার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়, যাতে পাশ্চাত্যের লোকেরাও ইসলামের বিরোধিতা না করে, তাদের সে প্রচেষ্টা ঈসলামে স্বীকৃত নয়। ইসলামের আকীদা-বিশ্বাস, রীতিনীতি সবকিছুর স্বকীয়তা রয়েছে, সেই স্বকীয়তা বজায় রেখে পাশ্চাত্য চিন্তার অনুকূল কোন অভিব্যক্তি বা ব্যাখ্যা অবলম্বন করলে ততটুকুর অবকাশ আছে বলা যেতে পারে।

ইসলামের সাম্প্রতিকায়ন-চিন্তা

ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকায়ন-চিন্তাও একটা মৌলিক গলদ। এই চিন্তা ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ভুল পথে চালিত করে। যুগের পরিবর্তনে ইসলামী দর্শনের ব্যাখ্যা ও শরীয়তের কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা যেতে পারে, তবে তা কোনক্রমেই ইসলামীদর্শন ও কর্মপদ্ধতির মূল কাঠামোকে বিকৃত করে নয়। যুগের হাওয়ায় পরাভূত হয়ে সেই পরাভূত মানসিকতা নিয়ে কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা দেয়ার অবকাশ নেই। আহ্‌লে হক পরাভূত মানসিকতা নিয়ে

www.maktabatulabrar.com

কুরআন-হাদীছের ব্যাখ্যা দেন না। যুগের হাওয়া ও প্রগতির সামনে পরাভূত হয়ে কেউ কেউ ফটোকে জায়েয বলেছেন, কেউ কেউ নারী নেতৃত্বকে বৈধ বলে চালানোর চেষ্টা করেছেন। এভাবে পরাভূত মানসিকতার কারণে তারা হক্ক থেকে বিচ্যুত হয়েছেন।

চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সাম্প্রতিকায়ন-এর আর একটা বড় উদাহরণ হল "ইসলামী গণতন্ত্র" কথাটা। সম্প্রতিকালে পৃথিবীতে গণতন্ত্রের সর্বজনগ্রহণতা দেখে সেই গণতন্ত্র-এর সাথে "ইসলামী" কথাটা যোগ করে ইসলামী গণতন্ত্র বানিয়ে ফেলা হয়েছে। অথচ প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামী রাষ্ট্রনীতিতে মৌলিক ও ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। তদুপরি প্রচলিত "গণতন্ত্র" একটা ঈমান-আকীদা ও ইসলামী নীতিমালা বিরোধী ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ পরিভাষা। অতএব এ পরিভাষার সঙ্গে ইসলামী শব্দটি যোগ করলেই তা ইসলামে স্বীকৃত বলে গণ্য হতে পারে না।

প্রচলিত গণতন্ত্র ও ইসলামী রাষ্ট্রনীতির মৌলিক পার্থক্য এবং প্রচলিত গণতন্ত্র–এর ঈমান-আকীদা ও ইসলামী নীতিমালা বিরোধী হওয়ার বিষয়টা কীভাবে তা লক্ষ করুন। ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি নেই। একমাত্র জনগণ কর্তৃকই নির্বাচিত হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। বরং ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি রয়েছে। যেমন: রাষ্ট্রপ্রধান ইশারা-ইংগিতে হোক বা স্পষ্টভাষায় হোক পরবর্তী রাষ্ট্রপ্রধান মনোনয়ন করে যেতে পারেন, যথাযথ কর্তৃত্বসম্পন্ন জনপ্রতিনিধি দ্বারাও সরকার প্রধান নির্বাচিত হতে পারে, ইত্যাদি। এর বিপরীত প্রচলিত গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপ্রধান বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে একমাত্র পদ্ধতি হল জনগণকর্তৃকই নির্বাচিত হওয়া। অতএব প্রচলিত গণতন্ত্র এবং ইসলামের মধ্যে এই একটা বিরাট মৌলিক ব্যবধান রয়েছে। তদুপরি প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা হয় এবং জনগণকর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইনের অথরিটি মনে করা হয়। আর জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান-পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ্‌কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয়। আর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অথরিটি বলে স্বীকার করা ঈমান-আকীদা বিরোধী। তাই প্রচলিত গণতন্ত্র-এর ধারণা কোনোভাবেই ইসলামে স্বীকৃত নয়। "ইসলামী গণতন্ত্র" বলে কোন কথা ইসলামে নেই। সাম্প্রতিকায়ন চিন্তা থেকেই "ইসলামী গণতন্ত্র"–এর ধারণা জন্ম নিয়েছে।

রয়ে গেল ইসলামের দৃষ্টিতে প্রচলিত গণতন্ত্রে অসুবিধার যে দিকগুলো রয়েছে সেগুলো বাদ দিয়ে যে ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে অসুবিধা থাকে না সেই ব্যাখ্যা অনুসারে গণতন্ত্রকে ইসলামী পরিভাষা হিসেবে গ্রহণ করা যাবে কি না সেই প্রশ্ন। এ ক্ষেত্রে কথা হল ঈমান-আকীদা ও ইসলামী নীতিমালা বিরোধী ধ্যান-ধারণায় সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে এটাকে কিছু ব্যাখ্যা সাপেক্ষেও ইসলামী পরিভাষা হিসাবে গ্রহণ করা ঠিক হবে না।

মুক্তচিন্তার নামে লাগামহীন চিন্তা

ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে তথাকথিত মুক্তচিন্তাও একটা মৌলিক গলদ। এই তথাকথিত মুক্তচিন্তা ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ভুল পথে চালিত করে। তথাকথিত মুক্তচিন্তার অধিকারীরা বলে থাকেন, মুক্তমনে কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন করতে হবে, মুক্তবুদ্ধি দিয়ে কুরআন-হাদীছ অনুধাবন করতে হবে। তাই কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে পূর্ব ধারণার কোন বাঁধা-বন্ধন থাকবে না, পূর্বে কে কি বলেছেন তা দেখার প্রয়োজন নেই, কুরআন ও সুন্নাহর কে কি ব্যাখ্যা ও তরজমানী করে আসছেন তার প্রতি নজর দেয়ারও প্রয়োজন নেই। এভাবে মুক্তচিন্তার দোহাই দিয়ে পূর্বসূরীদের কৃত কুরআন সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সবকিছু গবেষণার দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এখানেই হচ্ছে ভুল। পূর্বে "চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়" শিরোনামের অধীনে "পূর্বসূরীদের চিন্তার আলোকে চিন্তা করতে হবে" উপশিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে, চিন্তাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হলে কিতাবুল্লাহ তথা আল্লাহর কিতাব– কুরআন ও তার ব্যাখ্যা হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে চিন্তাকে চালাতে হবে পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যার

www.maktabatulabrar.com

আলোকে। কুরআন-হাদীছ বুঝার ক্ষেত্রে পূর্বসূরীদের থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোনই অবকাশ নেই। অতএব যারা মুক্তচিন্তার দোহাই দিয়ে পূর্বসূরীদের কৃত কুরআন ও সুন্নাহর সকল ব্যাখ্যা এবং সে ক্ষেত্রে অনুসৃত নীতির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে যেতে চান এবং ইমাম ও মুজতাহিদগণ কর্তৃক কুরআন ও হাদীছ থেকে দীর্ঘ দিনের গবেষণালব্ধ ফিকাহ শাস্ত্রকে অস্বীকার করতে চান, তাদের এই কর্ম মুক্তবুদ্ধি নয় বরং বুদ্ধির স্বেচ্ছাচারিতা। এটা তাদের চিন্তার লাগামহীনতা, বুদ্ধির বল্গাহীনতা। এটা তাদের চিন্তার ভুল। ইসলামী চিন্তা-গবেষণার সাথে পূর্বসূরীদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের লাগাম লাগানো না থাকলে সেই লাগামহীন চিন্তা তাদেরকে গোমরাহীর দিকে পরিচালিত করবে।

এখানে দু'টো বিষয় উল্লেখ করতে চাই। তা হল–

১. আমরা মুক্তমনে (খালিউয যেহ্‌নে) কুরআন ও হাদীছ পাঠ করার বিষয়টাকে সমূলে অস্বীকার করছি না। অবশ্যই কুরআন হাদীছ মুক্তমনে (খালিউয যেহ্‌নে) অনুধাবন করতে হবে। কোন পূর্ব ধারণা মনে রাখা এবং সে অনুযায়ী কুরআনের ব্যাখ্যা প্রদান তো রীতিমত তাফসীর বির্‌-রায় বা অপব্যাখ্যা এবং তা কুরআন সুন্নাহ অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যার মূলনীতি পরিপন্থী। আমরা যা বলছি তা হল মুক্তমনে চিন্তা করা যাবে, কিন্তু সেই চিন্তার সঙ্গে পূর্বসূরী হক্কানী উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মৌলিক ধারার লাগামও লাগিয়ে রাখতে হবে। পূর্বসূরী হক্কানী উলামায়ে কেরামের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মৌলিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না।

এ লাগাম লাগিয়ে রাখতে হবে এজন্য যে, মনের উপর শয়তানের প্রভাব এবং কুরআন-হাদীছ অধ্যয়ন ও তা থেকে মর্মোদ্ধারের সময় শয়তানের পক্ষ থেকে প্রক্ষেপন হয়ে থাকে। এরপরও রয়েছে প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব রুচির ভিন্নতার প্রশ্ন, যা একেক ব্যক্তিকে একেক দিকে ধাবিত করবে। তাই চিন্তার মাঝে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবিয়ীন, তাবে তাবিয়ীন ও তাদের ধারায় চিন্তা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পরিচালনাকারী হক্কানী উলামায়ে কেরামের চিন্তার সঙ্গে ঐক্য বজায় রাখার জন্য তাদের চিন্তার মৌলিক ধারার লাগাম লাগিয়ে রাখা ছাড়া চিন্তার সঠিকতায় বহাল থাকার কোন নিশ্চয়তা রাখা সম্ভব নয়।

সারকথা, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের কথা, কাজ, সমর্থন ও আদর্শের মধ্যমে সাহাবায়ে কেরামকে কুরআনের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম শিক্ষা দিয়েছেন তাদের পরবর্তীদেরকে, আর এভাবেই চলে আসছে কুরআন ও সুন্নাহ অনুধাবন এবং তার ব্যাখ্যার নিশ্চিত সত্য ধারা। আর হক ও হক্কানিয়াতের এই যে অবিচ্ছিন্ন সূত্রপরম্পরা, এরই লাগাম লাগিয়ে চালাতে হবে বুদ্ধিকে; অন্যথায় তথাকথিত 'মুক্তচিন্তার' লাগামহীন অশ্ব বুদ্ধিকে বিভ্রান্তির সুদূর প্রান্তে পৌঁছে দিতে পারে।

২. ইসলামী চিন্তাধারায় গতিশীলতার নীতি অর্থাৎ ঈজতিহাদের ব্যবস্থা রয়েছে সত্য; কিন্তু তার জন্য যোগ্যতারও প্রয়োজন রয়েছে। ইজতিহাদের দরজা বন্ধ হয়ে গেছে তা বলছি না, একমাত্র যেসব বিষয়ে স্পষ্ট কুরআন হাদীছের ভাষ্য রয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ইজতিহাদের কোন অবকাশ নেই। এছাড়া নিত্য নতুন সৃষ্ট সমস্যা –যার সমাধান ইতিপূর্বে কখনও হয়নি–, সেক্ষেত্রে তো ইজতিহাদ বৈ গত্যন্তর নেই। কিন্তু তাই বলে অযোগ্য ব্যক্তিরাও মুক্তবুদ্ধির দোহাই দিয়ে সর্বজনস্বীকৃত প্রজ্ঞাবান ও মহামতি ইমামদের সঙ্গে জ্ঞান প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হওয়ার খায়েশ মনে লালন করবেন তা কখনও মেনে নেয়ার মত নয়।

কেউ যদি ইজতিহাদ করার মত যোগ্যতার অধিকারী হন তিনি তা করতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, প্রত্যেক ব্যক্তিই কি সেই যোগ্যতা রাখেন? বলা বাহুল্য, যেনতেনভাবে আরবী ভাষা বুঝতে সক্ষম বা শুধুমাত্র বাংলা ভাষায় তরজমা ও তাফসীর পাঠই যার সর্বসাকুল্য মূলধন, এমন কেউ যদি ইজতিহাদের পথে অগ্রসর হতে চান, তাহলে তিনি যে পদে পদে ভুল করে বসতে পারেন তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। ইজতিহাদ বা কুরআন ও হাদীছের আলোকে গভীর সাধনার মাধ্যমে কোন সমস্যার সমাধান দেয়ার অধিকার এমন ব্যক্তিরই আছে, যিনি

www.maktabatulabrar.com

শরীয়তের পূর্ণ অনুসরণ, তাফসীর ও হাদীছ শাস্ত্রের পরিপক্ক জ্ঞান এবং কুরআন ও হাদীছের ভাষা– আরবী ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিদ্যা, নাহু-সরফ, বালাগাত, উসূলে ফেকাহ ইত্যাদির উপর অগাধ দখল রাখেন। এহেন যোগ্যতা রাখেন না– এরূপ কোন ব্যক্তি যদি মুক্তবুদ্ধির নামে ইজতিহাদ শুরু করে দেন এবং শুদ্ধ মাসআলাও বলেন, তবুও তিনি কঠিন গোনাহগার হবেন। কারণ, তিনি অনধিকার চর্চা করেছেন, চিন্তাকে ভুল পথে পরিচালিত করেছেন এবং তার পক্ষে ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল।

সহজিয়া পন্থার সন্ধান

ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে সহজিয়া পন্থার সন্ধানও একটা মৌলিক গলদ। এই সহজিয়া পন্থা সন্ধানের চিন্তা ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ভুল পথে চালিত করে। বহু লোক এই ভুল ধারণার শিকার যে, পীর ধরলে পীরই নাজাতের ব্যবস্থা করে দেবে, ফলে তারা ঈমান, আমল, মেহনত-মোজাহাদার কঠিন রাস্তা থেকে নিস্কৃতির জন্য পীর ধরার সহজিয়া পন্থাকে বেছে নেয়। এবং এই সহজিয়া পন্থার অনুকূলে যুক্তি ও দলীল-প্রমাণ দাঁড় করানোর ভ্রান্ত লাইনে অগ্রসর হয়। ঈমান, আমল, মেহনত-মোজাহাদার কঠিন রাস্তা থেকে নিস্কৃতির উপায়-প্রত্যাশী ও সহজিয়া পন্থার সন্ধান-প্রয়াসী বহু লোককে বলতে শোনা যায় শরীয়ত ও মারেফত আলাদা। মারেফতের লাইনে ইবাদত-বন্দেগীর প্রয়োজন পড়ে না, গান-বাদ্য, পর পুরুষ ও পর নারীদের সাথে ঢলাঢলি সবই এই মারেফতের লাইনে বৈধ। (নাউযুবিল্লাহ!)

খাহেশাতকে সামনে রেখে চিন্তাকে অগ্রসর করা

ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে খাহেশাতকে সামনে রেখে চিন্তাকে অগ্রসর করাও একটা মৌলিক গলদ। খাহেশাতকে সামনে রেখে চিন্তাকে অগ্রসর করা দ্বারাও অনেক বিভ্রান্তি হয়ে থাকে। ইসলামের ইতিহাসে এমন ইসলামী পণ্ডিতও দেখা গেছে যিনি দাড়ি না রাখার খাহেশাত পূর্ণ করার জন্য দাড়ি রাখা সংক্রান্ত হাদীছের অপব্যাখ্যায় প্রবৃত হয়েছেন। এক শ্রেণীর লোক গান-বাজনার খাহেশাত পূর্ণ করার জন্য বুযুর্গানে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দ্বীনের কর্মের (সামা'-র) অপব্যাখ্যা দিয়ে এবং কুরআন সুন্নার অর্থ বিকৃত করে গান বাজনার বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করে থাকেন এবং মারেফতী তরীকার নামে দেদারছে গান বাজনা চালিয়ে যান। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার পথকে সুগম করে খাহেশাত পূর্ণ করার জন্য এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর-ফকীর নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশাকে বৈধতা দেয়ার চেষ্টা করেছে এবং এখনও করে যাচ্ছে। এভাবে খাহেশাতকে সামনে রেখে চিন্তাকে অগ্রসর করা দ্বারা বহু লোক বহুভাবে বিভ্রান্ত হয়েছে, হচ্ছে।

চার দলীলের বাইরে অন্য কোন দলীলের ভিত্তিতে কোন কিছু চিন্তা করা

ইসলামের যে কোনো চিন্তা-চেতনা চার দলীল তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস–এর ভিত্তিতে হতে হবে। এর বাইরে অন্য কোন দলীলের ভিত্তিতে ইসলামের কোনোকিছু চিন্তা করা একটা মৌলিক গলদ। যেমন এই চার দলীলকে ছেড়ে নিছক আকল-বুদ্ধির ভিত্তিতে কোনকিছু চিন্তা করা বা স্বপ্নের ভিত্তিতে ইসলামের কোন কিছু প্রমাণ করতে চাওয়া ইত্যাদি।

এক শ্রেণীর লোক আছে যারা উপরোক্ত চার দলীলের উপর নিজের আক্‌ল বা বুদ্ধিকে প্রাধান্য দেন, তারা গোমরাহ। আহ্‌লে হক আক্‌ল-বুদ্ধি প্রয়োগ করেন, তবে কুরআন-হাদীছের খাদেম বা সহায়ক হিসাবে। তারা আক্‌ল-বুদ্ধিকে কুরআন-হাদীছ ডিঙ্গিয়ে উপরে যেতে দেন না। পক্ষান্তরে বাতিলপন্থীরা আক্‌লকে প্রধান নিয়ামক হিসাবে প্রয়োগ করে থাকে। ফলে তারা তাদের ঠুনকো আক্‌লে না ধরলে কুরআন-হাদীছ দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত কোন বিষয়কেও অবলিলায় অস্বীকার করে বসে। স্যার সৈয়দ আহ্‌মদের গোমরাহীর পশ্চাতে এরূপ কারণও বিদ্যমান ছিল। যার বিস্তারিত বিবরণ আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থে দেখা যেতে পারে।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন যারা কুরআন-হাদীছের দলীলের চেয়ে স্বপ্নকে প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। তারা স্বপ্নকে অকাট্য দলীল মনে করেন এবং স্বপ্নের মাধ্যমে কিছু অবগত হলে সেটাকেই বড় দলীল হিসাবে মূল্যায়ন

www.maktabatulabrar.com

করে থাকেন। কিছু ভ্রান্ত সূফীকে এরূপ করতে দেখা যায়। তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে কিছু বলতে দেখার দোহাই দিয়ে শরীআত-নির্ধারিত সীমানা লংঘন করে তারই অনুসরণ করতে থাকে। আল্লামা শাতবী (রহ.) "মুখতাসারু কিতাবিল ই'তিসাম" গ্রন্থে বিদআতপন্থীদের দলীলাদি বর্ণনা করতে গিয়ে এ কথাগুলোই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন, যার আরবী ইবারত নিম্নরূপ।

[الاحتجاج بالمنامات]: وأضعف هؤلاء احتجاجاً قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات – وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون: رأينا فلاناً الرجل الصالح، فقال لنا: اتركوا كذا، واعملوا كذا، وربما قال بعضهم: رأيت النبي – صلى الله عليه وسلم – في النوم، فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضاً عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعاً على حال إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها، وإلا وجب تركها والإعراض عنها.

দেওয়ানবাগী, রাজারবাগী, সুরেশ্বরী প্রমুখকে দেখা যায় তারা স্বপ্নকে স্বতন্ত্র দলীল হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকেন, অথচ স্বপ্ন কোন দলীল নয়। কাযী ইয়ায (রহ.) বলেন, স্বপ্নের দ্বারা কোন নিশ্চিত জ্ঞান অর্জিত হয় না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ইজমা' রয়েছে। আল্লামা নববী বলেন, তদ্রূপ স্বপ্নের দ্বারা কোন হুকুমের পরিবর্তন ঘটানো যায় না। এ ব্যাপারে ইত্তেফাক বা সর্বসম্মত মত রয়েছে। যদিও হাদীছে বলা হয়েছে,

«عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « مَنْ رَآنِى فِى الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِى فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَتَمَثَّلُ بِى ».

(رواه مسلم في صحيحه برقم ٢٢٦٦)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল, সে আমাকেই দেখল। কেননা শয়তান আমার রূপ ধরতে পারে না।

(মুসলিম: হাদীছ নং ২২৬৬)

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখা মিথ্যা হতে পারে না। এটা সত্য স্বপ্ন, শয়তানী স্বপ্ন নয়। কেননা, শয়তান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। তবে স্বপ্নে সে যা শুনেছে তা সঠিকভাবে বুঝতে পেরেছে এবং তা সঠিকভাবে মনে রাখতে পেরেছে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। তাই স্বপ্ন কোন দলীল হতে পারে না।

এখানে আরও মনে রাখা দরকার যে, কেউ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্বপ্নে দেখলে সেটা সত্য, কেননা শয়তান রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রূপ ধরতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যা বলতে শুনেছে, সেটা সঠিক মনে রাখতে পেরেছে, তার নিশ্চয়তা নেই। হতে পারে তার মনের মধ্যে শয়তান কোন কথার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছে। এ কারণেই উলামায়ে কেরাম বলেছেন, শরীআতে প্রমাণ নেই– এমন কোন ব্যাপারে যদি কারও মনে হয় যে, স্বপ্নে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাই বলেছিলেন, তাহলে সেই স্বপ্ন অনুযায়ী সে তা করতে পারবে না।

এ ব্যাপারে আল্লামা নববীর ইবারত নিম্নরূপ–

قال القاضى عياض رحمه الله ... لا أنه يقطع بأمر المنام ولا أنه تبطل بسببه سنة ثبتت ولا تثبت به سنة لم تثبت وهذا باجماع العلماء هذا كلام القاضى وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهم فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع.

অর্থাৎ, কাজী ইয়াজ বলেন, ... "স্বপ্নের বিষয় দ্বারা কোন কিছু নিশ্চিত হওয়া যায় না। হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত– এমন কোন বিষয় স্বপ্ন দ্বারা বাতিল হয় না। এমনিভাবে হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়– এমন কোন

www.maktabatulabrar.com

বিষয়ও স্বপ্ন দ্বারা প্রমাণিত হয় না। এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের ঐকমত্য রয়েছে।" এটা কাজী ইয়াজের বক্তব্য। অন্যান্য উলামায়ে কেরামের ভাষ্য এরূপ– শরীয়তে প্রতিষ্ঠিত কোন বিষয় স্বপ্ন দ্বারা পরিবর্তিত হয় না।

কেউ মনে করতে পারেন হাদীছে ভাল স্বপ্নকে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে "সুসংবাদ" বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব স্বপ্ন দলীল। তার জওয়াব হল- হাদীছে ভাল স্বপ্নকে যেমন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সুসংবাদ বলা হয়েছে, তেমনি স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকেও হতে পারে এবং মনের কল্পনাঘটিতও হতে পারে– একথাও হাদীছে বলা হয়েছে। আর কোন্ স্বপ্নটি আল্লাহ্র পক্ষ থেকে শরীআতে তার পরিচয় যেহেতু দেয়া হয়নি, শুধু এতটুকু বলা হয়েছে যে, সেটি ভাল স্বপ্ন। আর দ্বীনী ব্যাপারে ভাল-মন্দ নির্ধারণ শরীআতের কোন দলীল ব্যতীত সম্ভব নয়। তাই কোন স্বপ্নকে ভাল বা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলতে গেলে অবশ্যই শরীআতের কোন না কোন দলীলের আশ্রয় নিতে হবে। অতএব স্বপ্ন কোন স্বতন্ত্র দলীল নয়। কোন স্বপ্ন শরীআতের অনুকূলে হলে সেটাকে সমর্থক হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারবে মাত্র।

স্বপ্ন দলীল হওয়ার পক্ষে কিছু লোক প্রমাণ পেশ করে থাকেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে যায়েদ (রা.) স্বপ্নে আযানের শব্দগুলো দেখেছিলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে অনুযায়ী আযান প্রবর্তন করেছিলেন– এ দ্বারা বুঝা যায় যে, স্বপ্ন দলীল। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা সেখানে স্বপ্নটি সঠিক বলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন,

«**إن هذه لرؤيا حق.**» (رواه الترمذي باب ما جاء في بدأ الأذان)

অর্থাৎ, এটা অবশ্যই সত্য স্বপ্ন। (তিরমিযী)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরূপ স্বীকৃতি না দিলে শুধু ঐ সাহাবীর স্বপ্নের ভিত্তিতে আযান প্রচলিত হত না। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ইন্তেকালের পর কারও স্বপ্ন সত্য হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দেয়ার যেহেতু কেউ থাকেনি, তাই এখন কারও স্বপ্নকে দলীল হিসাবে দাঁড় করানো যাবে না। এখানে এ কথাও

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

স্মরণ রাখা দরকার যে, রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত আছে- হযরত ওমর (রা.) এর ২০ দিন পূর্বে আযানের এরূপ শব্দ স্বপ্নে দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি সে স্বপ্নের ভিত্তিতে সেভাবে আযান দেয়া শুরু করেননি এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সেটা জানার পর ওমর (রা.)কে এ কথা বলেননি যে, স্বপ্নে দেখা সত্ত্বেও কেন তুমি সে মোতাবিক আমল শুরু করলে না? স্বপ্ন দলীল হলে অবশ্যই হযরত ওমর (রা.) স্বপ্ন মোতাবিক সেরূপ আমল করতেন বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জানার পর অনুরূপ বলতেন।

"কীভাবে চিন্তা-চেতনা ভুল পথে চালিত হয়" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল-

- অতিমাত্রায় বিজ্ঞানমনস্কতা ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে একটা মৌলিক গলদ। এই অতিমাত্রায় বিজ্ঞানমনস্কতার কারণে বহু মানুষ ইসলামের অনেক কিছুর বিকৃত ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং হচ্ছে।
- পাশ্চাত্যায়ন-চিন্তাও ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে একটা মৌলিক গলদ। এই চিন্তাও ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ভুল পথে চালিত করে।
- সাম্প্রতিকায়ন-চিন্তাও ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে একটা মৌলিক গলদ। এই চিন্তা ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ভুল পথে চালিত করে।
- তথাকথিত মুক্তচিন্তাও ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে একটা মৌলিক গলদ। এই তথাকথিত মুক্তচিন্তাও ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ভুল পথে চালিত করে।
- সহজিয়া পন্থার সন্ধানও ইসলামী চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে একটা মৌলিক গলদ। এই সহজিয়া পন্থা সন্ধানের চিন্তাও ইসলামী চিন্তা-চেতনাকে ভুল পথে চালিত করে।
- খাহেশাতকে সামনে রেখে চিন্তাকে অগ্রসর করাও একটা মৌলিক গলদ। খাহেশাতকে সামনে রেখে চিন্তাকে অগ্রসর করা দ্বারাও অনেক বিভ্রান্তি হয়ে থাকে।
- চার দলীলের বাইরে অন্য কোন দলীলের ভিত্তিতে ইসলামের কোন কিছু চিন্তা করাও একটা মৌলিক গলদ।

www.maktabatulabrar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যবহারিক জীবনে চিন্তা-চেতনার ভুল প্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়ে চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্যবহারিক জীবনের এমন বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে যেগুলোতে আমরা চিন্তা-চেতনার ভুলের শিকার।

জীবন সম্বন্ধে কয়েকটা বড় ভুল চিন্তা

জীবন সম্বন্ধে একটা বড় ভুল চিন্তা হল- জীবন একটাই যত পার উপভোগ করে নাও, যত পার দুনিয়ার মজা লুটে নাও। অনেকে বলেও থাকে, খাও দাও, ফূর্তি কর এই তো জীবন। অর্থাৎ, তারা মনে করে যত খাওয়া-দাওয়া করা যায়, যত ফূর্তি করা যায়, জীবনকে যত বৈষয়িক উপভোগে ভরপুর করা যায় ততই জীবন সার্থক। এটা কোন মুমিনের চিন্তা হতে পারে না। যে মুমিন বিশ্বাস রাখে যে, তার সামনে রয়েছে অনন্ত পরকাল, সেই পরকালের তুলনায় দুনিয়া কিছুই নয়, সে কীকরে পরকালের চিন্তা বিস্মৃত হয়ে শুধু দুনিয়ার চিন্তা নিয়ে আত্ম-নিমগ্ন হতে পারে? মুমিন বিশ্বাস রাখে তার আখেরাত যদি অনুকূল হয়ে যায়, অনন্ত জীবনের সুখ-শান্তি যদি পাওয়া হয়ে যায়, তাহলে সে সফল।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আখেরাতের প্রাপ্তি দুনিয়ার শত অ-প্রাপ্তিকেও বিস্মৃত করে দেবে, শত অ-প্রাপ্তির কষ্টবোধকে লাঘব করে দেবে। পক্ষান্তরে আখেরাতে যদি সে বঞ্চিত হয়, আখেরাতে যদি সে দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়, তাহলে দুনিয়ার অনেক কিছু পাওয়ার স্মৃতি তার অনন্ত দুঃখের কিছুই লাঘব করতে পারবে না। এরূপ মুমিন দুনিয়ার এই নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী সময়ে কিছু না পেলেও তা নিয়ে তার কোন ভাবান্তর থাকে না, যদি সে আখেরাতে পাওয়ার পথ ধরে এগুতে থাকে। এরূপ মুমিনের চিন্তা এই হয় না যে, জীবন একটাই যত পার উপভোগ করে নাও, যত পার দুনিয়ার মজা লুটে নাও। বরং তার চিন্তা হয় এরূপ– জীবন অর্থাৎ, দুনিয়ার জীবন একটাই, তাই যত পার এই জীবন দিয়ে আখেরাতের জীবনের জন্য সঞ্চয় করে নাও।

জীবন একটাই যত পার উপভোগ করে নাও, যত পার দুনিয়ার মজা লুটে নাও– এই চিন্তার ধ্বজাধারীরা যখন তাদের চিন্তার ভুল বুঝতে পারবে (মৃত্যুর সময়ই তারা বুঝতে পারবে বা জাহান্নামে গেলে তো বুঝবেই।) এবং এটা বুঝতে পারবে যে, এই চিন্তার ফলেই তো আখেরাত বিস্মৃত হয়েছিলাম, ফলে এখন জাহান্নামের পথ সুগম হয়েছে বা জাহান্নামে আসতে হয়েছে, তখন তারা আল্লাহর কাছে মিনতি জানাবে, হে আল্লাহ! আর একবার দুনিয়ায় যাওয়ার সুযোগ দাও, তাহলে আমরা মুমিন বিশ্বাসী হয়ে আসব, নেককার হয়ে আসব। আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হবে, আগেই জানানো হয়েছিল দ্বিতীয়বার আর কাউকে এই সুযোগ দেয়া হবে না। তখন এই ভুল চিন্তার জন্য তাদের আক্ষেপের অন্ত থাকবে না। এ মর্মে কুরআনে কারীমের দুটো আয়াত দেখুন:

﴿حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا.﴾

অর্থাৎ, অবশেষে যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু উপস্থিত হবে, তখন বলবে, হে আমার রব! আমাকে আবার ফেরত পাঠাও, আশা করি নেক আমল করে আসব যেখানে আমি ছেড়ে এসেছি। কখনও না!
(সূরা মুমিনূন: ৯৯–১০০)

www.maktabatulabrar.com

﴿وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ.﴾

অর্থাৎ, যদি তুমি তাদেরকে দেখতে যখন তারা তাদের প্রভুর সামনে মাথা হেঁট করে থাকবে আর বলবে, হে আমাদের প্রভূ! আমরা দেখলাম, শুনলাম। অতএব আমাদেরকে ফেরত পাঠাও, তাহলে ঈমান বিশ্বাসের সাথে নেক আমল করে আসব। (সূরা সাজদা: ১২)

জীবন সম্বন্ধে আর একটা বড় ভুল চিন্তা হল– এই জীবনই শেষ, মৃত্যুই শেষ, মৃত্যু-পরবর্তী জীবন বলে কিছু নেই। অর্থাৎ, পরকালকে অবিশ্বাস করা। মূলত পরকালের অবিশ্বাস থেকেই মানুষের মধ্যে এই ভাবনা আসে যে, জীবন একটাই যত পার উপভোগ করে নাও, যত পার দুনিয়ার মজা লুটে নাও। এটা নাস্তিকদের চিন্তা, কাফেরদের চিন্তা। এর বিপরীত মুমিনের চিন্তা হল এটাই শেষ জীবন নয় এরপরও আবার জীবন আছে এবং সেটা অনন্ত জীবন, সেই জীবনের সুখ-শান্তিই আসল সুখ-শান্তি। আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবন তুচ্ছ খেলা মাত্র। আখেরাতের জীবন হচ্ছে মহিমান্বিত জীবন। কুরআনে কারীমের একটা আয়াতের বর্ণনা লক্ষ করুন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ.﴾

অর্থাৎ, এই পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা মাত্র, আর পরকাল সে তো অবশ্যই মহিমান্বিত জীবন। যদি তারা জানত! (সূরা আনকাবূত: ৬৪)

জীবনে বড় হতে চাওয়ার চিন্তায় কিছু ভুল

জীবনে বড় হতে কে না চায়। সকলেই বড় হতে চায়। কিন্তু কীভাবে বড় হওয়া যাবে সেই চিন্তায় অনেকে অনেক রকম ভুলের শিকার। সেরূপ ভুল চিন্তার অন্ত নেই। তবে নিচে সেরূপ মৌলিক কয়েকটা ভুল চিন্তার কথা উল্লেখ করা হল।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

১. অহংকার প্রদর্শন করে বড় হওয়ার চিন্তা ভুল। তাকাব্বুর বা অহংকার প্রদর্শন করে উঁচু হওয়া যায় না। তাওয়াজু বা বিনয় প্রদর্শন করেই উঁচু হওয়া যায়। অহংকার করে নিজের কাছে নিজেকে বড় মনে হতে পারে কিন্তু বাস্তবে অন্যের মনে সে ছোট ও হীন প্রতিপন্ন হয়। পক্ষান্তরে তাওয়াজু প্রদর্শন করলে তথা নিজের মনে নিজেকে ছোট ভাবলে এবং কথা ও আচরণে সেরূপ অভিব্যক্তি ঘটলে অন্যের মনে সে বড় প্রতিপন্ন হয়। এভাবে তাওয়াজু বা বিনয়ের মাধ্যমে তার মর্যাদা উঁচু হয়। সহীহ হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ اللَّهُ.(رواه أحمد والبزار وقال الهيثمي: رجال أحمد والبزار رجال الصحيح.)

অর্থাৎ, যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনয়ী হয় আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন। (মুসনাদে আহমাদ ও মুসনাদে বায্যার) অতএব যদি বড় হতে চাও ছোট হও তবে।

২. নিজের ভুল স্বীকার করে নিলে ছোট হতে হয় এই চিন্তা ভুল। জীবনে ভুল-বিচ্যুতি হওয়া খুবই স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু এরূপ ক্ষেত্রে অনেক মানুষকেই দেখা যায় তারা নিজের ভুল স্বীকার করে নিতে চান না বরং অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে সেই ভুলটাকে সঠিক প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে থাকেন। তারা মনে করেন ভুল স্বীকার করে নিলে অন্যের সামনে মাথা নিচু হয়ে যায়, তাতে ছোট হয়ে যেতে হয়। তার চেয়ে নিজেরটাকে যেকোনো মূল্যে সঠিক প্রতিপন্ন করতে পারলেই আমার মাথা উঁচু থাকবে, আমি বড় প্রতিপন্ন হব। অথচ এ ধারণা ভুল। কেউ অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করে নিলে মানুষ তাকে নির্ভেজাল মানুষ মনে করে থাকে। পক্ষান্তরে ভুল স্বীকার না করে তার অপব্যাখ্যা দিতে শুরু করলে মানুষ তাকে ভেজাল মানুষ, একগুঁয়ে মানুষ মনে করে থাকে। এভাবে ভুল স্বীকার না করার দ্বারা মানুষের কাছে তার মর্যাদা খাটো হয়। বস্তুত নিজের ভুল স্বীকার করে নিলে ছোট হতে হয় এই চিন্তাই ভুল। এই ভুল চিন্তা থেকেই নিজের ভুলের অপব্যাখ্যা দিতে যাওয়ার মত আর একটা ভুল পথে

www.maktabatulabrar.com

মানুষ অগ্রসর হয়। এ পন্থায় বড় হওয়া যায় না। যদি বড় হতে চাও, অকপটে নিজের ভুল স্বীকার করে নাও।

৩. হাসাদ বা হিংসা করে বড় হওয়ার চিন্তা করা ভুল। সমাজে চলতে গেলে কেউ আগে বেড়ে যায় কেউ পিছে পড়ে। বিভিন্ন কারণে অনেকে আগে বেড়ে যায়। কেউ যোগ্যতার কারণে আগে বেড়ে যায়, কেউ গুণাবলীর কারণে আগে বেড়ে যায়, কেউ বংশ, সামাজিক অবস্থান, আচার-আচরণ ইত্যাদির কারণে আগে বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে যারা পিছে থাকে তারা আগে বাড়তে চাইলে যোগ্যতা ও গুণাবলী ইত্যাদি দিয়েই আগে বাড়ার চিন্তা করা সংগত। তা না করে যারা অগ্রসরদের প্রতি হিংসা করে তাদের থেকে আগে বাড়ার চিন্তা করে, তারা ভুল চিন্তা করে। বস্তুত যোগ্যদের মোকাবেলা হিংসা দিয়ে নয় যোগ্যতা দিয়েই করতে হয়। হিংসা দিয়ে যোগ্যদের মোকাবেলা করার চিন্তা ভুল। অতএব যদি বড় হতে চাও হিংসা দিয়ে নয় যোগ্যতা ও গুণাবলী দিয়ে বড় হও।

৪. কেউ কেউ তো এমনও আছে যারা যোগ্যদের মোকাবেলা করার সঠিক পন্থা অবলম্বনে ব্যর্থ হয়ে নিজের অর্থকড়ি, ইজ্জত ইত্যাদি বিসর্জন দিয়ে হলেও অন্যের ক্ষতি করার মাধ্যমে তার মোকাবেলা করার চেষ্টা করে থাকে। নিজের ক্ষতি করে অন্যের অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করার চেষ্টা করে থাকে। এটাকেই বলা হয় নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভংগ করা। এরূপ চিন্তা ভুল চিন্তা। এরূপ চেষ্টা ভুল চেষ্টা। এরূপ চেষ্টা মানুষের অগোচরে থাকে না। মানুষ ঠিকই এক সময় তার হীনচেষ্টা সম্বন্ধে অবগত হয়ে যায়। তখন মানুষের দৃষ্টিতে সে হীন প্রতিপন্ন হয়। তাই নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভংগ করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকাই বুদ্ধিমান লোকের কাজ।

৫. অনেকে নিজেকে বড় এবং অন্যকে ছোট প্রতিপন্ন করার জন্য অন্যের গীবত বা দোষচর্চা করে থাকে। তাদের মনে চিন্তা থাকে এবং ভাবখানাও এমন থাকে যে, যার দোষচর্চা করলাম লোকেরা তাকে ছোট মনে করবে এবং আমাকে সেই দোষ থেকে মুক্ত মনে করবে, এভাবে আমি তার চেয়ে ভাল প্রতিপন্ন হব। গীবত করার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পেছনে মূলত অন্যকে ছোট প্রতিপন্ন করার পাশাপাশি নিজেকে ভাল এবং বড় প্রতিপন্ন করার চিন্তাই কার্যকর থাকে। কিন্তু অন্যরা তো বুঝে যায় গীবতকারী সত্যিকার অর্থেই ভাল কি না। অন্যরা এটাও বোঝে যে, সত্যিকার অর্থে যারা ভাল মানুষ তারা অন্যের গীবত বা দোষচর্চা করে না। তাই কারও গীবত করে মানুষ নিজেকে ভাল প্রতিপন্ন করতে পারে না। গীবতকারী যে চিন্তায় গীবত করে তার চিন্তা মাঠে মারা যায়।

৬. নিজের গুণকীর্তন করেও বড় হওয়া যায় না। অনেকেই অন্যদের সামনে বড় হওয়ার জন্য নিজেই নিজের গুণকীর্তন করে থাকে। কিন্তু মনে রাখতে হবে নিজে নিজের গুণকীর্তন করে অন্যদের থেকে তার স্বীকৃতি আদায় করা যায় না। কিছু চাটুকার লোক হয়তো সেই গুণকীর্তনের সামনে হুঁ হাঁ করে সমর্থন জানায়, কিন্তু ঠাণ্ডা মাথায় যারা সবকিছু বোঝে তারা তা পছন্দ করে না। বস্তুত নিজের গুণকীর্তনের মাধ্যমে নয় বরং নিজের গুণের মাত্রা বৃদ্ধি এবং তার উপর ধারাবাহিকতা ধরে রাখার মাধ্যমে যখন এক সময় অন্যদের থেকে তার গুণের স্বতপ্রণোদিত স্বীকৃতি উঠে আসে, সেটাই হল প্রকৃত স্বীকৃতি। নিজে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে সত্যিকার অর্থে স্বীকৃতি আদায় করা যায় না, সেটা একসময় স্বতপ্রণোদিতভাবেই অন্যদের থেকে আদায় হয়ে আসে। সেভাবেই বড় হওয়া যায়।

কুরআন হাদীছে নিজে নিজের গুণকীর্তন করাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى.﴾

অর্থাৎ, তোমরা নিজেরা নিজেদের গুণকীর্তন করো না। কে মুত্তাকী পরহেযগার (তথা ভাল) তার সম্বন্ধে তিনি (আল্লাহ) ভাল অবগত আছেন। (সূরা নাজ্‌ম: ৩২)

৭. লকব উপাধি জুড়ে দিয়ে বড় হওয়ার চিন্তাও ভুল চিন্তা। সম্প্রতি বড় হওয়ার চিন্তায় নামের শুরুতে লকব উপাধি জুড়ে দেয়ার চর্চা দেখা যাচ্ছে খুব বেশি। নিজের লোকদেরকে আকার-ইংগিতে কিংবা

www.maktabatulabrar.com

স্পষ্টতই বলে কয়ে নিজের নামের শুরুতে নানান রকম লকব উপাধি জুড়ে দেয়ার খেলা চলছে কোন রকম চক্ষু লজ্জা ছাড়াই। এভাবে যেনতেন লোকদের নামের শুরুতেও এতসব বড় বড় লকব উপাধি লাগা শুরু হয়েছে যে, বড় বড় লকব উপাধিগুলো এখন ছেলেখেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক একটা উপাধি তার মাহাত্ম থেকে বহু নীচে নেমে গেছে। যেমন ধরুন আল্লামা বা মহাজ্ঞানী একটা উপাধি। আগে ধর্মীয় সব ধরনের শাস্ত্রে অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই উপাধি যোগে পরিচয় দেয়া হত। কিন্তু ইদানিং আরবী ইবারত শুদ্ধ করে পড়তে সক্ষম নয় এমন লোকদেরও দেদারছে আল্লামা বলা হচ্ছে। কেউ তো জ্ঞানের কুঁয়া না হয়েও নিজের নামের শুরুতে "বাহ্‌রুল উলূম" বা জ্ঞানের সমুদ্র উপাধি লাগাচ্ছেন, কেউ তো নিজের সংকীর্ণ গলিতেও অপরিচিত অখ্যাত, তা সত্ত্বেও নিজের নামের শুরুতে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অমুক তমুক লাগাচ্ছেন। অনেকে একটা শাস্ত্রের ছিটেফোটা দু'চারটে কথা শিখেই নিজেদেরকে সেই শাস্ত্রের "বিশেষজ্ঞ" বলে পরিচয় দিতে শুরু করছেন, যদিও তারা বিশেষজ্ঞ নন বিশেষ অজ্ঞ। এভাবে অবাস্তব ও অমূলক লকব উপাধি লাগানোর ছেলেখেলা চলছে সর্বত্র এবং উলঙ্গভাবে। শুধু আলেম উলামা ও দ্বীনদার শ্রেণীর মধ্যেই নয় দুনিয়াদার লোকদের মধ্যেও এ খেলা চলছে দেদারছে। "দেশ-প্রেমিক", "জনদরদী", শ্রেষ্ঠ অমুক তমুক ইত্যাদি কত রকমারী উপাধি যেনতেন লোকের নামের শুরুতে শোভা (?) বর্ধন করছে। সমঝদার মানুষও তাই আজকাল কারও নামে বড় বড় লকব উপাধি দেখলেই তাকে প্রকৃতপক্ষেই বড় মনে করছেন না। লকব উপাধি লাগিয়েও তাই বড় হওয়া যাচ্ছে না। অতএব নামের শুরুতে নানান ধরনের বড় বড় লকব উপাধি জুড়ে দিয়ে বড় হওয়ার চিন্তাও ভুল চিন্তা।

বস্তুত যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে যে পর্যায়ের নয় সেই পর্যায়ের লকব উপাধি লাগানোর মাধ্যমে সে নিজেকে সেই পর্যায়ের দাবি করে থাকে। এটা মিথ্যা ও প্রতারণা। মিথ্যা ও প্রতারণার যে গোনাহ, নিজের জন্য প্রযোজ্য নয় এমন লকব উপাধি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ব্যবহারকারীরা সে গোনাহ এড়াতে পারবেন বলে মনে হয় না। তদুপরি এক সহীহ হাদীছে নিজের যে গুণ বা যোগ্যতা নেই তা দাবি করার বিষয়ে খুব কঠিন ভাষায় হুশিয়ারী এসেছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَمَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.»

(رواه مسلم برقم ١١٢)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যা তার নেই তার দাবি করবে সে আমার আদর্শভুক্ত নয়। সে যেন জাহান্নামকে তার ঠিকানা বানায়।
(মুসলিম হাদীছ নং ১১২)

"জীবনে বড় হতে চাওয়ার চিন্তায় কিছু ভুল" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- অহংকার প্রদর্শন করে বড় হওয়ার চিন্তা ভুল।
- নিজের ভুল স্বীকার করে নিলে ছোট হতে হয় এই চিন্তা ভুল।
- হাসাদ বা হিংসা করে বড় হওয়ার চিন্তা করা ভুল।
- অন্যের গীবত বা দোষচর্চা করে নিজেকে বড় এবং অন্যকে ছোট প্রতিপন্ন করার চিন্তা ভুল।
- নিজে নিজের গুণকীর্তন করে বড় হওয়ার চেষ্টা ভুল।
- লকব উপাধি জুড়ে দিয়ে বড় হওয়ার চিন্তাও ভুল।

ধন-সম্পদ বিষয়ক কিছু ভুল চিন্তা

১. ধন-সম্পদ বিষয়ে এই চিন্তা ভুল যে, ধন-সম্পদ না থাকলে জীবনের কোন মূল্য নেই, অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে না পারলে জীবনের কোনো দাম নেই। এই ভুল চিন্তা থেকে মানুষ হালাল-হারামের বাছ-বিচার ভুলে যেকোনো মূল্যে অর্থ উপার্জনের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে। অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তার ন্যায় অন্যায় ও হীতাহীত জ্ঞান লোপ পেয়ে বসে। সে মনে করে অর্থ উপার্জন করতে পারলেই তার জীবন স্বার্থক, অর্থ উপার্জন করতে না পারলে তার জীবন ব্যর্থ। অর্থ-সম্পদ থাকা না থাকার মধ্যেই সে তার জীবনের সফলতা ও ব্যর্থতা

www.maktabatulabrar.com

নিহীত বলে মনে করে। অথচ কুরআন সুন্নাহ মুমিনদেরকে এই ধারণা দেয়নি। কুরআনে কারীমের প্রথম সূরা সূরা বাকারাহ-এর শুরুতেই (৫ নং আয়াতে) যারা ঈমান আমলে উত্তীর্ণ তাদেরকে সফল বলে উল্লেখ করা হয়েছে। (বলা হয়েছে, وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ, তারাই সফল।) বোঝানো হয়েছে ঈমান এবং আমলই হচ্ছে জীবনের সফলতার মাপকাঠি। যারা ঈমান আমলে উত্তীর্ণ তাদের জীবন সফল, পক্ষান্তরে যারা ঈমান আমলে অনুত্তীর্ণ তাদের জীবন ব্যর্থ। জীবনের সফলতা কিংবা ব্যর্থতা একটা মৌলিক বিষয়। তাই কুরআনে কারীমের শুরুভাগেই এ ব্যাপারে চিন্তায় ভুল থাকলে তা সংশোধনের দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সম্পদ জীবনের জন্য একটা আবশ্যিক জিনিস, হালালভাবে সম্পদ উপার্জন করার দায়িত্বও রয়েছে এবং তা ছওয়াবের কাজও বটে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

«طَلَبُ كَسْبِ الْحَلاَلِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ».

(رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٨٧٤١)

অর্থাৎ, অন্যান্য ফরযের পর হালাল জীবিকা সন্ধান করাও এক ফরয। (শুআবুল ঈমান) তাই মানুষ হালালভাবে উপার্জনের জন্য চেষ্টা-সাধনা করবে তা আদৌ নিষিদ্ধ নয়। এখানে আমরা যে বিষয়টা বলছি তা হল সম্পদকে জীবনের মূল লক্ষ্য বানানো না চাই, সম্পদকে জীবনের সফলতার মাপকাঠি মনে করা না চাই। প্রয়োজনীয় চেষ্টা-সাধনার পর সম্পদ খুব বেশি না হলেও সেটাকে জীবনের ব্যর্থতা মনে করা না চাই। মুমিনের দৃষ্টিভংগী হওয়া চাই চেষ্টা-সাধনার পর তার সম্পদ অর্জিত হোক বা না হোক তার ঈমান আমল অর্জিত হয়েছে তাহলে সে ব্যর্থ নয় সে সফল। পক্ষান্তরে অনেক ধন-সম্পদ অর্জিত হল কিন্তু ঈমান আমল অর্জিত হল না তাহলে সে ব্যর্থ।

২. বিদেশে উপার্জন করতে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে ভুল। মুফতী শফী সাহেব রহ. মাসআলা লিখেছেন– (দেশে থেকে যাদের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মোটামুটিভাবেও হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা হয় না তাদের কথা ভিন্ন।) কিন্তু দেশে থেকে যাদের মোটামুটি হালাল উপার্জনের ব্যবস্থা রয়েছে বা হতে পারে তাদের জন্য জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন ঠিক নয়। (মাআরিফুল কুরআন) এটা ভাল নয় কয়েকটা কারণে। যথা: ১. বিদেশে থাকলে একরকম পরাধীনতা বা গোলামীর উপলব্ধি মানসিকভাবে পীড়া দিতে থাকে। যারা প্রবাস জীবনে থাকে তাদের থেকে জেনে নিন তারা সেখানে বিদেশ নামক কারগারে রয়েছে– এমন একটা উপলব্ধি সর্বক্ষণ তাদেরকে কুরে কুরে নিঃশেষ করে দিতে থাকে। ২. বিদেশে স্ত্রী বিহীন থাকলে দাম্পত্য জীবনের অপূর্ণতা থেকে যায়। ৩. স্বামী স্ত্রী একে অপরের সংশ্রব থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে উভয়ের চরিত্রে নানান রকম সমস্যা দেখা দেয়। ৪. দেশে থাকা স্ত্রী বিদেশ থেকে স্বামীর পাঠানো টাকা-পয়সা দিয়ে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারলেও তাদেরকে সঠিকভাবে তরবিয়াত করতে পারে না। এ ক্ষেত্রে পুরুষ গার্জিয়ান দ্বারা যা সম্ভব নারী গার্জিয়ান দ্বারা তা সম্ভব নয়। ৫. দেশে থাকা আত্মীয়-স্বজনের দেখাশোনা করা, খোঁজ-খবর নেয়া, তত্ত-তালাপি করা, তাদেরকে দ্বীনের পথে চালানোর জন্য দাওয়াত প্রদান করা ইত্যাদিতে ত্রুটি থেকে যায়।

যারা দেশের অর্থনীতি নিয়ে ভাবেন তারা হয়তো বলবেন, প্রবাসীদের মাধ্যমে যে বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসে তাতে দেশের অর্থনীতির উন্নতি হয়, দেশের উন্নতি হয়। অতএব বৃহত্তর এই স্বার্থের বিবেচনায় প্রবাসে থাকার এসব ছোটখাট সমস্যাকে সয়ে নিতে হবে। বৃহত্তর স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হয়। এই যুক্তির প্রবক্তাদের বলতে চাই, ১. এ সমস্যাগুলো ছোটখাট সমস্যা নয় বড় বড় সমস্যা। এ স্বার্থগুলো ক্ষুদ্র নয়, এগুলোও অনেক অনেক বড় বড় স্বার্থ। ২. পৃথিবীর বহু দেশ তাদের সন্তানদের বিদেশে না পাঠিয়েও তো উন্নতি করছে, তাদের পথ অনুসরণ করার চিন্তা কেন করা হয় না। তাতে অর্থনৈতিক উন্নতিও হবে আবার এসব সমস্যাও এড়ানো সম্ভব হবে। রাষ্ট্রের কর্ণধারদের বলব, দেশের অভ্যন্তরেই

www.maktabatulabrar.com

এমন নির্ঝঞ্ঝাট বিনিয়োগ ও উপার্জনের ব্যবস্থা করুন যাতে বিদেশে যাওয়ার অর্থ দিয়েই দেশে থেকে উপযুক্ত উপার্জন করা সম্ভব হয়। তাহলে দেখবেন এতসব বিসর্জন দিয়ে বিদেশে পাড়ি দেওয়ার জন্য কেউ উৎসাহিত থাকবে না। ৩. শুধু দেশের উন্নতিই দেখা হবে? সেই উন্নতির জন্য লাখো লাখো যুবকের দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি কেড়ে নিয়ে তাদের প্রতি অমানবিকতা প্রদর্শন হচ্ছে না কি না তা কি আদৌ দেখা হবে না? আক্ষেপ লাগে এই ধরনের অর্থনৈতিক উন্নতির প্রত্যাশী রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাদের প্রতি। তাদের কাছে শুধু বৈদেশিক মুদ্রাই লক্ষণীয়, অন্য কিছু লক্ষণীয় নয়। তারা বৈদেশিক মুদ্রার লোভে আমাদের মা বোনদের আরব দেশে পাঠাচ্ছে। অথচ আরব দেশে ঐ মা বোনদেরকে যৌনদাসী হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বিষয়টা এখন ওপেন সিক্রেট। একই পরিবারের পিতা-পুত্র সকলে মিলে এক গৃহকর্মী নারীকে দাসীর মত ব্যবহার করছে। এমনকি হায়েনা জানোয়ারের মত বন্ধু-বান্ধবের জোট মিলে গৃহকর্মী নারীদের ছিড়ে খুড়ে খাচ্ছে। অথচ ঐসব রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তাগণ এ বিষয়টা জেনেও না জানার ভান করে মুখে কুলুপ এঁটে রয়েছেন। প্রতিরোধের কোন পদক্ষেপই তারা গ্রহণ করছেন না। ধিক তাদের এই বৈদেশিক মুদ্রা-প্রীতিকে! ৪. প্রবাসীদের লাখো লাখো সন্তান পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে যা তাদের চরিত্রেও বিরূপ প্রভাব ফেলছে, পিতাদের তত্বাবধান না থাকায় বহু সন্তান বিপথগামীও হচ্ছে এসব কি আদৌ বিবেচ্য নয়?

৩. স্ত্রীর নামে ধন-সম্পদ জমি-জমা, বাড়ি গাড়ি লিখে দেয়া ভুল। এর অর্থ এই নয় যে, তাহলে স্ত্রীকে কম ভালবাসতে হবে। স্ত্রীর নামে ধন-সম্পদ জমি-জমা, বাড়ি গাড়ি লিখে না দিলে তাকে কম ভালবাসা হল এ কথা ঠিক নয়। স্ত্রীকে ভালবাসার বিষয়টা তার স্থানেই রয়েছে। কিন্তু তাকে ভালবাসার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে তার নামে সম্পদ লিখে দিতে হবে এই চিন্তা ভুল। এই চিন্তা ভুল এ কারণে যে, এতে করে স্বামীর পারিবারিক শাসন-কর্তৃত্ব খর্ব হয়ে যেতে পারে। কেননা শাসন-কর্তৃত্বের সাথে সম্পদের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রয়েছে। পুরুষ সম্পদহারা হলে সে কর্তৃত্বহারা হবে এটাই স্বাভাবিক। আর সংসারে পুরুষের কর্তৃত্ব খর্ব হওয়ার মত পদক্ষেপ সংসারের ভারসাম্য বিনষ্টের কারণ হতে পারে। তাহলে তা সংসারের অমঙ্গল ডেকে আনবে। কুরআনে কারীমের যে আয়াতে পুরুষের পারিবারিক শাসন-কর্তৃত্ব থাকার কথা বলা হয়েছে তাতে পুরুষকর্তৃক সম্পদ ব্যয়কে শাসন-কর্তৃত্বের একটা প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.﴾

অর্থাৎ, পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বকারী। এ কারণে যে, আল্লাহ কতককে (পুরুষকে) কতকের উপর (নারীর উপর) শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন আর এ কারণে যে, পুরুষরা তাদের সম্পদ ব্যয় করে।

(সূরা নিছা: ৩৪)

উল্লেখ্য, আয়াত থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, শাসন-কর্তৃত্ব পুরুষের হাতে থাকাই ইসলামের কাম্য। এটা ইসলামের একটা পরিবারবান্ধব নীতি। অতএব ইসলামের কাম্য এই বিষয়টি ধরে রাখার স্বার্থেও সম্পদ পুরুষের হাতে থাকাই বাঞ্ছনীয়।

আরও উল্লেখ্য যে, স্ত্রীকে সম্পদ লিখে দেয়া না-জায়েয আমরা এটা বলছি না। পুরুষ সম্পদের মালিক হলে সে তার সম্পদ স্ত্রী বা যে কাউকে দিয়ে দিতে পারে, মালিক হিসেবে সেটা করার স্বাধীনতা তার রয়েছে, সেটা করা তার জন্য না-জায়েয নয়, তবে কর্তৃত্ব হাতছাড়া হবে এমনভাবে কাউকে সম্পদ লিখে দেয়া তার জন্য সর্বোপরি গোটা পরিবারের জন্য খারাপ পরিণতি ডেকে আনতে পারে বিধায় তা ভাল নয়। তবে হাঁ কর্তৃত্ব বহাল থাকবে এমনভাবে ছিটেফোটা কিছু লিখে দেয়া হলে তাকে মন্দ আখ্যায়িত করা যায় না।

৪. জীবদ্দশায় সন্তানদের নামে ধন-সম্পদ জমি-জমা, বাড়ি গাড়ি লিখে দেয়া ভুল। যে কারণে স্ত্রীর নামে ধন-সম্পদ ইত্যাদি লিখে দেয়া ভুল

www.maktabatulabrar.com

(যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্ববর্তী ৩ নম্বরে প্রদান করা হয়েছে।) একই কারণে সন্তানদের নামে সেগুলো লিখে দেয়াও ভুল। আমরা পত্র-পত্রিকা মারফত এমন বহু ঘটনা জানতে পারছি যে, কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক পিতা-মাতা সন্তানদের নামে সব লিখে দেয়ার পর সেই সন্তানরা সেই পিতা-মাতার খোঁজ-খবরও রাখে না, ফলে সেই পিতা-মাতাকে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়। এ দিকটাও বিবেচনায় রাখার মত বৈ কি। তবে হাঁ কোন পিতা-মাতা তাদের মৃত্যু পরবর্তী সম্পদ বণ্টনে বে-ইনসাফী হওয়ার প্রবল আশংকা বোধ করলে ভিন্ন কথা। সে ক্ষেত্রে জীবদ্দশায় সন্তানাদির নামে সম্পদ দিয়ে দিলেও সকলকে সমান পরিমাণ দেয়া উত্তম। হাঁ কোন সন্তান উপার্জনে অক্ষম বা কোন সন্তান দ্বীনী লাইনে মশগুল থাকার কারণে আয়-উপার্জনে পিছিয়ে থাকার মত হলে তাকে কিছু বেশি দেয়া যেতে পারে।

"ধন-সম্পদ বিষয়ক কিছু ভুল চিন্তা" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- ধন-সম্পদ না থাকলে জীবনের কোন মূল্য নেই– এই চিন্তা ভুল।
- বিদেশে উপার্জন করতে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে ভুল।
- স্ত্রীর নামে ধন-সম্পদ জমি-জমা, বাড়ি গাড়ি লিখে দেয়া ভুল।
- জীবদ্দশায় সন্তানদের নামে ধন-সম্পদ জমি-জমা, বাড়ি গাড়ি লিখে দেয়া ভুল।

দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত কিছু ভুল চিন্তা

১. **প্রেমে পড়ামাত্র হুট করে বিয়ের চিন্তা করা ভুল।** একটা দাম্পত্য জীবন গড়ার জন্য অনেক কিছু ভাববার ও দেখবার রয়েছে। যে ছেলে বা মেয়ের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হবে তার সঙ্গে স্বভাব-চরিত্রের মিল হবে কি না, মন-মেজাযের মিল হবে কি না, চিন্তা-চেতনার মিল হবে কি না, রুচি ও চাহিদার মিল হবে কি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

না, চাওয়া পাওয়ার ধরনে মিল হবে কি না, ইত্যাদি অনেক কিছু ভাববার আছে। এর জন্য উভয়ের বংশ, পেশা, শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান অনেক কিছু দেখার রয়েছে। সাময়িক প্রেমের ঘূর্ণাবর্তে পড়া ছেলে মেয়েদের এতকিছু ভাববার বিলম্ব সয় কোথায়! ফলে প্রেমে পড়ে হুট করে তারা বিয়ের সিদ্ধান্তে পৌঁছে যায় এবং পরবর্তীতে মন-মেজায, রুচি, চাহিদা, চিন্তা-চেতনা ইত্যাদির মিল না হওয়ার কারণে তাদেরকে পস্তাতে হয় নতুবা তাদের সংসারে ভাঙ্গন অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়।

২. **পাত্রী নির্বাচনে শুধু রূপ-লাবণ্য দেখা ভুল**। পূর্বেই বলা হয়েছে, একটা দাম্পত্য জীবন গড়ার জন্য অনেক কিছু ভাববার ও দেখবার রয়েছে। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করার ক্ষেত্রে দম্পতির মধ্যে স্বভাব-চরিত্রের মিল হবে কি না, মন-মেজাযের মিল হবে কি না, চিন্তা-চেতনার মিল হবে কি না, রুচি ও চাহিদার মিল হবে কি না, চাওয়া পাওয়ার ধরনে মিল হবে কি না, ইত্যাদি অনেক কিছু ভাববার আছে। এর জন্য উভয়ের বংশ, পেশা, শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান অনেক কিছু দেখার রয়েছে। সর্বোপরি মুসলমান হিসেবে দ্বীনদারীর দিকটা দেখার রয়েছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব। একটা দাম্পত্য জীবনের জন্য শুধু রূপ-লাবণ্যের আকর্ষণ থাকাই যথেষ্ট নয়। দাম্পত্য জীবনের শুরুতে যখন যৌবনের উচ্ছলতা বেশি থাকে তখন রূপ-লাবণ্য মূখ্য বিষয় অনুভূত হলেও দাম্পত্য জীবনের স্থায়িত্ব ও স্থায়ী সুখ-শান্তির ক্ষেত্রে তা মূখ্য ভূমিকা রাখে না। পরবর্তীতে স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, গুণাবলী ইত্যাদিই মূখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। তাই দেখা যায় শুধু রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বহু দাম্পত্য জীবন অন্যান্য দিকগুলোর অনুপস্থিতির কারণে স্থায়ী হতে পারে না। এ জন্যই হাদীছে বলা হয়েছে,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, নারীদের বিয়ে করা হয় চারটা জিনিস দেখে: তার সম্পদ দেখে, তার বংশ দেখে, তার রূপ-লাবণ্য দেখে এবং তার দ্বীন দেখে। তবে তোমরা দ্বীনের দিকটাকে প্রাধান্য দিও। অন্যথায় মরেছো! (বোখারী ও মুসলিম) উল্লেখ্য, দ্বীনদারির মধ্যে স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, গুণাবলী ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা দ্বীনদারী মানুষের স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও গুণাবলী ভাল করে দেয়। অতএব দ্বীনদারী পাওয়া গেলে স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার ও গুণাবলী অনুকূলে পাওয়ারই আশা করা যায়।

৩. **পিতা-মাতার অজান্তে বিয়ে করার চিন্তা ভুল**। সাধারণত যে পুরুষ বা নারী সাময়িক প্রেমে পড়ে অসময়ে বা সার্বিক বিচারে অনুপযুক্ত স্থানে বিবাহ বন্ধনের চিন্তা করে, তারা পিতা-মাতা সেটা মেনে নিবে না ভেবে পিতা-মাতার অজান্তেই বিয়ে করার চিন্তা করে থাকে। কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ছেলে-মেয়ে প্রায়শই পরবর্তীতে বুঝতে পারে ঐই মেয়ের সাথে বা ঐ ছেলের সাথে বংশ, গোত্র, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে মন-মেজাযের মিল হচ্ছে না, চাহিদা রুচির মিল হচ্ছে না, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার মিল হচ্ছে না। তখন উপলব্ধিতে আসে বিয়ের আগে এসব বিষয় ভাববার প্রয়োজন ছিল। বিয়ের বিষয়ে সমঝদার মুরব্বীদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে অগ্রসর হলে সেই মুরব্বীগণ ঠাণ্ডা মাথায় এসব বিষয়ে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। তারা তাদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন। কিন্তু তা যে করা হয়নি। এখন সংশোধনেরও পথ নেই। এখন মনস্তাপে ক্লিষ্ট হওয়া বৈ গত্যন্তর নেই। তদুপরি পিতা-মাতার অজান্তে বিয়ে হলে পিতা-মাতা প্রায়শই সেটা সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারেন না। অনেক ক্ষেত্রে আত্মীয়-স্বজনদের অনুরোধে বা সামাজিক কারণে তারা মেনে নিলেও তাদের মনে যে কষ্ট থেকে যায় তার কারণে সারা জীবন পদে পদে বিভিন্ন রকম বিরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ পেয়ে থাকে, যা সারা জীবন ঐ দম্পতিকে ভোগ করে যেতে হয়। তাদের দাম্পত্য

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

জীবনে নিরংকুশ শান্তির পথে এটা একটা চিরস্থায়ী অন্তরায় হয়ে থাকে, এক অনপনীয় দাঁগ হয়ে থাকে তাদের জীবনে। সারকথা পিতা-মাতার অজান্তে বিয়ে করা অপরিনামদর্শিতা তো বটেই তদুপরি এটা নিজেদেরই দাম্পত্য জীবনের শান্তির পথে একটা চিরস্থায়ী অন্তরায় দাঁড় করে দেয়ার নামান্তর।

৪. **শ্বশুরের সম্পদ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চিন্তা ভুল।** আমাদের সমাজে অনেক বিয়েপ্রার্থী যুবক শ্বশুরের সম্পদ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চিন্তা করে থাকে। শ্বশুরের খুব সম্পদ না থাকলেও যৌতুক আকারে যতটুকু বাগিয়ে নেয়া যায় তার মাধ্যমে কিছুটা হলেও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চিন্তা করে থাকে। অনেক পিতা-মাতাও ছেলেকে বিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে এরূপ চিন্তা করে থাকে। এটা ভুল চিন্তা। যে স্বামী স্ত্রীর দিক থেকে যৌতুক আদায় করে সে শুরুতেই তার স্ত্রী ও স্ত্রীপক্ষের লোকজনের নিকট ইতর প্রতিপন্ন হয়ে যায়। সে কোনদিন স্ত্রী ও স্ত্রীপক্ষের লোকজনের নিকট আত্মমর্যাদাসম্পন্ন জামাতা হিসেবে মর্যাদা পায় না। তদুপরি শ্বশুরের সম্পদে প্রতিষ্ঠিত হতে পারলেও সে কোনদিন স্ত্রী ও স্ত্রীপক্ষের লোকজনের নিকট মাথা উঁচু করতে পারে না। সম্পদশালী হলেও সে সংসারের কর্তৃত্বসুলভ মনোভাব অর্জন করতে পারে না, একটা নিচুতাবোধ সারাজীবন তাকে মানসিক যন্ত্রণা দিতে থাকে। তার আত্মমর্যাদা ঐ সম্পদের পদতলে পিষ্ট হয়ে যায়। এরূপ সম্পদশালিতা কাম্য হতে পারে না। ধিক সেই সম্পদশালিতাকে যে সম্পদশালিতা মাথা নিচু করে দেয়! ধিক সেই সম্পদশালিতাকে যে সম্পদশালিতা মানসিক যন্ত্রণা বয়ে আনে!! ধিক সেই সম্পদশালিতাকে যে সম্পদশালিতা মর্যাদা নয় বরং অমর্যাদার কারণ হয়ে দাঁড়ায়!!! আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে টাকা-পয়সা কুড়ানোর কাজ তো রাস্তাঘাটের ফকীররাও করে থাকে।

৫. **ভালবাসার আতিশয্যে শুরুতে বিবিকে শাসন না করে ছাড় দেয়া ভুল।** স্ত্রীকে মহব্বত করতে হবে, আদর-সোহাগ করতে হবে এটা যেমন শরীয়তের বিধান, তেমনি শরীয়ত স্বামীকে স্ত্রীর কর্তা

www.maktabatulabrar.com

বানিয়েছে তাই কর্তা হিসেবে স্ত্রীকে শাসন করাও স্বামীর উপর আরোপিত শরীয়তের বিধান। কিন্তু অনেকেই এই ভুল করেন যে, জীবনের শুরুতে ভালবাসার আতিশয্যে স্ত্রীকে কোনোভাবেই শাসন করেন না, ভুল-বিচ্যুতি করলেও তা শোধরাতে বলেন না, ফলে স্ত্রীর স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পেতে থাকে, সে শাসনবিহীন চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। তারপর একটা সময় আসে যখন স্ত্রীকে শাসন করতে গেলে সে এটাকে অস্বাভাবিক মনে করে বেঁকে বসে। সে তখন ভাবে স্বামী তো পূর্বে এমন ছিল না, তাহলে কি স্বামী আমার প্রতি এখন বিরূপ হয়ে উঠেছে? শুরু থেকেই ধীরে ধীরে শাসন করলে এটাকেই সে স্বাভাবিক ভেবে নিত এবং এতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠত। তাহলে পরবর্তীতে কোনো সময়ই তাকে প্রয়োজনীয় শাসন করা ও তার দ্বারা তা মানানো স্বামীর জন্য জটিল হয়ে দাঁড়াত না। তাই দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকে স্ত্রীকে আদর-সোহাগ ও প্রেম-প্রীতির সাথে সাথে পরিমিত শাসনও করা চাই। আদর-সোহাগও চলবে, শাসনও চলবে। আদর-সোহাগ ও শাসন উভয়টার সমন্বয়ে চলতে হবে, তাহলে ভারসাম্য গড়ে উঠবে। অন্যথায় শাসন একেবারেই বাদ দিয়ে শুধু আদর-সোহাগ চালালে স্ত্রীর মধ্যে বল্গাহীনতা দেখা দিবে। পক্ষান্তরে পরিমিত আদর-সোহাগে ত্রুটি রেখে শুধুই শাসন বা মাত্রাতিরিক্ত শাসন চালাতে থাকলে দাম্পত্য জীবন রসকষহীন ও রুক্ষ হয়ে উঠবে।

৬. **একাধিক বিয়ে করতে হলে তা গোপন রাখার চিন্তা করা ভুল।** ইসলাম প্রয়োজনে পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ে (একসঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত) জায়েয রেখেছে। যে ব্যক্তি সব স্ত্রীর মাঝে সমতার ব্যবহার রক্ষা করে চলতে পারে তার জন্য একাধিক বিয়েতে শরীয়তগত কোন সমস্যা নেই। এরূপ লোকের একাধিক বিয়েকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হলে প্রকারান্তরে সেটা শরীয়তের একটা বিধানকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হবে, যা ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নিঃসন্দেহে। অতএব প্রয়োজনবোধে কেউ যদি একাধিক বিয়ে করতে চায় আর পূর্বের স্ত্রী তাতে বেঁকে বসবে এবং ঝামেলা করবে বোধ হয় তাহলে তার সমধান এই নয় যে, পরবর্তী বিয়ে গোপন রাখবে। গোপন রাখলে পরবর্তীতে একদিন না একদিন তা জানাজানি হবেই, তখনও তো ঝামেলা হবে, তাহলে গোপন রেখে ঝামেলা এড়ানো গেল কৈ? বরং গোপন রাখাকে পূর্বের স্ত্রী স্বামীর মানসিক দুর্বলতা ভেবে তার উপর খুব বেশি জেঁকে বসতে পারে, খুব বেশি ঝামেলা শুরু করতে পারে। তদুপরি গোপন রাখতে গিয়ে সর্বক্ষণ তাকে স্ত্রীর কাছে তো বটেই বন্ধু-বান্ধবদের কাছে এবং সমাজের কাছেও চোরের মত চলতে হবে। শরীয়ত যেটাকে খারাপ মনে করেনি, স্ত্রী বা বন্ধু-বান্ধব কিংবা সমাজ সেটাকে খারাপ মনে করলে কি এসে যায়? তার জন্য চোরের মত আত্মগোপনে চলে যেতে হবে কেন? শরীয়ত তো বিয়েকে জানান দিয়ে করতে উৎসাহিত করেছে, তা সেটা প্রথম বিয়েই হোক আর পরবর্তী বিয়ে হোক।

অনেকে আবার পরবর্তী স্ত্রী এবং সেই পক্ষের লোকজনের কাছে আগের স্ত্রী সম্পর্কে তথ্য গোপন রাখে বা স্পষ্টত আগের বিয়ের কথা অস্বীকার করে নেয় এতেও কিন্তু ঝামেলা এড়ানো সম্ভব হয় না। একদিন না একদিন সব জানাজানি হয়েই যায়, তখন ঝামেলা পোহাতেই হয়। ঝামেলা থেকে মুক্তি লাভ হয় না। মাঝখানে লাভ এতটুকু হয় যে, কিছুদিন চোরের মত থাকতে হয়। তদুপরি মিথ্যা বা প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে পরবর্তী বিয়ে সম্পন্ন করায় সেই মিথ্যা ও প্রতারণার কারণে পরবর্তী বিয়েতে বে-বরকতি এসে থাকে। পাপ পন্থায় অর্জিত কোন কিছুতেই বরকত হয় না।

তাই একাধিক বিয়ে যদি করতেই হয় তাহলে শুরুতেই সবকিছু জানান দিয়ে, সকলকে জানান দিয়ে বির বাহাদুরের মত স্বচ্ছ সত্তায় দাঁড় হয়ে সেটা করুন। খুটিনাটি কিছু ঝামেলা হলেও শুরুতে কিছুদিন হয়ে একটা নিষ্পত্তির পর্যায়ে এসে দাঁড় হবে। তাতে অন্তত

www.maktabatulabrar.com

গোপন রাখার অন্তর্বর্তীকালীন সময়টুকু চোরের মত থাকতে হবে না। সর্বোপরি এভাবে জানান দিয়ে দ্বিতীয় তৃতীয় বিয়ে করার প্রচলন ঘটলে সমাজ যে একাধিক বিয়ের মত একটা বৈধ ও শরীয়তসম্মত বিষয়কে খারাপ মনে করছে সেই খারাপ মনে করার মাত্রা হ্রাস পেতে থাকবে। বলা যায় সমাজের প্রচলিত ভুল ধারণার সংস্কার হতে থাকবে।

৭. **প্রবাস গমনকালে বিয়ে করে যাওয়া ভুল।** আমাদের সমাজে অনেক যুবক বিদেশ গমনকালে বিয়ে করে কয়েকদিন স্ত্রীর সঙ্গে থেকে তারপর বিদেশে পাড়ি জমায়। অনেক পিতা-মাতাও তাদের পুত্রকে বিদেশ পাঠানোর সময় তড়িঘড়ি করে হলেও বিয়ে দিয়ে তারপর বিদেশে পাঠায়। মনে করে বিয়ে দিয়ে দিলে সে ঘরমুখী থাকবে, দেশমুখী থাকবে, বিদেশে স্থায়ী হওয়ার চিন্তা করবে না। কিন্তু এই চিন্তা ভুল কয়েক কারণে। ১. এতে সদ্য বিয়ে করে যাওয়া স্বামী তার নববধুর চিন্তায় এতটা বিভোর হয়ে পড়তে পারে যা তার কর্মের মনোযোগিতা বিনষ্টের কারণ ঘটতে পারে, কর্ম অঙ্গনে সে ব্যর্থ প্রমাণিত হয়ে নিয়োগকর্তাদের অসন্তোষভাজন হয়ে দাঁড়াতে পারে। ২. এতে ছেলে ও মেয়ে উভয়েই একে অপরের চরিত্র সম্বন্ধে দুশ্চিন্তায় ভোগে এবং এই দুশ্চিন্তা তাদের মানসিকভাবে পীড়া দেয়। এরূপ দুশ্চিন্তা যে একেবারেই অমূলক নয় তা তো প্রবাসে থাকা লোকজন ও দেশে রয়ে যাওয়া তাদের স্ত্রীদের অবস্থা ও ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করলেই সহজে জানা যায়। ৩. বিয়ে হওয়ার আগ পর্যন্ত যৌন জীবন এক ধারায় চলতে থাকে। কিন্তু বিয়ে হওয়ার পর যখন একবার দাম্পত্য জীবনের তথা যৌন জীবনের বাস্তব স্বাদ উপলব্ধি শুরু হয় তারপর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে তাদের পক্ষে পবিত্র থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের সমাজে প্রবাসীদের স্ত্রীদের বিপথগামী হওয়ার নিত্য ঘটনাবলী তার স্পষ্ট প্রমাণ। ৪. যতদিন কোন মেয়ের বিয়ে না হয় ততদিন তার পিতা-মাতা যেভাবে মেয়ের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করেন এবং তা করার গুরুত্ব উপলব্ধি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করে থাকেন। বিয়ে হয়ে যাওয়ার পর সেই দায়িত্ব পালনে কিছুটা হলেও তারা শিথিল হন এই ভেবে যে, এখন সে দায়িত্ব তার স্বামীর উপর বর্তেছে। এ অবস্থায় তার স্বামীও বিদেশে। তাহলে রাখাল বিহীন মেষপালের উপর হিংস্র প্রাণী যেমন সহজে আক্রমণের সুযোগ পায় তেমনি এই নারীর উপরও লোলুপদৃষ্টি নিয়ে সহজেই অনেকে এগিয়ে আসার চিন্তা করে থাকে। ৫. শরীয়তের দৃষ্টিতেও প্রবাসীরা সাধারণত যত দীর্ঘদিন স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে সেরূপ থাকার অনুমতি নেই। স্ত্রীর অনুমতি ছাড়া ৪ মাসের বেশি তার থেকে পৃথক থাকা যায় না। অনুমতি স্বাপেক্ষে তার চেয়ে বেশি দিন থাকারও অনুমতি রয়েছে সত্য তবে স্ত্রীর অবস্থার প্রতি লক্ষ রাখা উচিত। কিন্তু বহুবিধ কারণে প্রবাসীদের পক্ষে এসব মানা সম্ভব হয়ে ওঠে না। আবার অনেক স্ত্রী সন্তুষ্টচিত্তে অনুমতি দেয়ও না। সেরূপ ক্ষেত্রে প্রবাসীদের পক্ষে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক নগাড়ে এত দীর্ঘকাল প্রবাসে থাকার বৈধতা প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে যায়।

"দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত কিছু ভুল চিন্তা" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- প্রেমে পড়ামাত্র হুট করে বিয়ের চিন্তা করা ভুল।
- পাত্রী নির্বাচনে শুধু রূপ-লাবণ্য দেখা ভুল।
- পিতা-মাতার অজান্তে বিয়ে করার চিন্তা ভুল।
- শ্বশুরের সম্পদ দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চিন্তা ভুল।
- ভালবাসার আতিশয্যে শুরুতে বিবিকে শাসন না করে ছাড় দেয়া ভুল।
- একাধিক বিয়ে করতে হলে তা গোপন রাখার চিন্তা করা ভুল।
- প্রবাস গমনকালে বিয়ে করে যাওয়া ভুল।

নব বধূদের কিছু ভুল চিন্তা

১. **স্বামীকে তার মাতা-পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা ভুল।** অনেক নববধুই স্বামীর সংসারে এসেই একান্তভুক্ত না থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার

www.maktabatulabrar.com

চিন্তায় উতলা হয়ে ওঠে। স্বামীকে তার পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা-ফিকিরে লিপ্ত হয়। এটা ভুল চিন্তা। নববধুর ভাবা উচিত সে কেবলমাত্র এই পুরুষটির আপন হয়েছে অথচ তার পিতা-মাতা তার অনেক আগ থেকেই বরং তার জীবনের শুরু থেকে আপন। সেই পিতা-মাতা থেকে তথা শ্বশুর শাশুড়ি থেকে তার স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করলে শ্বশুর-শাশুড়ির প্রতি অমানবিকতা করা হবে, সেটা নিঃসন্দেহে পাপ। আর স্বামীকে তার পিতা-মাতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র সংসার গড়ে তুলতে সক্ষম হলেও যেহেতু সেটা পাপের পন্থায় হচ্ছে তাই এই ভিন্ন সংসার গড়ে তোলাতে বরকত হবে না। পাপ পন্থায় অর্জিত কোন কিছুতেই বরকত হয় না। তদুপরি নববধুর এটাও ভাবা উচিত যে, অন্য মানুষের সঙ্গে সে যেমনটা করবে আল্লাহ তার ব্যাপারেও তেমনটা ঘটাবেন– এটাই আল্লাহ পাকের নীতি। আল্লাহ পাকের নীতি হল কোন লোক আল্লাহর বান্দাদের সাথে যে নীতিতে চলবে আল্লাহ পাকও তার ক্ষেত্রে সেই নীতি অবলম্বন করবেন। অতএব সে শ্বশুর-শাশুড়ি থেকে তাদের পুত্রকে বিচ্ছিন্ন করে শ্বশুর-শাশুড়িকে কষ্টে ভোগালে ভবিষ্যতে সে যখন শাশুড়ি হবে তখন আল্লাহ পাক তার পুত্রকেও তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাকে এরূপ কষ্টে ভোগাবেন। "যেমন কর্ম তেমন ফল" কথাটা স্মরণ রাখা চাই।

২. **স্বামীকে বশীভূত করার চিন্তা ভুল।** ইসলাম বলেছে স্ত্রী স্বামীকে বশীভূত করা নয় বরং স্বামীর বশীভূত থাকবে। দু' একটা ব্যতিক্রম ছাড়া সামগ্রিকভাবে পুরুষরাই মেধা, মনন, চিন্তা, দুরদর্শিতা, পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার দক্ষতা ইত্যাদি ক্ষেত্রে অগ্রসর। তাই সামগ্রিক বিবেচনায় পুরুষদের হাতে পরিবারের কর্তৃত্ব থাকার কথা ইসলাম বলেছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.﴾

অর্থাৎ, পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বকারী। এ কারণে যে, আল্লাহ কতককে (পুরুষকে) কতকের উপর (নারীর উপর) শ্রেষ্ঠত্ব দান

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করেছেন আর এ কারণে যে, পুরুষরা তাদের সম্পদ ব্যয় করে। (সূরা নিছা: ৩৪)

এ আয়াতে নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব থাকার কথা বলা হয়েছে এবং নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব কেন থাকবে তার যৌক্তিক কারণও তুলে ধরা হয়েছে। আর কর্তৃত্ব পুরুষদের অনুকূলে থাকার অর্থই হল স্ত্রীদেরকে স্বামীদের বশীভূত হয়ে থাকতে হবে। অতএব কোন নারী যদি তার স্বামীকে তার বশীভূত রাখার চিন্তা করে তাহলে তার চিন্তা ভুল। স্বামীকে বশীভূত করার জন্য যদি কোন কুফরী কালাম করে, তাবীজ তুমার করে, এবং এভাবে স্বামীকে কিছুটা বশীভূত করতে সক্ষম হয়ও, তাহলে শরীয়ত-বিরুদ্ধ পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে তার গোনাহ হবে।

৩. **স্বামীর সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার চিন্তা ভুল।** ইসলামকর্তৃক স্বামী কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে কোন নারী হয়তো ভাবতে পারে এভাবে স্ত্রীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে, স্ত্রীর মর্যাদাকে খাটো করা হয়েছে। এই ভেবে সেই নারী স্বামীর সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার চিন্তা করে বা দাবি তোলে, তাহলে সেটা হবে সেই নারীর ভুল। ইসলাম যেসব গুণাবলীর কারণে স্বামীকে কর্তৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, সেই গুণাবলীতে নারীরা প্রাকৃতিকভাবেই পিছিয়ে, তাই এ ক্ষেত্রে সমমর্যাদা প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা প্রকৃতিবিরোধী চিন্তা। কোন কোন ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মায়ের শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে, সেক্ষেত্রে পিতা যেমন মায়ের সমান শ্রেষ্ঠত্বের দাবি তুললে সেটা হবে অমূলক দাবি, তদ্রূপ যে ক্ষেত্রে স্বামীর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে সে ক্ষেত্রেও স্বামীর সমান মর্যাদার দাবি তোলা স্ত্রীর জন্য হবে অমূলক। তাই কুরআনে কারীমে একজনকে যে মর্যাদা দেয়া হয়েছে অন্যকে তার সমান মর্যাদা কামনা না করে নিজ নিজ আমলে তৎপর হতে এবং আল্লাহর কাছে অন্যান্য সম্ভাব্য মর্যাদা কামনা করতে আদেশ করা হয়েছে। এবং বলা হয়েছে, আল্লাহ সব বিষয়েই ভাল অবগত আছেন। তাই কোন্ ক্ষেত্রে কাকে মর্যাদা দেয়া যুক্তিযুক্ত ও সংগত সে বিষয়টিও তাঁর অজানা নয়। ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদের কতককে অপর কতকের উপর যে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তা তোমরা কামনা করো না। পুরুষদের জন্য রয়েছে তাদের উপার্জন, নারীদের জন্য তাদের উপার্জন। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। (সূরা নিছা: ৩২)

৪. **স্বামীর সংসারে এসেই সংসারের কর্তৃত্ব বাগানোর চিন্তা ভুল।** কোন পুত্রকে বিয়ে দেয়ার পূর্বে দীর্ঘকাল যাবত সাংসারিক কর্তৃত্ব চলে আসতে থাকে ঐ পুত্রের মায়ের হাতে। অতএব ঐ সংসারে এসেই পুত্রবধূ যদি কর্তৃত্ব বাগানোর চিন্তা করে তাহলে তা হবে ভুল চিন্তা। তার জন্য পুত্রবধূকে অপেক্ষা করতে হবে। একটা সময়ে ঠিকই তার হাতে কর্তৃত্ব আসবে, তার জন্য তাড়াহুড়ো না করে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় পেলে অনেক শাশুড়ি অতি শীঘ্রই পুত্রবধূর হাতে সংসারের কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে থাকে। তাই কর্তৃত্ব পাওয়ার জন্য ভিন্ন রকমের ফন্দী ফিকিরে লিপ্ত না হয়ে যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দেয়াই হবে পুত্রবধূর বুদ্ধিমত্তার পরিচয়।

"নববধূদের কিছু ভুল চিন্তা" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- স্বামীকে তার মাতা-পিতা থেকে বিচ্ছিন্ন করার চিন্তা ভুল।
- স্বামীকে বশীভূত করার চিন্তা ভুল।
- স্বামীর সমমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার চিন্তা ভুল।
- স্বামীর সংসারে এসেই সংসারের কর্তৃত্ব বাগানোর চিন্তা ভুল।

সন্তানাদির বিষয়ে কিছু ভুল চিন্তা

১. **শুরুতে শাসন না করে ছাড় দেয়া ভুল।** অনেকেই সন্তানদের শুরু বয়সে শুধু আদরই করে থাকেন, মোটেই শাসন করেন না। তারা মনে করেন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সন্তানের এমন কী আর বয়স হয়েছে! বয়স হলে শাসন করা যাবে। এই ভেবে শুরুতে শাসন না করে বল্গাহীন ছেড়ে দেয়। এটা ভুল চিন্তা। সন্তানকে আদরও করতে হবে, পরিমিত শাসনও করতে হবে। সন্তানের বে-আদবী, অবাধ্যতা, হুকুম লঙ্ঘন ইত্যাদি ক্ষেত্রে শাসন করতে হবে এবং শাসন শুরু থেকেই করতে হবে। নতুবা একবার বল্গাহীন স্বাধীনতায় চলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলে পরবর্তীতে শাসন তার কাছে অস্বাভাবিক বোধ হওয়ায় সে তা মানতে বেঁকে বসলে তখন শাসন মানানো যাবে না। কিংবা বলা যায় পরবর্তীতে যখন তার ঘাড় তেড়া হয়ে যাবে তখন আর শাসন মানানো সম্ভব হবে না। কথায় বলে কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ পাকলে করে টাস টাস।

২. **শুরুতে ইবাদত-বন্দেগীর অভ্যাস না করানো ভুল।** সন্তান যতদিন না-বালেগ থাকে ততদিন তার উপর ইবাদত-বন্দেগী ফরয না হলেও না-বালেগ থাকতেই তাকে নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগীতে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তাহলে পরবর্তীতে ফরয হওয়ার পর সে ইবাদত-বন্দেগীতে নিয়মিত হতে পারবে। আগে থেকে অভ্যাস গড়ে না তুললে ফরয হওয়ার পর তাকে নিয়মিত করাতে বেগ পেতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে অভ্যাস না হওয়ায় এবং ইতিমধ্যে তার রগ তেড়া হয়ে যাওয়ায় তাকে মানানোই সম্ভব হবে না। এজন্যই শরীয়তে সাত বছর বয়স হলেই সন্তানকে নামাযের আদেশ দিতে এবং দশ বছর বয়স হলে শাসন করে হলেও নামায পড়াতে বলা হয়েছে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

« مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ ».

(رواه أبو داود بإسناد حسن برقم ٤٩١)

অর্থাৎ, তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাযের নির্দেশ দাও, দশ বছর বয়স হলে সে জন্য মার দাও (অর্থাৎ, শাসন কর) আর তাদের বিছানা আলাদা করে দাও।

(আবূ দাউদ: হাদীছ নং ৪৯১)

www.maktabatulabrar.com

৩. **অবৈধভাবে উপার্জন করে হলেও সন্তানাদির ভবিষ্যত গড়ার চিন্তা করা ভুল।** সন্তানদের দ্বীনী, রূহানী তালীম তরবিয়াতের পাশাপাশি তাদের ভবিষ্যত বৈষয়িক দিক চিন্তার কথাও শরীয়তে রয়েছে। ভবিষ্যতে যেন মানুষের কাছে সন্তানদের হাত পাততে না হয় সম্ভব হলে সে ব্যবস্থা করে যাওয়াকে হাদীছে উত্তম বলা হয়েছে। একটা দীর্ঘ হাদীছের একাংশে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ.

অর্থাৎ, তুমি তোমার ওয়ারিছদেরকে স্বচ্ছল রেখে যাবে– এটা উত্তম তার চেয়ে যে, তাদেরকে রেখে যাবে এমন দরিদ্র অবস্থায় যে, তারা মানুষের কাছে হাত পাতবে। (বোখারী: হাদীছ নং ১২৯৫ ও মুসলিম: হাদীছ নং ১৬২৮) তবে উল্লেখ্য, সন্তানাদির ভবিষ্যত গড়ে তোলার যে বিষয়টিকে হাদীছে উত্তম বলা হয়েছে তা অবশ্যই হতে হবে বৈধ উপার্জনের মাধ্যমে। অবৈধ উপার্জনের মাধ্যমে সেটা করতে যাওয়ার অর্থ হবে উত্তম আমলের জন্য হারামের অনুবর্তী হওয়া, যা কোনোক্রমেই অনুমোদিত হতে পারে না।

৪. **শুধু বৈষয়িক চিন্তায় সন্তানাদিকে বিদেশে সেটেলড করার চিন্তা ভুল।** অনেকেই তাদের সন্তান বিদেশে সেটেলড হোক তা খুব কামনা করেন এবং সন্তানকে বিদেশে সেটেলড করতে পারলে মনে মনে আনন্দ বোধ করেন, গর্ববোধ করেন। এই চিন্তা-চেতনা ভুল। ভুল কয়েকটা কারণে। যথা: ১. সন্তান কাছে থাকাই আল্লাহর নেয়ামত। কুরআনে কারীমে সূরা মুদ্দাছছিরের ১৩ নং আয়াতে এক ব্যক্তির প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের বিবরণ দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, وَبَنِينَ شُهُودًا (অর্থাৎ, তার সন্তানাদি তার কাছে উপস্থিত।) এ থেকে বুঝা যায় সন্তানাদি কাছে থাকা আল্লাহর এক নেয়ামত। এটা যে নেয়ামত তা বুঝে আসে সন্তান বিদেশে সেটেল্‌ড করা পিতা-মাতা যখন বৃদ্ধ বয়সে রোগাক্রান্ত হন আর তাদের দেখাশোনার কেউ থাকে না তখন, এমনকি মৃত্যুবরণ করলেও কাজের লোক ছাড়া দাফন-কাফন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করার মতও কেউ থাকে না। বস্তুত সন্তানাদি কাছে থাকলে তারাও পিতা-মাতার খেদমতের সুযোগ পাবে, পিতা-মাতাও সন্তানাদিকে কাছে দেখে চোখ জুড়াবেন এতেই তো আনন্দ। আমার সন্তান অমুক দেশে সেটেল্ড– এই বলে ফুটানী দেখানো ছাড়া সন্তানকে বিদেশে সেটেলড করার মধ্যে আর কী প্রাপ্তি আছে? ২. সন্তানাদিকে বিদেশে পাঠানো ও সেটেল্ড করা হলে পিতা-মাতার অবর্তমানে দ্বীনী দিক থেকে তাদের বে-পরোয়া ও লাগামহীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। সন্তানদেরকে চোখের সামনে রেখেও যেখানে তাদেরকে সঠিক পথে চালানো কঠিন, সেখানে চোখের আড়াল করলে কী হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সন্তানদের দ্বীনী দিকটাকে যারা গুরুত্ব দেন না তাদের কাছে এটা তেমন ক্ষতির কিছু বিবেচিত না হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা সন্তানের অনেক বড় ক্ষতি করা। ৩. যাদেরকে আল্লাহ যে দেশে সৃষ্টি করেছেন সেই দেশের জন্য, সেই দেশের জনগণের জন্য যা করার রয়েছে বিদেশে সেটেল্ড লোকদের দ্বারা প্রায়সই তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। সাধারণত বিদেশে সেটেলড লোকদের মেধা, তাদের অর্জন, চেষ্টা সবকিছু স্বদেশ ও স্বদেশের লোকদের জন্য নয় বরং ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠার জন্যই ব্যয়িত হয়ে থাকে।

৫. **সন্তানকে বিদেশে পাঠানোর সময় বিয়ে দেয়া ভুল।** এ সম্বন্ধে পূর্বে "দাম্পত্য জীবন সম্পর্কিত কিছু ভুল" শীর্ষক পরিচ্ছেদের ৭ নং ধারাটি পড়ুন।

"সন্তানাদির বিষয়ে কিছু ভুল চিন্তা" শীর্ষক আলোচনার সারকথা হল–

- সন্তানাদিকে শুরুতে শাসন না করে ছাড় দেয়া ভুল।
- সন্তানাদিকে শুরুতে ইবাদত-বন্দেগীর অভ্যাস না করানো ভুল।
- অবৈধভাবে উপার্জন করে হলেও সন্তানাদির ভবিষ্যত গড়ার চিন্তা করা ভুল।
- শুধু বৈষয়িক চিন্তায় সন্তানাদিকে বিদেশে সেটেলড করার চিন্তা ভুল।
- সন্তানকে বিদেশে পাঠানোর সময় বিয়ে দেয়া ভুল।

www.maktabatulabrar.com

ব্যবসায়ীদের কিছু ভুল চিন্তা

১. **মালের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে চালিয়ে দেয়ার চিন্তা ভুল।** এই চিন্তা থেকে কোন মালে দোষ-ত্রুটি থাকলে সেটাকে ভাল মালের সঙ্গে এমনভাবে মিশিয়ে রাখা হয়, যাতে ক্রেতা তা ধরতে না পারে। এরই কারণে দেখা যায় একটা ফলের কোন এক পাশে দোষ থাকলে সে পাশকে নিচের দিকে রেখে ভাল পাশটা উপরের দিকে রেখে দেয়া হয়। এভাবে মাল চালিয়ে দেয়ার চিন্তা ভুল একারণে যে, ব্যবসায়ীকে মনে রাখতে হবে এটা এক ধরনের প্রতারণা ও পাপ। আর পাপ পন্থায় কখনও ব্যবসায় বরকত হয় না। সহীহ হাদীছে এসেছে একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার বাজারে গেলেন। একটা খাদ্যস্তুপ খুব ভাল লাগল। তিনি স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। ভেতরে কিছু ভেজা অনুভব করলেন। তখন বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলেন কী ব্যাপার? বিক্রেতা জবাব দিল ইয়া রসূলাল্লাহ! বৃষ্টি লেগেছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া বললেন, ভেজা অংশ উপরে রাখলে না কেন? তাহলে লোকেরা দেখে নিত (এবং ধোঁকায় পড়ত না।) তিনি আরও বললেন,

«مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ».

অর্থাৎ, যে ধোঁকা দেয় সে আমার আদর্শভুক্ত নয়। (সহীহ ইবনে হিব্বান, মুসনাদে বায্যার ও সুনানে দারিমী প্রভৃতি) সহীহ ইবনে হিব্বানের এক রেওয়ায়েতে অতিরিক্ত একথাও আছে যে, তিনি বললেন, وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ অর্থাৎ, ধোঁকা ও প্রতারণার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম।

২. **মালের মিথ্যা গুণাগুণ বর্ণনা করে চালিয়ে দেয়ার চিন্তাও ভুল চিন্তা।** অনেক সময় মালের যে গুণাগুণ নেই মিথ্যামিথ্যি সেসব গুণের কথা বলে মাল কাটতি করার চেষ্টা করা হয়। এভাবে মালের দোষ গোপন রেখে কিংবা মিথ্যা গুণাগুণ বলে মাল কাটতি করে সাময়িক লাভবান হওয়া গেলেও ভবিষ্যত ব্যবসা নষ্ট হয়ে যায়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কারণ, ক্রেতা যখন বুঝতে পারে তাকে ঠকানো হয়েছে, তার সাথে প্রতারণা করা হয়েছে, তখন সে ভবিষ্যতে আর ঐ ব্যবসায়ী থেকে মাল ক্রয় করে না। আর ক্রেতারা এক সময় না এক সময় বুঝেই যায় যে, তাকে ঠকানো হয়েছে। এভাবে ব্যবসায়ী ভবিষ্যতে আরও বহুদিনের ব্যবসার মুনাফা থেকে বঞ্চিত হয়। বস্তুত মালের দোষত্রুটি থাকলে বলে দেয়া এবং সত্য বলা দ্বারা ক্রেতার আস্থা অর্জিত হয়, সেই আস্থার ভিত্তিতে ঐ ক্রেতা ভবিষ্যতে আরও বহুবার তার কাছে আসে, এমনকি অন্যদেরকেও তার কাছে আসতে উদ্বুদ্ধ করে এই বলে যে, অমুক ব্যবসায়ী খাঁটি লোক, সে কাউকে ঠকায় না, কারও সাথে প্রতারণা করে না। তাই সত্য বলা দ্বারা একবার ব্যবসার মুনাফা কম হলেও ভবিষ্যতে বহুদিনের মুনাফা পাওয়ার এবং অনেকের থেকে মুনাফা পাওয়ার পথ প্রশস্ত হয়। এজন্যই হাদীছে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».

অর্থাৎ, যদি তারা সত্য বলে এবং (দোষ-ত্রুটি থাকলে) স্পষ্ট বলে দেয়, তাহলে তাদের ব্যবসায় বরকত হয়, আর যদি গোপন করে ও মিথ্যা বলে তাহলে তাদের ব্যবসার বরকত মোচন হয়ে যায়।
(বোখারী: হাদীছ নং ২০৭৯)

৩. **অবুঝ ক্রেতাদের থেকে দাম বেশি নিয়ে সাময়িক বেশি লাভবান হওয়ার চিন্তা ভুল।** যে ক্রেতা মালের দাম জানে না এমন ক্রেতা থেকে বেশি মূল্য রাখার চিন্তা ভুল চিন্তা। ব্যবসায়ীকে মনে রাখতে হবে এভাবে সাময়িক লাভ বেশি হয় মনে হলেও অন্য এক ভাইকে ঠকানো হচ্ছে। আর আল্লাহর নিয়ম হল অন্য ভাইয়ের সঙ্গে আমি যেমন মুআমালা করব আল্লাহও আমার সঙ্গে তেমনি মুআমালা করবেন। অতএব এভাবে অন্যকে ঠকালে পরিমাণে আমারও ঠকতে হবে।

www.maktabatulabrar.com

৪. **নকল ভেজাল মাল বিক্রি করে বেশি লাভবান হওয়ার চিন্তা ভুল।** অন্যের নামকরা মালামাল নকল করে দ্রুত সম্পদ গড়ে তোলার চিন্তা কিংবা নকল মালামাল বিক্রি করে বেশি লাভ করার চিন্তা ভুল চিন্তা। ব্যবসায়ীদের মনে রাখতে হবে নকল করা ও নকল মাল বিক্রি করায় পাপ হয় আর পাপের পন্থায় সম্পদ উপার্জন করলে সে সম্পদে বরকত হয় না, সে সম্পদ শান্তি বয়ে আনে না বরং বিভিন্ন রকম অশান্তি ও বিপদ ডেকে আনে। এভাবে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই তার ক্ষতি হয়। তদুপরি যে প্রতিষ্ঠান নকল ভেজাল মাল বিক্রি করে ক্রেতারা এক সময় না এক সময় তা বুঝতে সক্ষম হয়, তখন সেই প্রতিষ্ঠানের ক্রেতা হ্রাস পায়। এভাবে সেই প্রতিষ্ঠানের ব্যবসার ভবিষ্যত ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বস্তুত নকল ভেজাল মাল বিক্রি করা প্রতারণার শামিল। আর প্রতারণা করা শরীয়তে এত বড় গোনাহ যে, সহীহ হাদীছে ইরশাদ হয়েছে, যে প্রতারণা করে সে আমাদের আদর্শভুক্ত নয়, ধোঁকা ও প্রতারণার পরিণাম হচ্ছে জাহান্নাম। হাদীছটি এই পরিচ্ছেদের শুরুতে উল্লেখ করা হয়েছে।

৫. **নিজের লস দিয়ে হলেও পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীকে বসিয়ে দেয়ার চিন্তা ভুল।** কোন কোন ব্যবসায়ী তার পাশের ব্যবসায়ী যেন ব্যবসা করতে না পারে, সে যেন ব্যবসা থেকে আউট হয়ে যায়– এই চিন্তা থেকে নানান অপ-কৌশল অবলম্বন করে থাকে। কখনও ক্রেতাদেরকে বোঝায় পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ী মূল্য বেশি রাখে বা ভাল মাল রাখে না। কখনও পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীর নির্ধারিত ক্রেতাকে অল্প মূল্যে মাল প্রদানের অফার দেয়। এভাবে নিজে সাময়িক ঠকে হলেও তা করে শুধু এই চিন্তায় যে, পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ী এভাবে দিতে না পেরে সে এখান থেকে ব্যবসা গুটিয়ে নিবে, তারপর সে একাকী ব্যবসা করতে পারবে বা তারপর ইচ্ছেমত ক্রেতাদের থেকে দাম নিয়ে অতীতের ক্ষতি পুশিয়ে নিতে পারবে। এই চিন্তা ভুল এ কারণে যে, মুমিনের বিশ্বাস থাকা চাই "রিযিক বণ্টিত আছে।"

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.﴾

অর্থাৎ, আমি পার্থিব জীবনে তাদের মাঝে তাদের জীবন-জীবিকা বণ্টন করে রেখেছি। (সূরা শূরা: ৩২)

অতএব যার জন্য যা বণ্টিত আছে সে তা পাবেই। যার ভাগ্যে যা জোটার তা জুটবেই। তা ছাড়া পাশাপাশি এক ধরনের দোকান অধিক সংখ্যক থাকলে সেখানে ক্রেতাদের আনাগোনাও বাড়ে। কেননা ক্রেতারা তখন ভাবে এখানে অনেক দোকান আছে একটায় না একটায় আমার কাঙ্খিত পণ্য পেয়েই যাব। এভাবে ক্রেতাদের আনাগোনা বাড়লে তাতে সকলেরই বিক্রয় বাড়ে। ফলে সকলেই আগের তুলনায় বেশি লাভবান হয়।

৬. **ব্যবসা বড় করতে হলে সুদী লোন ছাড়া সম্ভব নয় এই চিন্তা ভুল।** অনেক ব্যবসায়ী চিন্তা করে থাকে যে, লোন না নিলে আমার ব্যবসা ছোটই থেকে যাবে। আর ব্যবসা বড় করতে না পারলে বেশি লাভবান হওয়া যাবে না। এই চিন্তা ভুল এ কারণে যে, ব্যবসাকে শুধু বড় করাই কাম্য নয়, শুধু লাভের পরিমাণ বেশি হওয়াই কাম্য নয়, বরকতপূর্ণ হওয়াও কাম্য। ব্যবসাকে শুধু বড় করাই কাম্য নয়, সেই ব্যবসার মাধ্যমে সুখ-শান্তি অর্জিত হওয়াও কাম্য। আর সূদী কারবারে কোন বরকত হয় না। যদি বড় ব্যবসা করেও কোন বরকত না হল, অনেক টাকা-পয়সা উপার্জন করেও সুখ-শান্তি পাওয়া না গেল, তাহলে সেই বড় ব্যবসা করে লাভ কী? পক্ষান্তরে ব্যবসা ছোট থাকলেও যদি আয়-উপার্জনে বরকত হয়, যা উপার্জন হয় তাতেই মনে সুখ-শান্তি থাকে, তাহলে অবশ্যই সেই ছোট ব্যবসাই উত্তম। সূদী কারবার সম্বন্ধে আল্লাহ পাক কি বলেছেন শুনুন।

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا.﴾

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, আল্লাহ সুদ (তথা সুদী কারবার-এর বরকত)কে মোচন করে দেন। (সূরা বাকারাহ: ২৭৬)

অনেক সময় ব্যবসায়ীদের এই ওয়াছওয়াছা হয় যে, সূদী কারবার করে অমুসলিমরা বড় বড় ব্যবসা-বাণিজ্য হাত করে ফেলেছে। এ অবস্থায় মুসলমানরা সুদকে এড়িয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চাইলে তারা বড় বড় ব্যবসা করতে পারবে না, ফলে মুসলিম জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে পিছিয়ে থাকবে। এভাবে অমুসলিম জাতি যেখানে এগিয়ে যাচ্ছে মুসলিম জাতি সেখানে পিছিয়ে থাকবে, মুসলিম জাতির উন্নতি হবে না। তাহলে শুনুন যে ব্যবসায়ে বরকত হবে না, যে ব্যবসায়ে সুখ-শান্তি অর্জিত হবে না, সর্বোপরি যে ব্যবসায়ে পরকালের ক্ষতি হবে মুসলমানদের দৃষ্টিতে তথা কুরআন সুন্নাহর দৃষ্টিতে সেটা উন্নতিই নয়। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে আমার লেখা "নফ্স ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা" নামক গ্রন্থের "ব্যবসায়ীদের কি কি ওয়াছওয়াছা হয়" শীর্ষক আলোচনাটি পড়ুন।

"ব্যবসায়ীদের কিছু ভুল চিন্তা" শীর্ষক আলোচনার সারকথা হল–

- মালের দোষ-ত্রুটি গোপন রেখে চালিয়ে দেয়ার চিন্তা ভুল।
- মালের মিথ্যা গুণাগুণ বর্ণনা করে চালিয়ে দেয়ার চিন্তা ভুল।
- অবুঝ ক্রেতাদের থেকে দাম বেশি নিয়ে সাময়িক বেশি লাভবান হওয়ার চিন্তা ভুল।
- নকল ভেজাল মাল বিক্রি করে বেশি লাভবান হওয়ার চিন্তা ভুল।
- নিজের লস দিয়ে হলেও পার্শ্ববর্তী ব্যবসায়ীকে বসিয়ে দেয়ার চিন্তা ভুল।
- সুদী লোন নিয়ে হলেও ব্যবসা বড় করতে হবে এই চিন্তা ভুল।

চাকরিজীবিদের কিছু ভুল চিন্তা

১. **বেতন মূল নয় উপরিটাই মূল এই চিন্তা ভুল।** অনেকে চাকরি সন্ধানের সূচনালগ্ন থেকেই ভাবতে থাকে একটা চাকরি যদি পাই তাহলে বেতন যা পাই না পাই উপরি তথা ঘুষ কী পরিমাণ থাকবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তা দিয়ে পোষাবে কি না সেটাই প্রধান লক্ষণীয়। তাই যেসব প্রতিষ্ঠানে ঘুষ উৎকোচের সুবিধা পাওয়া যায় (যেমন সাধারণত সরকারি প্রতিষ্ঠানে) সেখানে বেতন কম হলেও এবং ঘুষ দিয়ে হলেও চাকরি নেয়ার চেষ্টা করে থাকে। এভাবে শুরু থেকেই সে হারাম পথে উপার্জনের চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হয়। সে হালাল পথে থাকতেই চায় না। তাই এরকম লোকদের পক্ষে হালাল পথে থাকার সৌভাগ্যও নসীব হয় না। কারণ, সে হালাল পথে তথা পবিত্র পথে থাকার কামনাই করেনি। সে হালাল ও পবিত্র রিযিকের চিন্তা করলে এবং সেভাবে আল্লাহর কাছে দুআ করলে আল্লাহ তার জন্য সেভাবেই ব্যবস্থাপনা করে দিতেন। আল্লাহর নিয়ম হল যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র থাকার তাওফীক দান করেন। একটা দীর্ঘ হাদীছের একাংশে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ. ﴾

অর্থাৎ, যে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন।
(বোখারী ও মুসনাদে আহমাদ)

২. **আগে কামাই করে নেই তারপর হালাল-হারামের চিন্তা করা যাবে- এই চিন্তা ভুল**। এই চিন্তা ভুল এ কারণে যে, প্রথমে হারাম উপার্জন করে সেই হারামের উপর যে ভিত্তি দাঁড় হবে তা তো পুরোটাই হারাম হয়ে যাবে। তাহলে পরবর্তীতে তার পক্ষে হালাল বেছে চলার ফায়দা অর্জিত হবে না। তদুপরি প্রথমে হারাম রিযিকে যে দেহ গড়ে উঠবে যদি আল্লাহ তা ক্ষমা না করেন তাহলে পরবর্তীতে হালাল রিযিকের ব্যাপারে যত্নবান হলেও যে দেহ হারাম রিযিকে গড়ে উঠেছে তা তো জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে না। তাই শুরু থেকেই হালাল রিযিকের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া চাই। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّيَ بِحَرَامٍ. (وفي مجمع الزوائد قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ورجال أبي يعلى ثقات وفي بعضهم خلاف.)

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, হারাম রিযিক দ্বারা যে দেহ পুষ্ট হয় তা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসনাদে আবূ ইয়া'লা, মুসনাদে বাযযার ও তাবারানী)

হারাম জীবিকা গ্রহণের আরও বহুবিধ ক্ষতি রয়েছে। তার মধ্যে আর একটা বড় ক্ষতি হল দুআ কবূল না হওয়া। মুসলিম শরীফের এক দীর্ঘ হাদীছে এসেছে- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র রিযিক গ্রহণের কুরআনী নির্দেশ উল্লেখ করার পর বলেছেন, কেউ হাত তুলে দুআ করে বলে, হে আমার রব! হে আমার রব! ...

« وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ».

অর্থাৎ, অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, লেবাস-পোশাক হারাম, হারাম দ্বারা সে লালিত পালিত, তাহলে কীভাবে তার সেই দুআ কবূল হবে? (মুসলিম: হাদীছ নং ১০১৫)

৩. **যার চাকরি করা হচ্ছে আমার দ্বারা তার উন্নতি হল কি না এটা চিন্তা না করে শুধু নিজের বেতন- ভাতা বৃদ্ধির চিন্তা-ধান্ধায় থাকা ভুল**। এ রকম লোকের উন্নতি হয় না। কারণ সে তার মুহসিন (উপকারকারী) ভাইয়ের ক্ষতি করে কিংবা তার স্বার্থের কথা চিন্তা না করে শুধু নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করেছে। তাহলে হয় সে উপকারকারীর ক্ষতি করছে কিংবা সে স্বার্থপর, সে তার ভাইকে সহযোগিতা করছে না। আর এই দুই শ্রেণীর কারও উন্নতি হয় না। এক সহীহ হাদীছে এসেছে,

« مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ ». (رواه الحاكم في المستدرك برقم ٢٣٩٢ وقال : صحيح الإسناد على شرط مسلم، وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, যে অন্যকে (জানে, মালে বা ইজ্জতে) ক্ষতিগ্রস্ত করে আল্লাহ তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেন, আর যে অন্যের সাথে অন্যায় ও সীমালংঘন করে ঝগড়া করে আল্লাহ তার প্রতিবিধান করেন।
(মুস্তাদরাকে হাকিম: হাদীছ নং ২৩৪৫)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মুসলিম শরীফের এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে এসেছে,

« وَاللّٰهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ ».

অর্থাৎ, বান্দা যতক্ষণ তার ভাইয়ের সহযোগিতায় থাকে আল্লাহ তার সহযোগিতায় থাকেন। (মুসলিম: হাদীছ নং ২৬৯৯) বোঝা গেল কেউ শুধু স্বার্থপর হয়ে থাকল অন্যকে সহযোগিতা করল না তাহলে সেও আল্লাহর সহযোগিতা লাভ করতে পারবে না।

৪. **যোগ্যতা ও কর্ম দিয়ে নয় শুধু হিংসা দিয়ে উপরস্থদের মোকাবেলা করার চিন্তা ভুল।** কর্মক্ষেত্রে কলিকদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা তথা একজনের চেয়ে আরেকজনের আগে বেড়ে যাওয়ার চেষ্টা হয়েই থাকে। এটা স্বভাবগত বিষয়। কিন্তু এই প্রতিযোগিতায় আগে বাড়ার সুষ্ঠ চিন্তা হল নিজের গুণ, যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মপ্রচেষ্টা দিয়ে আগে বাড়ার চিন্তা করা। তা না করে কেউ যদি উপরওয়ালার দোষ-বদনাম করে, তার অন্যায় সমালোচনা করে তাকে পিছে ফেলার চেষ্টা করে, আর এভাবে নিজে আগে বেড়ে যাওয়ার চিন্তা করে, কিংবা হিংসা দিয়ে তার মোকাবেলা করে আগে বাড়ার চিন্তা করে তাহলে তার চিন্তা ভুল। বস্তুত হিংসা দিয়ে নয় বরং যোগ্য লোকের মোকাবেলা করতে হয় গুণাবলী ও যোগ্যতা দিয়ে।

"চাকরিজীবীদের কিছু ভুল চিন্তা" শীর্ষক আলোচনার সারকথা হল–

- চাকরির শুরুতেই উপরি তথা ঘুষের চিন্তা রাখা ভুল।
- আগে কামাই করে নেই তারপর হালাল-হারামের চিন্তা করা যাবে– এই চিন্তা ভুল।
- যার চাকরি করা হচ্ছে আমার দ্বারা তার উন্নতি হল কি না এটা চিন্তা না করে শুধু নিজের বেতন-ভাতা বৃদ্ধির চিন্তা-ধান্ধায় থাকা ভুল।
- যোগ্যতা ও কর্ম দিয়ে নয় শুধু হিংসা দিয়ে উপরস্থদের মোকাবেলা করার চিন্তা ভুল।

www.maktabatulabrar.com

যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয় না

আমাদের জীবনে সব বিষয়ের গুরুত্ব সমান নয়। কোনটার গুরুত্ব বেশি কোনটার কম। যেটা যে পর্যায়ের গুরুত্ব রাখে সেটাকে সে পর্যায়ে রাখা চাই। কম গুরুত্বের বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া বা বেশি গুরুত্বের বিষয়কে কম গুরুত্ব দেয়া চিন্তা-চেতনারই ভুল। কম গুরুত্বের বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দিলে ছোটকে বড় করা হয়, যা ভারসাম্য নষ্ট করে। পক্ষান্তরে বেশি গুরুত্বের বিষয়কে কম গুরুত্ব দেয়া হলে বড়কে ছোট করা হয়, যা বহু ক্ষতির কারণ ঘটে, এটাও ভারসাম্যহীনতা। কম গুরুত্বের বিষয়কে বেশি গুরুত্ব দেয়া কিংবা বেশি গুরুত্বের বিষয়কে কম গুরুত্ব দেয়া উভয়টাই ভুল। আর যদি কোন বিষয় মোটেই গুরুত্বপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও অনেক বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় কিংবা অনেক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেটাকে মোটেই গুরুত্ব না দেয়া হয় তাহলে তা মারাত্মক ভুল। ইদানিং দেখা যাচ্ছে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না।

যে বিষয়গুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না– এমন বিষয় রয়েছে প্রচুর। তার মধ্যে আমি এখানে প্রধানত দু'টো বিষয়ের উল্লেখ করব। **এক.** পরিবার ও সমাজে আদব-কায়দা ও মুরব্বী-মান্যতার বিষয়। **দুই.** লজ্জা-শরমের বিষয়। নিম্নে এ দু'টো বিষয় সম্বন্ধে অল্প-বিস্তর আলোচনা পেশ করা হল।

পরিবার ও সমাজে আদব-কায়দা ও মুরব্বী মান্যতার বিষয়

আজ আমাদের সমাজে আদব-কায়দা ও মুরব্বী-মান্যতার বিষয়কে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। অথচ পরিবার ও সমাজ গঠনে গুরুজন মান্যতার ভূমিকা অনেক বেশি। ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক রীতি-নীতিতে মুরব্বী-মান্যতা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিবারে মুরব্বী-মান্যতা পারিবারিক শৃঙ্খলা বিধান ও একটি আদর্শ পরিবার গড়ার ক্ষেত্রে মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করে থাকে। তদ্রূপ সমাজে মুরব্বী-মান্যতা সামাজিক শৃঙ্খলা বিধান ও একটি আদর্শ সমাজ গড়ার মূল নিয়ামক হিসাবে কাজ করে থাকে। পরিবার ও সমাজে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মুরব্বী-মান্যতা বলতে বোঝানো হচ্ছে পরিবার ও সমাজে অধস্তন কর্তৃক উর্ধতনের আদব রক্ষা করা, অধস্তন কর্তৃক উর্ধতনের আনুগত্য করা এবং উর্ধতন কর্তৃক অধীনস্থের শাসিত হওয়া। এভাবে পারিবারিক ও সামাজিক মুরব্বীদের আদব-তা'জীম রক্ষা করা, তাদের আনুগত্য করা এবং তাদের দ্বারা শাসিত হওয়ার মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে চেইন অব কমান্ড রক্ষা পায়, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়, উর্ধতন মুরব্বীজনদের প্রভাবে অধীনস্থরা অন্যায় ও অপরাধ করার দুঃসাহস করা থেকে বিরত থাকে, তারা লাইনচ্যুত হতে সাহস পায় না, তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও বল্গাহীনতা প্রশ্রয় পায় না। এভাবে গোটা পরিবার ও গোটা সমাজ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলামুক্ত এবং নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

ইসলাম পরিবারের মুরব্বীদের আদব-তা'জীম রক্ষা ও তাদের আনুগত্য রক্ষাপূর্বক এরূপ শৃঙ্খলাবদ্ধ পরিবার গড়ে তোলার শিক্ষা দিয়েছে। পারিবারিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে যে যার মত স্বেচ্ছাচারিতা ও বল্গাহীনতার প্রবাহে ভেসে চলবে ইসলাম সে শিক্ষা দেয়নি। স্ত্রী স্ত্রীর মত চলবে, ছেলে-মেয়ে ছেলে-মেয়ের মত চলবে, যার যেমন খুশী সে তেমন চলবে ইসলাম এরকম পরিবারের কথা বলেনি। পরিবারের বড়রা ছোটদেরকে শাসন করবে, ছোটরা বড়দের আদব-তা'জীম রক্ষা করবে, তাদের আনুগত্য করে চলবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদেরকে লক্ষ রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন ছেলে-মেয়ে, ছোট ভাই-বোন বা অধীনস্থদের কেউ মাথায় চড়ে যেতে না পারে। পরিবারের চেক এ্যান্ড ব্যালেন্স এবং পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার স্বার্থেই এটা লক্ষ রাখতে হবে। যদি ছেলে-মেয়ে, ছোট ভাই-বোন বা অধীনস্থদের কেউ মাথায় চড়ে যায়, তাহলে এক দিকে পরিবারের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে, আরেক দিকে আদর্শ পরিবার গঠনে বিঘ্নতা সৃষ্টি হবে।

সন্তানের আদবের বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, ইসলাম বলেছে সন্তানদেরকে আদব শিক্ষা দেয়াই সন্তানের জন্য পিতা-মাতার সবচেয়ে

www.maktabatulabrar.com

ভাল কিছু করা। পিতা-মাতা যদি সন্তানকে আদব শিক্ষা দিয়ে যেতে পারে, সেটাই হল সন্তানের জন্য তাদের রেখে যাওয়া সবচেয়ে উত্তম উপহার। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا من نَحْلٍ أفضل من أدبٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي برقم ١٩٥٢)

অর্থাৎ, পিতা-মাতা সন্তানের জন্য যা রেখে যায় বা যা উপহার দেয়, তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল রেখে যাওয়া এবং ভাল উপহার হল উত্তম আদব। (তিরমিযী: হাদীছ নং ১৯৫২) অর্থাৎ, পিতা-মাতা যদি সন্তানদেরকে আদব-কায়দা শিক্ষা দিতে পারে, এটাই হল সন্তানের জন্য পিতা-মাতার সবচেয়ে ভাল কিছু করে যাওয়া। আদব-কায়দা ও গুরুজন-মান্যতা শিক্ষাদানই সন্তানের জন্য পিতা-মাতার রেখে যাওয়া সবচেয়ে উত্তম উপহার। কারণ তার দ্বারাই সন্তানের জীবন আদর্শমণ্ডিত হয়ে ওঠে, তাদের ভবিষ্যত সুন্দর হয়। উল্লেখ্য, ইমাম তিরমিযীর বর্ণনা অনুযায়ী হাদীছটি মুরসাল। অর্থাৎ, এ হাদীছের সনদে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। তবে ফাযায়েলের অধ্যায়ে এতটুকু দুর্বলতা সত্ত্বেও আমল করা হয়।

সন্তান লালন-পালন করার সময় তাদের আদব-কায়দার প্রতি লক্ষ রাখার পর্যায়ে এতটা সুক্ষ্ম বিষয়ও খেয়াল রাখতে হয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

رَحِمَ اللَّهُ وَالِدًا أَعَانَ وَلَدَهُ عَلَى بِرِّهِ. (المصنف لابن أبي شيبة برقم ٢٥٩٢٤)

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা ঐ পিতা (মাতা)কে রহম করবেন যে আদর্শ ও নেকীর বিষয়ে সন্তানের সহযোগিতা করবে। (উল্লেখ্য, হাদীছটি জয়ীফ, তবে ফাযায়েলের অধ্যায়ে এরূপ জয়ীফ হাদীছ আমলযোগ্য। আমাদের আলোচ্য ক্ষেত্রও এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।)

এ হাদীছের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, এমন কোন বিষয়ে সন্তানকে হুকুম দেয়া সঙ্গত নয়, যে ক্ষেত্রে মনে হতে পারে যে, হয়তোবা সন্তান সে হুকুম মানবে না। এরকম বিষয়ে হুকুম দেয়া সন্তানের বে-আদব হওয়ার ও পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়ার কারণ হতে পারে। কারণ পিতা-

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মাতা যখন বুঝবেন যে, সন্তান সে হুকুম মানবে না, তারপরও হুকুম দিবেন এবং হুকুম দেয়ার পর দেখা যাবে সন্তান মানল না, তাহলে সন্তানের মধ্যে পিতা-মাতার হুকুম অমান্য করার দুঃসাহস বাড়তে থাকবে। আজ একটা হুকুম অমান্য করবে, কাল দুটো অমান্য করবে, সামনে চারটা অমান্য করবে। এভাবে সন্তানের পক্ষে পিতা-মাতার হুকুম অমান্য করাটা স্বাভাবিক হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে মুরব্বী-মান্যতা লোপ পাবে এবং পারিবারিক শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে। একটা উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন: ছুটির সময় বাচ্চারা একটু খেলাধুলা করতে চায়। তখন তাদের পড়াশোনা করার মন-মানসিকতা স্তিমিত থাকে। ছুটি প্রদান করাও হয় একটু পড়াশোনা থেকে বিরতির জন্য। তখন যদি কোন পিতা-মাতা বাচ্চাদেরকে পড়াশোনার জন্য চাপ দেন, খেলাধুলা একেবারে বন্ধ রাখতে বলেন, তাহলে হতে পারে বাচ্চারা সে আদেশ মানবে না। এটাই স্বাভাবিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। মনস্তাত্ত্বিক নীতি অনুসারে মানসিক পূর্বপ্রস্তুতি ব্যতীত কেউ কোন কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ হয় না। সে রকম কোন কাজের জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হলে সে বিরূপ মানসিকতার চাপে ক্লিষ্ট হয়, অবাঞ্ছিত চাপ অনুভব করতে থাকে এবং সে কাজ থেকে গা বাঁচানোর ফন্দী-ফিকির করতে থাকে। অতএব ছুটির অবসরে বাচ্চাদেরকে পড়াশোনার জন্য চাপ দেয়া অনুচিত। এতে বাচ্চাদের মধ্যে পিতা-মাতার আদেশ অমান্য করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠতে পারে এবং এ মনোবৃত্তি আরও বিস্তৃত হয়ে তাদের মন থেকে সব ধরনের মুরব্বী-মান্যতা লোপ পেতে পারে। ইসলাম মুরব্বী-মান্যতা লোপ পেতে পারে এমন কোনো নীতি, কর্ম বা পদক্ষেপকে সমর্থন করে না। তাই ইসলামী পরিবারের বিজ্ঞ মুরব্বীদের দ্বারা প্রতিপালিত সন্তান বে-আদব হয় না, তারা মুরব্বী-মান্যতাবোধ থেকে বিচ্যুত হয় না, পিতা-মাতার অবাধ্য হয় না, তারা সাধারণত অপরাধ প্রবণ হয় না। এর বিপরীত যারা মুরব্বী-মান্যতার প্রয়োজন উপলব্ধি করে না বা সন্তানাদিকে সেরূপ নীতি শেখানোর পন্থা অবলম্বন করে না, তাদের সন্তানাদির অবস্থা হয় এর ব্যতিক্রম।

www.maktabatulabrar.com

ইদানিং পাশ্চাত্যে বাচ্চাদেরকে গায়ে হাত দেয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এমনকি উস্তাদ মুখে একটু তিরস্কার করতে বা বকাও দিতে পারেন না। আমেরিকার একজন উস্তাদের বাচনিক শুনেছি তাদের অবস্থা হল মারধর তো দূরের কথা, কোন তিরস্কার করা বা বকা-ঝকা দেয়াও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা এমনভাবে উস্তাদদের মাথায় চড়ে যায়, আর উস্তাদদের এমন অসহায় অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়, যেন উস্তাদ একটা অবলা গাধার মত। ছেলেরা তার দুই কান ধরে দুই দিকে টানছে, কেউ লেজ ধরে টানছে, কেউ দুই হাত পা ধরে টানছে, এমন বেহাল অবস্থায়ও উস্তাদ কিছুই বলতে পারছেন না। এটা সম্পূর্ণ ভারসাম্যহীন অবস্থা। এটা বাচ্চাদেরকে বে- আদব বানানো। এটা মুরব্বী-মান্যতাবোধ লোপ করে দেয়ার পদক্ষেপ। ইসলামে এরূপ ভারসাম্যহীন নীতি সমর্থিত নয়।

ইসলামের কোনো নীতি ভারসাম্যহীন নয়। প্রয়োজনের ক্ষেত্রেও শাসন বর্জন করতে হবে এ নীতি যেমন সমর্থিত নয়, তদ্রূপ শাসন করতে যেয়ে মাত্রা ছাড়িয়ে যাওয়ারও অনুমতি নেই। এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, শাসন অর্থ আদৌ গরু-পেটা করা নয়। শাসনের ক্ষেত্রেও ভারসাম্য থাকতে হবে। শাসনেরও মাসআলা রয়েছে। ফাতাওয়ায়ে শামীতে লেখা হয়েছে– কোনো উস্তাদ তার ছাত্রকে বা কোনো পিতা-মাতা তাদের সন্তানকে এমনভাবে মারতে পারবে না যে, হাত পা ভেঙ্গে যাবে বা চামড়া ফেটে যাবে বা গায়ে দাগ পড়ে যাবে। বাচ্চাদেরকে শাসনের স্বার্থে একটু আধটু মারধর তথা শাসনেরও প্রয়োজন আছে, কিন্তু ভারসাম্য বর্জিত মারধর বা শাসন পদ্ধতি কোনোক্রমেই সমর্থিত নয়। ব্যালেন্স সর্বক্ষেত্রেই কাম্য। এমনকি পরিবার ও সমাজের অধস্তনরা মুরব্বীদের আনুগত্য করবে এ ক্ষেত্রেও ব্যালেন্স বা ভারমাস্য রয়েছে। মুরব্বীদের সম্পূর্ণ আনুগত্যহীনতার ন্যায় প্রান্তিকতা যেমন সমর্থিত নয়, তদ্রূপ আনুগত্যের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়িও সমর্থিত নয়। মুরব্বীদের কেউ যদি কোন পাপ বা অন্যায়ের নির্দেশ দেন সেটা মান্য করা যাবে না। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

«لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.» (رواه أحمد بسند صحيح برقم ١٠٩٥)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য হয় তথা পাপ হয় এভাবে কোন মানুষের আনুগত্য করা যাবে না। (মুসনাদে আহমাদ: হাদীছ নং ১০৯৫)

পারিবারিক শৃঙ্খলাবিধান ও একটি আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার প্রয়োজনে ইসলামের পারিবারিক নীতিতে আদব-কায়দা, মুরব্বী-মান্যতা ও উর্ধতনের শাসন শৃঙ্খলায় অধস্তনের পরিচালিত হওয়ার যে নীতি রাখা হয়েছে, পরিবারের মূল সদস্য তথা স্বামী-স্ত্রীও এ নীতির আওতা-বহির্ভূত নয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধু ভালবাসার সম্পর্ক নয়, তাদের মধ্যে আদব-তা'জীমের সম্পর্কও রয়েছে, মান্যতার সম্পর্কও রয়েছে। স্ত্রী স্বামীর আদব-তা'জীম রক্ষা করে চলবে, স্বামীর আনুগত্য করে চলবে এবং প্রয়োজনে স্বামী স্ত্রীকে পরিমিত ও বিজ্ঞচিত শাসনও করবে, এটাই ইসলামের শিক্ষা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভালবাসার সম্পর্কও থাকবে, আদব তা'জীম ও মান্যতার সম্পর্কও থাকবে। ভালবাসা আর আদব তা'জীম- এই দুটোর মাঝে সমন্বয় করে চলতে হবে। স্বামী স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করবে, ভালবাসবে তবে আদর-সোহাগ ও ভালবাসা চর্চায় এতটা নেমে যাবে না যে, স্ত্রীকে শাসন করার মত কর্তৃত্বের আসনে আরোহণই করতে পারবে না। স্বামী স্ত্রীকে আদর-সোহাগ করবে, ভালবাসবে আবার শাসনও করবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীও স্বামীকে ভালবাসবে, সাথে সাথে স্বামীর আদব তা'জীম রক্ষা এবং তার আনুগত্যও বহাল রেখে দুটোর মাঝে সমন্বয় করে চলবে।

স্ত্রীর কাছে স্বামীর এতটা আদব-সম্মান প্রাপ্য যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক বাণীতে বলেছেন,

لو كنت امرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها.

(رواه الترمذي برقم ١١٥٩ وقال : حديث حسن غريب)

অর্থাৎ, (আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে সাজদা করা জায়েয নেই। কোন মানুষ কোন মানুষকে সাজদা করতে পারবে না।) যদি কোন

www.maktabatulabrar.com

মানুষকে হুকুম দিতাম অন্য কোন মানুষকে সাজদা করার, তাহলে একমাত্র স্ত্রীকে হুকুম দিতাম সে তার স্বামীকে সাজদা করবে। (তিরমিযী: হাদীছ নং ১১৫৯)

এ হাদীছের মর্মার্থ লক্ষ করলে দেখা যায় আল্লাহ, আল্লাহর রসূলের পরে স্ত্রীর কাছে সবচেয়ে বেশি শ্রদ্ধার্হ হলেন তার স্বামী। কাজেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে শুধু মহব্বত ভালবাসার সম্পর্ক নয়, আদব তা'জীমের সম্পর্কও রয়েছে। স্ত্রী স্বামীর আদব তা'জীমও রক্ষা করে চলবে। এ জন্যই স্ত্রীর প্রতি হুকুম হল, সে তার স্বামীর নাম ধরে ডাকতে পারবে না। স্বামীর নাম ধরে ডাকা নিষেধ। কারণ এটা স্বামীর সঙ্গে পালনীয় আদবের খেলাফ। স্বামী স্ত্রীর মুরব্বী, তাই মুরব্বী হিসেবে স্বামীর আদব রক্ষা করতে হবে। যখন স্বামীর সঙ্গে এক সাথে হাঁটবে বা চলবে, পিছনে পিছনে থাকবে, যেমন মুরব্বীদেরকে সামনে রেখে চলতে হয়। মুরব্বীদের সাথে যেমন রুক্ষ স্বরে কথা বলা যায় না, জোর আওয়াজে কথা বলা যায় না, ঝাঁঝালো সুরে কথা বলা যায় না, স্বামীর সাথেও স্ত্রী এগুলো করতে পারবে না। স্বামীর সাথে ঝাঝালো সুরে কথা বলতে পারবে না, চড়া গলায় কথা বলতে পারবে না, মাথা উঁচু করে কথা বলতে পারবে না। এগুলো হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা দেয়া আদব। স্ত্রীকে এ সমস্ত আদব রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এগুলো দ্বারাই পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। এভাবে ইসলাম পারিবারিক অঙ্গনে মুরব্বী-মান্যতার বিধান প্রবর্তন করে পারিবারিক শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

স্ত্রীদেরকে মনে রাখতে হবে স্ত্রীদের উপর স্বামীর শাসন-কর্তৃত্ব রয়েছে। স্ত্রীদের উপর স্বামীদের শাসন-কর্তৃত্বের বিষয়ে ইংগিত করে এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.﴾

অর্থাৎ, নারীদের উপর পুরুষদের শ্রেষ্ঠত্ব আছে। (সূরা বাকারা: ২২৮)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যেহেতু পুরুষদেরকে সমাজ অঙ্গনে কাজ করতে হবে, রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে কাজ করতে হবে, তাই তাদের দৈহিক ক্ষমতা, মানসিক ক্ষমতা, তাদের বুদ্ধিমত্তা তুলনামূলকভাবে বেশি দেয়া হয়েছে। তদুপরি পুরুষরা পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব বহন করে। এসব কারণে পুরুষের শাসনসুলভ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব এসে যায়। নারীর উপর পুরুষের কর্তৃত্ব থাকার এ কারণটা স্পষ্টত বর্ণনা করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.﴾

অর্থাৎ, পুরুষগণ নারীদের উপর কর্তৃত্ব করবে, কারণ আল্লাহ কতককে কতকের উপর (অর্থাৎ, পুরুষকে নারীর উপর দৈহিক, মানসিক, মেধাগত) শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। তদুপরি পুরুষরা নারীদের ভরণ-পোষণের জন্য ব্যয় করে থাকে। (সূরা নিছা: ৩৪)

অতএব শাসন-কর্তৃত্ব-জনিত দায়িত্ব পালনের নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতায় স্বামীকে লক্ষ রাখতে হবে কোনোভাবেই যেন স্ত্রী মাথায় চড়ে যেতে না পারে। পারিবারিক শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার স্বার্থেই এর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে। যদি স্ত্রী মাথায় চড়ে যায় এবং বে-আদব হয়ে যায়, তাহলে স্বামীর প্রতি তার আনুগত্য লোপ পাবে, পরিবারের শান্তি শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। স্ত্রীকে এমন হতে দেয়া পরিবারের অনিবার্য ক্ষতি ডেকে আনবে। স্ত্রীকে এত ভালবাসা কাম্য নয় যে, তাকে শাসন-ই করতে পারবে না, সে আদব বিবর্জিত হয়ে উঠবে। ভালবাসার সাথে সাথে আদব দান এবং বিজ্ঞচিত ও পরিমিত শাসনও করতে বলা হয়েছে। স্ত্রীকে আদব দান এবং এমন শাসন করাও স্বামীর কর্তব্য, যাতে স্ত্রী লাইনচ্যুত হয়ে না যায়, যাতে সে বে-আদব হয়ে না যায়। স্ত্রীকে কিভাবে শাসন করতে হবে, তার পদ্ধতিও কুরআন শরীফে বলে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত নারীদের অবাধ্য হওয়ার ও মাথায় চড়ে যাওয়ার আশংকা কর, (যখন এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়) তখন

www.maktabatulabrar.com

তোমরা (সংশোধনের নিমিত্তে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ কর। প্রথমে) তাদেরকে উপদেশ দাও, (এতেও সংশোধন না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে) তাদেরকে বিছানায় ত্যাগ কর, (এতেও সংশোধন না হলে তৃতীয় পর্যায়ে) তাদেরকে (আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এরকম মৃদু) মারধর কর। (সূরা নিছা: ৩৪)

এ আয়াতে স্ত্রীর উপর স্বামীর শাসন-কর্তৃত্ব-জনিত বিধি বর্ণিত হয়েছে। এভাবে স্বামীকে স্ত্রীর মুরব্বীজনের অবস্থানে রাখা হয়েছে। এভাবে ইসলাম পারিবারিক মুরব্বী-মান্যতার বিধান প্রবর্তন করেছে।

শুধু পরিবারের মুরব্বী নয়, সমাজের মুরব্বীদের মান্যতা করার শিক্ষাও ইসলাম দিয়েছে। সব ধরনের মুরব্বির সঙ্গেই আদব রক্ষা করতে হবে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُجِلَّ كَبِيرَنَا وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ.» (قال الهيثمي: رواه احمد والطبراني في الكبير وإسناده حسن.)

অর্থাৎ, যে বড়দের শ্রদ্ধা করে না, ছোটদের আদর-স্নেহ করে না এবং আমাদের আলেমদের হক চেনে না, সে আমাদের উম্মতভুক্ত নয়। (মুসনাদে আহমাদ ও তাবারানী)

বয়সের মুরব্বী হোক বা ইল্মের মুরব্বী হোক, দ্বীনী মুরব্বী হোক বা দুনিয়াবী মুরব্বী হোক সকলের আদব তা'জীম রক্ষা করতে হবে। এজন্য কোনো ধরনের মুরব্বীর নাম ধরে ডাকা নিষেধ। মুরব্বীদেরকে সামনে রেখে হাঁটতে হয়। মুরব্বীদের সাথে রুক্ষ স্বরে কথা বলা যায় না, জোর আওয়াজে কথা বলা যায় না, ঝাঁঝালো সুরে কথা বলা যায় না। মুরব্বীদের সামনে চড়া গলায় কথা বলা যায় না, মাথা উঁচু করে কথা বলা যায় না। এগুলো হচ্ছে ইসলামের শিক্ষা দেয়া সামাজিক আদব। সমাজ সদস্যদেরকে এই সমস্ত আদব রক্ষা করতে বলা হয়েছে। এভাবে ইসলাম সামাজিক অঙ্গনে মুরব্বী-মান্যতার বিধান প্রবর্তন করেছে। এগুলো দ্বারাই সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা পায়। এগুলোর দ্বারাই সমাজে চেইন অব কমান্ড রক্ষা পায়, অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়, সমাজের উর্ধতন গুরুজনদের প্রভাবে সমাজের অধস্তনরা অন্যায় ও অপরাধ করার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দুঃসাহস করা থেকে বিরত থাকে, তারা লাইনচ্যুত হতে সাহস পায় না, তাদের স্বেচ্ছাচারিতা ও বল্গাহীনতা প্রশ্রয় পায় না। এভাবে গোটা সমাজ অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলামুক্ত এবং নীতি, আদর্শ ও শৃঙ্খলামণ্ডিত হয়ে ওঠে।

পরিবার ও সমাজ থেকে এই আদব তা'জীম ও মুরব্বী-মান্যতা উঠে যাওয়ার ফলে আজ পরিবারের অধীনস্তরা মুরব্বীদের সামনে অবলিলায় অপরাধ করে যাচ্ছে, সমাজের মুরব্বীদের সামনে ছোটরা নিঃশঙ্কচিত্তে অন্যায় অপরাধ সংঘটিত করে চলছে। খুব বেশি দূরে নয় এই নিকট অতীতেও আমরা লক্ষ করেছি মুরব্বীদের সামনে কিশোররা আজে বাজে কোন বই পাঠ করতে বা অনর্থক খেলাধূলায় লিপ্ত হতে পর্যন্ত সাহস পেত না। যুবকরা বিড়ি সিগারেট খাওয়ার মত ছোটখাট অন্যায় করতে পর্যন্ত সাহস পেত না। মুরব্বীদের উপস্থিতি টের পেলে গান-বাদ্য বন্ধ করে দিত। রাস্তা-ঘাটে এলোমেলো দাঁড়িয়ে থাকলে পরিপাটি হয়ে একপাশে সরে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকত। মুরব্বীদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ তাদেরকে এভাবে বহু অপরাধ ও অসভ্যতা থেকে বিরত রাখত। অথচ আজ সমাজের কিশোর যুবকরা মাথা উঁচু করে এবং বুক টান করে অবলিলায় মুরব্বীদের সামনে সব অপরাধ সংঘটিত করে যাচ্ছে। মুরব্বীরা দেখছে, জানছে– এজন্য তাদের এতটুকু দ্বিধা সংকোচ নেই। মুরব্বীদের প্রতি আদব-তা'জীম ও শ্রদ্ধাবোধ উঠে যাওয়ার ফলেই এমনটা হচ্ছে।

মুরব্বীদের প্রতি আদব-তা'জীম ও শ্রদ্ধাবোধ উঠে যাওয়ার অনেকগুলো কারণ আমরা অবলম্বন করে চলছি বলেই এমনটা হচ্ছে। এর অনেকটাই হচ্ছে টেলিভিশন, ভি সি আর, সিডি এবং ডিস চ্যানেলের কল্যাণে (?) সেই সাথে রয়েছে ইন্টারনেটের রগরগে সাইটগুলো। এগুলোর অনেকটাতেই অশ্লীলতা প্রদর্শিত হচ্ছে, আর পরিবারের মুরব্বীরা ছেলে-মেয়ে ও ছোটদের নিয়ে একসঙ্গে এসব অনুষ্ঠান বা চিত্র উপভোগ করছে। এর ফলে মুরব্বীদের প্রতি লজ্জা-শরমবোধ ভেঙ্গে যাচ্ছে, মুরব্বীদের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে তাদের প্রতি মান্যতাবোধ লোপ পাচ্ছে। অথচ বড় শিশু বা কিশোর-কিশোরীর সামনে নয় বরং ইসলাম এই শিক্ষা প্রদান করেছে যে, পিতা-

www.maktabatulabrar.com

মাতা একটা দুধের শিশুর সামনেও কোন যৌন কথা-বার্তা বা কোন যৌন আচরণে লিপ্ত হবে না। দুধের শিশু যদিও এসব কিছুই বোঝে না, কিন্তু যা কিছু তার সামনে করা হবে, তার মনে তার একটা চিত্র পড়তে থাকবে। ভবিষ্যতে ঐ চিত্রগুলো তার মন-মানসিকতায় ভেসে উঠবে এবং এটা তার মন-মানসিকতা ও চরিত্রে প্রভাব ফেলবে। শিশুদের মনে একবার যে চিত্র অংকিত হয়, সে চিত্র কোনোদিন মুছে যায় না। সে এখন না বুঝলেও এটা তার মানসিকতার উপর কু-প্রভাব ফেলবে এবং ভবিষ্যত জীবনে তার প্রভাব প্রতিফলিত হবে। কাজেই একটা দুধের শিশুর সামনেও (যদি সে জাগ্রত থাকে, তাহলে) পিতা-মাতাকে এ সমস্ত কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যাতে শিশুদের মনে পিতা-মাতা সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হতে না পারে এবং চরিত্রে নির্লজ্জতার প্রভাব পড়তে না পারে।

পরিবারের প্রধান ও মূল সদস্য তথা স্বামী স্ত্রীদের মধ্যেও মুরব্বী-মান্যতা লোপ পেয়েছে এবং পেয়ে চলছে। নারী স্বাধীনতা ও নারীদের স্বাবলম্বিতার নামে নারীদেরকে অতিমাত্রায় আত্মনির্ভর করে তোলার মাধ্যমে স্ত্রীদেরকে স্বামী-মান্যতা ও স্বামীর আনুগত্যের বলয় থেকে বের করে আনা হচ্ছে। তদুপরি এর সাথে যোগ হচ্ছে বিধর্মী এনজিও এবং তাদের দোসরদের ইসলামের পারিবারিক বন্ধন ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয়ার ষড়যন্ত্র, যার আওতায় নারীদেরকে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসার উসকানি দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে শেখানো হচ্ছে স্বামী অমান্যতাপূর্বক বল্গাহীনভাবে চলার ছবক।

সামাজিক অঙ্গনেও মুরব্বী-মান্যতা লোপ পাওয়ার উপাত্ত কম নেই। পারিবারিকভাবে লব্ধ মুরব্বীঅমান্যতার মানসিকতা সামাজিক অঙ্গনে বিস্তৃত হওয়ার সাথে সাথে কিশোর যুবকদের সন্ত্রাসী বলয় ও অপরাধ জগতের সাথে সম্পর্কও মুরব্বী-মান্যতা লোপ পাওয়ার একটা বড় কারণ হিসেবে কাজ করছে। কারণ সন্ত্রাসী বলয় ও অপরাধ জগতের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে তাদের হাতে অবৈধ শক্তি এসে যায়। ফলে সমাজের মুরব্বীরা পর্যন্ত যখন তাদের কাছে জিম্মী হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই মুরব্বীগণ আর মান্যতার স্তরে উন্নীত থাকতে পারেন না। সেই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মুরব্বীজনরা আর তাদেরকে শাসনের আওতায় আনতে পারেন না। অধুনা সমাজে সৃষ্টি হওয়া এরূপ পরিস্থিতির পূর্বে মুরব্বীজন কর্তৃক সমাজের কিশোর যুবকগণ অন্যায় অপরাধ ও অসভ্যতার জন্য তিরস্কৃত হত, শাসিত হত। ফলে কিশোর ও যুবকদের দ্বারা সমাজে অপরাধ কম সংঘটিত হত।

এতক্ষণের আলোচনা থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হল যে, পরিবার ও সমাজের আদর্শিক কাঠামো গড়ার পশ্চাতে মুরব্বী-মান্যতার ভূমিকা কতখানি। বস্তুত আদর্শ পরিবার ও আদর্শ সমাজ গঠনে মুরব্বীদের আদব-তা'জীম এবং মান্যতার প্রয়োজন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। এই সুস্পষ্ট প্রয়োজনের বিষয়ে সমাজ সভ্যদের সচেতনতা জাগ্রত হোক। এখনও সময় থাকতে বোধোদয় হোক এবং সেই পরিবেশ ফিরিয়ে আনা হোক, যে পরিবেশে মুরব্বী ও বড়দের আদব-তা'জীম চর্চিত হয়, যে পরিবেশে মুরব্বী ও বড়রা সমাজের কিশোর যুবকদেরকে অন্যায় অপরাধ ও অসভ্যতার জন্য তিরস্কার করতে পারেন, শাসন করতে পারেন, প্রয়োজনে শাস্তি দিতে পারেন। সময় থাকতে সতর্ক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হোক, নতুবা সেদিন খুব দূরে নয় যখন পাশ্চাত্যের মত আমাদের সন্তানদের অভিধানেও আদব-কায়দা এবং মুরব্বী-মান্যতা বলে কোন শব্দের অস্তিত্ব থাকবে না।

লজ্জা-শরম প্রসঙ্গ

যে বিষয়গুলো অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা সত্ত্বেও সেগুলোকে তেমন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না– এমন আর একটা বিষয় হল লজ্জা-শরমের বিষয়। লজ্জা-শরমকেও আজকাল তেমন গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। বরং লজ্জা-শরমকে সেকেলেপনা এবং নির্লজ্জতাকে স্মার্টনেস মনে করা হচ্ছে। অথচ হাদীছে এসেছে–

«اَلْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ.»

অর্থাৎ, লজ্জা ঈমানের বড় এক শাখা। (বোখারী ও মুসলিম)

লজ্জা-শরম এমন এক অনন্য গুণ যে, এই গুণ কারও মধ্যে থাকলে সে অনেক অন্যায় অপরাধ থেকে বাঁচতে সক্ষম হয়। পক্ষান্তরে

www.maktabatulabrar.com

লজ্জা-শরম না থাকলে অনেক অন্যায় অপরাধ অবলিলায় করে যেতে পারে। এরূপ বর্ণনা দিয়ে এক হাদীছে বলা হয়েছে,

«إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ.» (صحيح البخاري برقم ٣٤٨٤)

অর্থাৎ, তোমার যদি লজ্জাই না থাকে তাহলে যা ইচ্ছা তা করতে পার। (বোখারী: হাদীছ নং ৩৪৮৪)

সমাজ থেকে লজ্জা-শরম উঠে যাওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে। যে কারণগুলো অবলীলায় আমরা অবলম্বন করে চলছি বলেই এমনটা হচ্ছে। এর অনেকটাই হচ্ছে টেলিভিশন, ভি সি আর, সিডি এবং ডিস চ্যানেল ও নেটের কল্যাণে (?)। এগুলোর অনেকটাতেই অশ্লীলতা প্রদর্শিত হচ্ছে, আর পরিবারের মুরব্বীরা ছেলে-মেয়ে ও ছোটদের নিয়ে একসাথে এসব অনুষ্ঠান বা চিত্র উপভোগ করছে। এর ফলে মুরব্বীদের প্রতি লজ্জা-শরমবোধ ভেঙ্গে যাচ্ছে, একে অপরের থেকে শরমবোধ ভেঙ্গে যাচ্ছে।

সমাজ থেকে লজ্জা-শরমবোধ যে কতটা উঠে গেছে তা আজকাল বাস, লঞ্চ-স্টিমার ও রেলগাড়ীতে চড়লে অনেক সময় নজরে পড়ে। রীতিমত অসংখ্য লোকের সামনে যুবক-যুবতীরা ঘষা-ঘষি ঢলাঢলিতে লিপ্ত হচ্ছে। আর পার্কে ক্লাবে এগুলো যে কী পরিমাণ হচ্ছে তা তো সেসব স্থানে গমনকারী মাত্রই ভাল করে জানেন।

যেসব বিষয় গুরুত্বপূর্ণ নয়, অথচ গুরুত্বপূর্ণ ভাবা হয়

যে বিষয় গুরুত্বপূর্ণ তাকে গুরুত্ব না দেয়া যেমন ক্ষতির কারণ, তেমনি যেটা গুরুত্বপূর্ণ নয় তাকে গুরুত্ব দেয়াও ক্ষতির কারণ। কেননা গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে গুরুত্ব না দিলে তার পেছনে প্রয়োজনীয় সময়, মেধা ও অর্থ ব্যয় করা হবে না, ফলে সেটা পরিপূর্ণতা পাবে না, এটা ক্ষতি ডেকে আনবে। তদ্রূপ যেটা গুরুত্বের নয় সেটাকে গুরুত্ব দিলে তার পেছনে যে পরিমাণ সময়, মেধা ও অর্থ ব্যয়িত হবে গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের পেছনে সে পরিমাণ সময়, মেধা ও অর্থের টান পড়বে, তাতেও গুরুত্বপূর্ণ জিনিস বিঘ্নিত হবে, এটাও ক্ষতি ডেকে আনবে।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসকে গুরুত্ব দেয়া উচিত এবং যেটা যতখানি গুরুত্বের তাকে ততখানিই গুরুত্ব দেয়া উচিত। পক্ষান্তরে যা গুরুত্বের নয় তাকে গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়। এর বিপরীত করা হলে সেটা হবে চিন্তা-চেতনার ভারসাম্যহীনতা। কিন্তু দেখা যায় আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়েই এমন ভারসাম্যহীনতা রয়েছে। আমাদের সমাজে এমন অনেক কিছু আছে যাকে আমরা অনেক গুরুত্বের মনে করি অথচ তা তেমন গুরুত্বের নয় কিংবা তা মোটেই গুরুত্বের নয়। এভাবে গুরুত্বহীনকে গুরুত্ব দিয়ে কিংবা কোনটাকে প্রাপ্য পরিমাণের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে আমরা ব্যালেন্স তথা ভারসাম্য নষ্ট করে চলছি।

এই ভারসাম্য নষ্ট করার কাজটা ধর্মীয় অঙ্গনে যেমন চলছে, তেমনি চলছে রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অঙ্গনেও। ধর্মীয় অঙ্গনে এমন অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলোকে যথাযথ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এ জাতীয় বিষয়ের কয়েকটা সম্বন্ধে পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। এর বিপরীত এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলোর তেমন কোন গুরুত্ব না থাকা সত্ত্বেও বরং অনেকগুলো নিষিদ্ধ ও গোনাহের হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোতে অনেক গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে, সেগুলোকে অনেক ছওয়াবের আমল মনে করা হচ্ছে। এর কয়েকটা উদাহরণ হল:

১. প্রচলিত মীলাদ অনুষ্ঠান করা। এটাকে অনেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে থাকেন। এমনকি অনেকে নামায পড়েন না, রোযা রাখেন না, যাকাত দেন না, হজ্জ করেন না। এভাবে ইসলামের বহু ফরয ওয়াজিব অবলীলায় তরক করে যান। সেগুলো গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে গুরুত্ব দেন না। কিন্তু তারা কার্যত এমন ভাব দেখান যে, বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও পর্ব উপলক্ষে কিছুই করা না হলেও অন্তত মীলাদ অনুষ্ঠান তো না করলেই নয়। বাড়ি নির্মাণ করেছেন তা সুদী লোন নিয়ে সেই অর্থ দিয়েই হয়তো করেছেন। এখানে হারাম থেকে বেঁচে থাকাকে গুরুত্ব দিলেন না, কিন্তু বাড়ি উদ্বোধন ঠিকই মীলাদের মাধ্যমে করালেন। এভাবে মীলাদকে বহু গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। অথচ প্রচলিত এই মীলাদ অনুষ্ঠানের কথা কুরআন-

www.maktabatulabrar.com

হাদীছের কোথাও নেই। এটা গুরুত্বপূর্ণ হওয়া তো দূরের কথা হক্কানী উলামায়ে কেরাম কুরআন হাদীছের আলোকে এটাকে বিদআত তথা গোনাহের অনুষ্ঠান বলেছেন। এ সম্বন্ধে আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা দেখে নেয়া যেতে পারে।

২. এমনিভাবে জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী পালনকে অনেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমল মনে করছেন। এমনকি মৃত মাতা-পিতা প্রমুখ আপনজনের জন্য কিছু না করলেও অন্তত তাদের জন্মবার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী তো পালন করতেই হয়– এমন গুরুত্ব জাহির করে চলেছেন। অথচ শরীয়তে এগুলোর গুরুত্ব তো দূরের কথা হক্কানী উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছের আলোকে এগুলোকে বিদআত তথা গোনাহের অনুষ্ঠান বলেছেন।

৩. বুযুর্গানে দ্বীনের মৃত্যুবার্ষিকী অন্য এক নামে করা হয়। সেটা হল ওরছ। এই ওরছও মৃত্যুবার্ষিকী পালনই বটে। এটাও গুরুত্বপূর্ণ তো নয়ই বরং হক্কানী উলামায়ে কেরাম কুরআন-হাদীছের শক্তিশালী দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে এই ওরছকেও বিদআত তথা গোনাহের অনুষ্ঠান বলে ফতোয়া দিয়েছেন। অথচ এক শ্রেণীর লোক কতইনা গুরুত্বের সাথে ওরছ পালন করে যাচ্ছেন এবং ওরছের জন্য অর্থকড়ি দেওয়াকে বড়ই ছওয়াবের কাজ মনে করছেন। ওরছ যে বিদআত ও গোনাহের অনুষ্ঠান এ সম্বন্ধে আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থে দলীল-প্রমাণ ভিত্তিক আলোচনা দেখতে পারেন। সেই দীর্ঘ আলোচনা এখানে উদ্ধৃত করে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি করতে চাই না।

এতক্ষণ ধর্মীয় অঙ্গনে গুরুত্বহীন বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার মত ব্যালেন্স নষ্ট করা কার্যাবলীর কিঞ্চিত বিবরণ পেশ করা হল। এবার উদাহরণ স্বরূপ রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক অঙ্গনের এমন কয়েকটা বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি যেগুলোতে প্রয়োজনের চেয়ে খুব বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়ে থাকে। যেমন:

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

- স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন।
- স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও ভাষা দিবসে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিদের জাতীয় স্মৃতিসৌধ ও শহিদ মিনারে পুষ্প অর্পন।
- কোন বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুতে সংসদে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন।
- কোন বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা।
- নারীর ক্ষমতায়ন।

এ বিষয়গুলোকে এত বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় যেন এগুলো করা না হলে মহাভারত একটু আধটু নয় পুরোটাই নষ্ট হয়ে যাবে। অথচ এগুলোকে কেন এত গুরুত্বের মনে করা হয় তা বুঝে আসে না। যেমন পৃথক পৃথকভাবে উপরোক্ত বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে দেখা যাক সেগুলোর গুরুত্ব আসলেই কতটুকু।

প্রথমেই আলোচনায় আসা যাক স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের বিষয়ে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এর জন্য প্রয়োজনে জাতি জান দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করলে কি স্বাধীনতা খর্ব হয়ে যাবে? তাতে কি কেউ স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার সুযোগ পাবে? ঠিক এই দুই দিন ছাড়া অন্য দিনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করলে যদি অসুবিধা না হয় তাহলে এ দুই দিন জাতীয় পতাকা উত্তোলন না করলে কী অসুবিধা হয়ে যাবে? আমার এ কথা বলা দ্বারা আদৌ এটা উদ্দেশ্য নয় যে, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের রীতি বর্জন করা হোক। এটা করা হচ্ছে, এর দ্বারা বছরে অন্তত দুই দিন হলেও স্বাধীনতার চেতনা উজ্জীবিত হয়, এতটুকু উপকারিতা তো রয়েছেই। আমি শুধু বুঝাতে চাচ্ছি এটা করতেই হবে, না করলে নয়– চিন্তা-চেতনাকে এমন ব্যালেন্সহারা করা ঠিক নয়।

তারপর স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস ও ভাষা দিবসে রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তিদের জাতীয় স্মৃতিসৌধে পুষ্প অর্পন এবং ভাষা দিবস আসলে শহীদ মিনারে পুষ্প অর্পন করার বিষয়ে আসুন। এ বিষয়ে চিন্তা করলেও

www.maktabatulabrar.com

এর গুরুত্ব কেন তা বুঝে আসে না। জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার প্রভৃতি স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্প অর্পনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য বলা হয়, এভাবে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। কিন্তু এটা কি ভেবে দেখা হয়েছে যে, জাতীয় স্মৃতিসৌধ, শহীদ মিনার বা এরূপ কোন স্মৃতিস্তম্ভে ফুল প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা পাওয়ার ব্যক্তি রইল কোথায় আর ফুল দেয়া হল কোথায়? ব্যক্তি রইল একখানে, তাদের আত্মা রইল আরেকখানে আর অন্যত্র ফুলের তোড়া অর্পন করে তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মহড়া দেয়া হল– এটা অসংগতিমূলক হাস্যকর হয়ে যায় কি না তা কি একবারও ভেবে দেখা হয়েছে? এমন অসংগতিমূলক একটা কাজকে কেন এত গুরুত্ব দেয়া হয় তা মোটেই বোধগম্য নয়। শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে ফুল অর্পন করলেও অন্তত এই অসংগতির দায় কিছুটা হলেও হয়তো এড়ানো যেত। যদি কেউ বলতে চান, এখানে তাদের আত্মার উপস্থিতি কল্পনা করে নিয়ে ফুল অর্পন করা হয়ে থাকে, তাহলে বলা যেতে পারে প্রত্যেকে যার যার ঘরে তাদের আত্মার উপস্থিতি কল্পনা করে নিজ নিজ ঘরেই ফুলের মাল্য ঝুলিয়ে রাখতে পারে, তাতে উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হবে, নিজের ঘরের শোভা বর্দ্ধনও ঘটবে, আবার এত মূল্যবান ফুলের তোড়াগুলো অরণ্যে নিবেদন হওয়া থেকেও রক্ষা পাবে।

এবার আসুন কোন বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুতে সংসদে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ নীরবতা পালন প্রসঙ্গে। তা কারও মৃত্যু-শোকে প্রকৃতই কেউ মুহ্যমান হয়ে গেলে সে বাকরুদ্ধ হয়ে যেতে পারে, শোকে সে নীরব নিথর হয়ে যেতে পারে-এমনটা তো মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ ঐ রকম শোকাহত না হওয়া সত্ত্বেও যদি সে বাকরুদ্ধতা প্রকাশ করে, তাহলে সেটাকে শোক প্রকাশ বলা হবে, না কি শোকের অভিনয় বলা হবে, না কি সেটা বালখিল্যতা আখ্যা পাবে, তা একটু বিবেচনার অপেক্ষা রাখে বৈকি। শোকের অভিনয় বা বালখিল্যতা দ্বারা কারও প্রতি শ্রদ্ধা নয় বরং তার সঙ্গে উপহাস প্রদর্শনই হয়ে থাকে। অথচ এটাকেই কত গুরুত্বের সাথে পালন করে যাওয়া হচ্ছে।

তারপর আসুন কোন বিশেষ ব্যক্তির মৃত্যুতে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার গুরুত্ব প্রসঙ্গে। এটাও কেন গুরুত্বপূর্ণ আখ্যায়িত হবে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তাও বোধগম্য নয়। জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করণের মাধ্যমে শোক প্রকাশ– এ ক্ষেত্রে বিষয়টা এভাবে বিবেচনা করাই কি সংগত নয় যে, কারও মৃত্যুতে জাতির সদস্যগণ শোকাহত হতে পারে, কিন্তু জাতির সত্তা তাতে নত হতে পারে না, জাতির স্বাধীনতা তাতে খর্ব হতে পারে না। জাতীয় পতাকাকে যদি জাতিসত্তার স্বতন্ত্র পরিচয়ের প্রতীক মনে করা হয়, এটিকে যদি জাতির স্বাধীনতার প্রতীক মনে করা হয়, তাহলে কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে জাতীয় পতাকাকে নমিত করে জাতির সত্তাকে খর্ব করে দেখানো যুক্তিসংগত হয় কী করে? এভাবে জাতির স্বাধীনতাকে খর্ব করে দেখানো যুক্তিসংগত হতে পারে না। তদুপরি কোন জাতীয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুকে জাতীয় শোকে নয় বরং জাতীয় শক্তিতে পরিণত করার দৃষ্টিভংগিতে এক্ষেত্রে জাতীয় পতাকাকে নমিত না করে বরং আরও উঁচু করে শক্তি প্রদর্শন করলেই তো যুক্তিসংগত হতে পারত।

সর্বশেষে নারীর ক্ষমতায়ন প্রসঙ্গে আসা যাক। নারীর ক্ষমতায়ন কেন গুরুত্বপূর্ণ তাও বোধগম্য নয়। নারী কি শারীরিক ও মেধাগতভাবে পুরুষের তুলনায় অগ্রসর যে নারীকে ক্ষমতায় বসালে উন্নতি বেশি হবে? বৈজ্ঞানিকভাবেই তো প্রমাণিত যে, দু' একজন ব্যক্তিক্রম ছাড়া সাধারণভাবে নারী শারীরিক ও মেধাগতভাবে পুরুষের তুলনায় দুর্বল। তাহলে তাদেরকে ক্ষমতায় বসালে ফায়দাটা কী? দুর্বলকে ক্ষমতা বা নেতৃত্বে বসালে কি কাজ বেশি হয়? তদুপরি নারী স্বাস্থ্যগত কারণে প্রতি মাসেই কয়েকদিন কর্মক্ষম থাকে না, তাহলে নারীর ক্ষমতায়ন কি কর্ম অঙ্গনে একটা নিয়মিত শূণ্যতাকেই বৃদ্ধি করবে না? তদুপরি যে সমাজে বিপুল সংখ্যক পুরুষ কর্মহীন তাদের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা না করে সে স্থলে নারীকে কর্মাঙ্গনে টেনে আনার কী যুক্তি থাকতে পারে, যেখানে পুরুষদের দ্বারাই কাজ বেশি নেয়া সম্ভব?

নারীর ক্ষমতায়নের প্রবক্তারা স্বীকার করুন বা না করুন নারীদেরকে পর্দার বাইরে টেনে এনে তাদের খাহেশ নিবৃত্তির সুযোগ সৃষ্টির কৌশল ছাড়া নারীর ক্ষমতায়নের ধোয়া তোলার পেছনে আর কোন সদুদ্দেশ্য আছে বলে আমাদের বোধগম্য নয়।

www.maktabatulabrar.com

এ তো গেল যতটা গুরুত্বের তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়ার কয়েকটা উদাহরণ। কিংবা আদৌ গুরুত্বপূর্ণ না হওয়া সত্ত্বেও তাতে গুরুত্ব আরোপের কিঞ্চিত বিবরণ। এর বিপরীত এমন অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো না করার কারণে দেশ রসাতলে যাচ্ছে, দেশের মানুষের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে, অথচ বলতে গেলে সেগুলোকে মোটেই গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না, (যেগুলোর কয়েকটা বিষয় পূর্বের পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে।) এভাবে বহু ক্ষেত্রে আমরা ভারসাম্যহীনতার শিকার।

যিনি যে শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ তাকে শুধু সে শাস্ত্রেই বিশেষজ্ঞ ভাবা উচিত অন্য শাস্ত্রে নয়

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, যে বিষয়টা যতটুকু গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়টাকে ততটুকুই গুরুত্বপূর্ণ ভাবা উচিত এবং ততটুকুই গুরুত্ব প্রদান করা উচিত, না তার চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করা উচিত না তার চেয়ে কম। এ বিষয়টা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। অতএব কোন ব্যক্তি কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হলে তাকে সেই শাস্ত্রের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। এজন্যই ইসলামে নিয়ম রাখা হয়েছে কোন বিষয়ে আলোচনা উঠলে সেই বিষয়ে যিনি বিশেষজ্ঞ তাকে সে ব্যাপারে কথা বলতে প্রাধান্য দেয়া চাই। সেখানে ঐই বিশেষজ্ঞের উপস্থিতিতে অন্যকে কথা বলতে প্রাধান্য দেয়া হলে এটাই অনুমিত হবে যে, সেই বিষয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে অধিক মূল্যায়ন করা হল। এটাও এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা। আবার এক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হলেই সব বিষয়ে তাকে প্রাধান্য দেয়া– এটাও এক ধরনের ভারসাম্যহীনতা। যেমন এক ব্যক্তি আইন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তথা ব্যারিস্টার। এখন আইন বিষয়ে কথা এলে অবশ্যই তার কথাকে অধিক মূল্যায়ন করতে হবে। কিন্তু অন্য বিষয় এলে যেমন কৃষি কাজ কীভাবে করতে হবে এ প্রসঙ্গ এলে তখন বারিস্টারের কথা অধিক মূল্য পাবে না বরং তখন একজন কৃষিবিদের কথা অধিক মূল্য পাবে। কিন্তু আমরা অনেক সময় এই ভারসাম্য রক্ষা করে চলি না। আমরা অনেকেই এক বিষয়ে কেউ বিশেষজ্ঞ হলে সব বিষয়েই তাকে বিশেষজ্ঞের মর্যাদা প্রদান করে বসি। তাই দেখা যায় এক

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বিষয়ে কেউ ডক্টরেট করলে সব বিষয়েই তাকে ডক্টর মনে করে বসে থাকি। উদাহরণ স্বরূপ কেউ হয়তো পদার্থ বিজ্ঞানে ডক্টরেট করেছে কিংবা কোন মনীষীর জীবনী নিয়ে ডক্টরেট করেছে ব্যস তাকে সব বিষয়েই ডক্টর মনে করা হয়ে থাকে। তাই তিনি কুরআনের তাফসীর করলেও আমরা মনে করি উনি একজন ডক্টর, অতএব তার লেখা বা তার বলা তাফসীর কোন সাধারণ ব্যক্তির তাফসীর নয়! ফেকাহ বিষয়ে কথা বললেও মনে করি উনি একজন ডক্টর, অতএব তার কথা সাধারণ ব্যক্তির কথা নয়। অথচ প্রকৃত বিচারে তিনি তাফসীরের ক্ষেত্রে ডক্টর নন, তিনি ফেকাহ শাস্ত্রে ডক্টর নন। তিনি ডক্টর যে বিষয় নিয়ে তিনি ডক্টরেট করেছেন সে বিষয়ে। তিনি কুরআনের তাফসীর নিয়ে ডক্টরেট করেননি, ফেকাহ শাস্ত্র নিয়ে ডক্টরেট করেননি, অতএব এসব ব্যাপারে তিনি ডক্টর নন, এসব ব্যাপারে তিনি হয়তো একজন সাধারণ ব্যক্তি। অতএব এসব ব্যাপারে তার বক্তব্য বা মতামতকে সেভাবেই মূল্যায়ন করতে হবে। এটাই চিন্তার ভারসাম্য। এক শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে অন্য শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞ হিসেবে গ্রহণ করা মারাত্মক ভুল পরিণতিও ডেকে আনতে পারে। ইঞ্জিনিয়ার-এর কাছে রোগের চিকিৎসা নিলে রুগী মরতে পারে। চিকিৎসকের কথা অনুসারে ইমারত বানালে সেই ইমারতের তলে চাপা খাওয়া লাগতে পারে।

যাহোক যিনি যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নন, যিনি যে শাস্ত্রের লোক নন সে বিষয়ে এবং সে শাস্ত্রে তার কথা ও মতামতকে বিশেষজ্ঞের কথা ও মতামতের মত মূল্যায়ন না করার নীতি একটা স্বতঃসিদ্ধ নীতি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উক্তি থেকেও এ নীতির বিষয়ে আলো পাওয়া যায়। মদীনার লোকেরা খেজুর গাছে পরাগায়ন করত। তাতে ফলন ভাল হত। এটাকে তারা বলত "তাবীরে নাখ্ল" তথা খেজুর গাছের পরাগায়ন। একবার নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এটা না করলেই তো ভাল হত? সেমতে সে বছর খেজুর গাছের পরাগায়ন করা হল না। দেখা গেল সে বছর ফলন ভাল হয়নি। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বিষয়টা জানানো হল। তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

www.maktabatulabrar.com

«انما انا بشر إذا امرتكم بشئ من دينكم فخذوا به وإذا امرتكم بشئ من رأيى فانما انابشر.وفي رواية لابن ماجة : أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.»

অর্থাৎ, আমি তো মানুষ। যখন তোমাদেরকে দ্বীনী কোন বিষয়ে কোন নির্দেশ দেই তখন তোমরা তা পালন করো (কারণ দ্বীনী বিষয় আমি আমার নিজের থেকে বলি না, আল্লাহর পক্ষ থেকে বলে থাকি)। আর যখন আমার নিজের মত থেকে কিছু বলি তা আমি তো মানুষ। ইবনে মাজার রেওয়ায়েতে আছে তিনি বলেন, পার্থিব এসব বিষয়ে তোমরাই ভাল জান। (মুসলিম ও ইবনে মাজা)

এখানে লক্ষণীয় যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শারে' তথা দ্বীনী বিষয়ের বিধান প্রবর্তক। দ্বীনী বিষয়ে অবশ্যই তাঁর অনুসরণ করতে হবে, কেননা দ্বীনী বিষয়ে তিনি সর্বোচ্চ অথরিটি। দ্বীনী বিষয়ে অবশ্যই তিনি সবচেয়ে বড় বিশেষজ্ঞ। পক্ষান্তরে পার্থিব বিষয়ের ব্যাপারে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "পার্থিব এসব বিষয়ে তোমরাই ভাল জান।" এ থেকে বুঝে আসে পার্থিব বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞ নন[১] বলেই এ ক্ষেত্রে তাঁর কথা ও মতামতকে বিশেষজ্ঞের কথা ও মতামতের মত মূল্যায়ন না করতে বলেছেন।

যাকে উন্নতির নিয়ামক ভাবা হয় অথচ তা অবনতির কারণ কিংবা ভাবা হয় অবনতির কারণ অথচ তা উন্নতির নিয়ামক

আমাদের চিন্তায় অনেক স্থানেই ভুল রয়েছে। তার মধ্যে কোনটা উন্নতির নিয়ামক আর কোনটা অবনতির কারণ তা নিয়েও আমাদের চিন্তায় রয়েছে ভুল।

১। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পার্থিব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না বলাতে কেউ একথা মনে করবেন না যে, এতে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছোট করা হল। বস্তুত নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইলমে ওহীর ধারক বাহক। এটাই তাঁর মর্যাদার জন্য এবং বড় হওয়ার জন্য যথেষ্ট। তাঁর মর্যাদা ও মূল্যায়ন এরই ভিত্তিতে হবে। এর মোকাবেলায় নিছক জাগতিক বিষয়ে তাঁর পিছিয়ে থাকা কোন ধর্তব্যেই আসবে না। তিনি যেহেতু নিছক জাগতিক বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্য আসেননি অতএব এ বিষয়ে পারদর্শী হওয়া না হওয়াকে তাঁর মূল্যায়নের মাপকাঠি বিবেচনা করা হবে না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

উন্নতি বা অবনতি কাকে বলে?

বস্তুত উন্নতি আর অবনতি শব্দদু'টো বিপরীতার্থক। একটা অন্যটার বিপরীত অর্থ জ্ঞাপন করে। উন্নতির বিপরীত যা তা-ই হল অবনতি। উন্নতি শব্দটা 'উদ'+'নতি' থেকে গঠিত। উদ অর্থ উচ্চ আর নতি দ্বারা এখানে বোঝানো হয়েছে অবস্থা। অতএব উন্নতি অর্থ উচ্চ অবস্থা তথা সমৃদ্ধ অবস্থা। যা দ্বারা কোন জিনিস উঁচুতে পৌছে বা সমৃদ্ধ হয় সেটাই হল সেই জিনিসের উন্নতি। এই উঁচু নীচু বা সমৃদ্ধি অসমৃদ্ধির সর্বজনমান্য সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। অনিবার্য কারণে উন্নতি কথাটারও সর্বজনমান্য সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। উঁচু-নীচু বা সমৃদ্ধি অসমৃদ্ধির সর্বজনমান্য সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব না হওয়ার কারণ হচ্ছে একজনের কাছে যে জিনিস উঁচুতা বলে বিবেচিত অন্যজনের কাছে সেটাই হয়তো নীচতা বলে বিবেচিত। একজন যেটাকে সমৃদ্ধি মনে করে অন্যজন হয়তো সেটাকে সমৃদ্ধি মনে করে না। তাহলে ফল দাঁড়াল এই যে, একজন যেটাকে উন্নতি মনে করে অন্য একজন সেটাকে উন্নতি মনে করে না। যেমন: কেউ ঈমান, আমল-আখলাক ও আখেরাত বর্জন করে হলেও গাড়ি-বাড়ি, ধন-দৌলত করতে পারাকে উন্নতি বলে ভাবছে, আবার কেউ এভাবে গাড়ি-বাড়ি, ধন-দৌলত করতে পারাকে উন্নতি নয় বরং অধঃগতি বা অবনতি বলে মনে করছে। এভাবে কোন্‌টা উন্নতি আর কোন্‌টা অবনতি তা নির্ণয়ে বিরোধ দেখা দিচ্ছে। এই বিরোধের কারণেই বলা হচ্ছে উন্নতি কথাটার সর্বজনমান্য সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়।

কোন্‌টা উন্নতি আর কোন্‌টা অবনতি তা নির্ণয়ে যখন বিরোধ, তখন অনিবার্য ফল স্বরূপ কোন্‌টা দ্বারা উন্নতি হয় তথা কোন্‌টা উন্নতির নিয়ামক আর কোন্‌টার কারণে অবনতি হয় তথা কোন্‌টা অবনতির কারণ তা নির্ণয়েও মতপার্থক্য ঘটে যাচ্ছে। তাই কেউ পর্দাহীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সুদভিত্তিক অর্থনীতি ইত্যাদিকে উন্নতির নিয়ামক হিসেবে বিবেচনা করছে, আবার কেউ এগুলোকেই অবনতির কারণ বলে মনে করছে। কেউ মনে করছে ইসলাম সেকেলে ধর্ম, এ দিয়ে আধুনিক যুগে উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। আবার কেউ মনে করছে ইসলাম শাশ্বত ধর্ম, সবযুগের জন্য যুৎসই ধর্ম, অতএব এই ধর্ম

www.maktabatulabrar.com

দ্বারা ইহকাল পরকাল সব কালের উন্নতি করা সম্ভব এবং সব যুগে সম্ভব। কেউ মনে করছে পর্দা, ধর্মীয় শিক্ষা, ধর্মীয় লেবাস-পোশাক, ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুশীলন উন্নতির পক্ষে অন্তরায়। আবার কেউ মনে করছে ধর্ম-চর্চা ও ধর্মীয় আদর্শ অনুশীলনের মাধ্যমেই প্রকৃত উন্নতি সাধন হয়ে থাকে। এভাবে উন্নতি অবনতির পরিচয় এবং উন্নতির নিয়ামক ও অবনতির কারণ নির্ণয়ে চলছে বিরোধ।

আসলে উন্নতির সঠিক ব্যাখ্যা যদি আমরা অনুসরণ করতাম তাহলে হয়তো এই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়ে যেত। উন্নতি হল উঁচুতে পৌছা বা সমৃদ্ধির নাম। এখন দেখতে হবে এই উঁচুতে পৌছা বা সমৃদ্ধি দ্বারা কী উদ্দেশ্য? একটা ভবন শুধু গজ ফিতার মাপে উঁচু হলেই কি সেটা উন্নত ভবন বলে স্বীকৃতি পাবে যদি তার মধ্যে ভবনের মূল উদ্দেশ্য তথা বসবাসের ব্যবস্থা মানসম্পন্ন না হয়, ভবন টেকসই না হয়? নিশ্চয় না। একটা বিল্ডিংয়ে শুধু ইট, সিমেন্ট, বালু বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলেই কি ইট, সিমেন্ট, বালুতে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সেটা উন্নত বিল্ডিং বলে স্বীকৃতি পাবে যদি তার মধ্যে বিল্ডিংয়ের মূল উদ্দেশ্য তথা বসবাসের ব্যবস্থা মানসম্পন্ন না হয়, বিল্ডিং টেকসই না হয়? নিশ্চয় না। একজন মানুষ যদি শুধু আক্ষরিক অর্থে উঁচু হয় যেমন: মনে করুন এই যুগে সাত আট ফুট লম্বা হয় তাহলে এই উঁচু হওয়ার দ্বারা কি সে উন্নত মানুষ বলে স্বীকৃতি পাবে যদি তার মধ্যে মানুষের মূল জিনিস তথা মনুষত্বের অভাব থাকে? নিশ্চয় না। কিংবা যদি কোন মানুষের শরীরে পাঁচ দশ মণ গোসত থাকে তাহলে কি শুধু এই গোসতে সমৃদ্ধ হওয়ার কারণে সে উন্নত মানুষ বলে স্বীকৃতি পাবে যদি তার মধ্যে মানুষের মূল জিনিসের অভাব থাকে? নিশ্চয় না। তাহলে বুঝা গেল প্রত্যেক জিনিসের যে মূল উদ্দেশ্য বা মৌলিকত্ব তাতে মানসম্পন্ন হওয়া এবং তাতে সমৃদ্ধ হওয়াই হচ্ছে সেই জিনিসের উন্নতি। আর মূল উদ্দেশ্যে বা মৌলিকত্বে পিছিয়ে থাকাই হচ্ছে তার অবনতি। আর একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা আরও একটু পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। আমরা জানি রাস্তা-ঘাটের উদ্দেশ্য হচ্ছে চলাফেরার সুবিধা সৃষ্টি করা। অতএব যদি রাস্তা-ঘাটের শুধু সংখ্যাই বৃদ্ধি করতে থাকা হয়, কিংবা শুধু রাস্তা-ঘাটের দৈর্ঘ-প্রস্থে বৃদ্ধি ঘটানো হয়,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রাস্তাগুলোতে চলাফেরার অনুপযোগিতা বাড়তেই থাকে, তাহলে কেউ বলবে না রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হয়েছে, বরং বলবে রাস্তা-ঘাট বেড়েছে বটে তবে রাস্তা-ঘাটের উন্নতি হয়নি, কিংবা এ ভাষায় বলবে, রাস্তা-ঘাট বাড়ছে কিন্তু রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন হচ্ছে না।

অতএব প্রতীয়মান হল মূল উদ্দেশ্যে বা মৌলিকত্বে এগিয়ে যাওয়াই হচ্ছে উন্নতি। আর মূল উদ্দেশ্যে বা মৌলিকত্বে পিছিয়ে যাওয়াই হচ্ছে অবনতি। সুতরাং কোন মানুষ যদি ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক ও আখেরাত বর্জন করে গাড়ি-বাড়ি, ধন-দৌলত করে তাহলে তাকে উন্নতি আখ্যা দেয়া যেতে পারে না। কারণ তাতে মানুষ সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যে সে পিছিয়ে যায়। একই কারণে পর্দা, ধর্মীয় শিক্ষা, ধর্মীয় লেবাস-পোশাক, ধর্মীয় রীতি-নীতির অনুশীলন ইত্যাদিকে উন্নতির প্রতিকূল আখ্যা দেয়া সঠিক নয়, কেননা এগুলো মানবসৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যের অনুকূল। এগুলো দ্বারা মানুষ তার সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যে এগিয়ে যায়, পিছিয়ে যায় না।

এতক্ষণ উন্নতি অবনতির যে যুক্তিসংগত ব্যাখ্যা প্রদান করা হল সবাই যদি এই ব্যাখ্যা মেনে নিত তাহলে কোন্‌টাকে উন্নতি বলে আর কোন্‌টাকে অবনতি বলে তা নিয়ে কোন বিরোধ থাকত না। কিন্তু এ ব্যাখ্যা সবাই মানে না, যে যার মত এক একটাকে উন্নতি আর এক একটাকে অবনতি মনে করে বসে আছে, তাই কোন্‌টা উন্নতি আর কোন্‌টা অবনতি তা নিয়ে বিরোধের নিষ্পত্তি হচ্ছে না।

কোন্‌টা উন্নতি আর কোন্‌টা অবনতি বিরোধ নিষ্পত্তির উপায়

তাহলে এই বিরোধের নিষ্পত্তি কীভাবে হতে পারবে? এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমরা কার স্মরণাপন্ন হতে পারি? এই বিরোধ যখন মানুষের মধ্যকার বিরোধ, তখন কোন মানুষের কাছে এই বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য গেলে তিনি যে পক্ষের মত পোষণ করেন সে অনুসারেই তো ব্যাখ্যা দিবেন, সে অনুসারেই তো নিষ্পত্তির রায় দিবেন, আর অনিবার্য কারণেই তা অন্য পক্ষের কাছে পক্ষপাতদুষ্ট বলে আখ্যায়িত হবে। তাহলে তো নিষ্পত্তি হবে না। কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির কাছে

www.maktabatulabrar.com

যাবেন? তা এসব ব্যাপারে সবার কাছে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ বলে স্বীকৃত– এমন কোন ব্যক্তি পাওয়া যাবে কি? আদৌ না। সবচেয়ে বড় জ্ঞানীর কাছে যাবেন? তা সবচেয়ে বড় জ্ঞানী কে তা নিয়েও তো বিরোধ দেখা দিবে! তাহলে দেখা গেল এমন কেউ নেই যার কাছে গিয়ে আমরা এসব বিরোধের সর্বজনমান্য নিষ্পত্তি বের করে আনতে পারি। তবে হ্যাঁ এক সত্তা আছেন যিনি সর্বসম্মতিক্রমে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী। যার নিরপক্ষেতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা যায় না, যার নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কারও আপত্তিও থাকতে পারে না। তাহলে সেই সত্তার কাছে চলুন এবং তিনি যে রায় দেন তা মেনে নিন। সেই সত্তা হল আল্লাহ রব্বুল আলামীন। তাঁর থেকেই পাওয়া যাবে সত্যিকার নিষ্পত্তি। এজন্য মানুষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে আল্লাহর দিকে রুজু করার কথা কুরআনে কারীমে বলে দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলার দিকে রুজু করার অর্থ আল্লাহর বাণী তথা কুরআনের দিকে রুজু করা। আর আল্লাহ তাআলা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে সবকিছুর নিষ্পত্তি সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করেছেন। তাই রসূলের দিকেও তথা রসূলের বাণী হাদীছের দিকেও রুজু করতে হবে। প্রশ্ন হতে পারে– বিবদমান পক্ষদ্বয়ের কোন এক পক্ষ মুসলমান না হলে তারা তো কুরআন হাদীছের দিকে রুজু করবে না, তাহলে অমুসলমানদের সাথে নিষ্পত্তির উপায় কি? এর উত্তর হল আমরা মুসলামনদের মধ্যে এসব ব্যাপারে নিষ্পত্তির পন্থা নিয়ে আলোচনা করছি। অমুসলমানদের সাথে তো মূল ধর্ম নিয়েই বিরোধ, তাদের সাথে মৌলিক বিরোধের নিষ্পত্তি হলে এসব শাখা বিষয়ের বিরোধেরও নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। সারকথা– বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আমাদের মুসলমাদেরকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে তথা কুরআন ও হাদীছের দিকে রুজু করতে হবে। এ মর্মে কুরআনে কারীমে সূরা নিছার ৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.﴾

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় তাহলে আল্লাহর দিকে (তথা আল্লাহর বাণী কুরআনের দিকে) এবং রসূলের দিকে (তথা রসূলের বাণী হাদীছের দিকে) রুজু কর, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। (বিরোধ নিষ্পত্তির) এটাই হচ্ছে উত্তম ব্যবস্থা এবং এটাই পরিণামের দিক থেকে সুন্দর। (কেননা এটাই সুন্দর নিষ্পত্তিমূলক পরিণাম এনে দেবে।)

উন্নতির নিয়ামক ও অবনতির কারণ

তাহলে এবার আমরা আমাদের আলোচ্য বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আল্লাহ আল্লাহর রসূলের দিকে তথা কুরআন-হাদীছের দিকে রুজু করতে পারি। দেখা যাক কুরআন-হাদীছে কোন্ জিনিসগুলোকে উন্নতির নিয়ামক আর কোন্ জিনিসগুলোকে অবনতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কুরআনে কারীমের একটি আয়াতের বক্তব্য লক্ষ করুন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى.﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে মুমিন অবস্থায় নেক আমলাদি নিয়ে তাদের জন্য রয়েছে উঁচু তথা উন্নত সব মর্যাদা।

(সূরা তাহা: ৭৫)

এ আয়াত থেকে স্পষ্টত বুঝা যাচ্ছে ঈমান এবং নেক আমলাদি দ্বারা মানুষ উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবে। আর এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, উন্নত মানুষই উন্নত মর্যাদার অধিকারী হবে। অতএব এ আয়াত থেকেই প্রমাণ মিলল ঈমান এবং নেক আমল দ্বারা মানুষ উন্নত হয়, ঈমান ও নেক আমল অবনতির কারণ নয় বরং উন্নতির নিয়ামক। পক্ষান্তরে কুফ্র, শির্ক ও পাপ কার্যাদি দ্বারা মানুষের অবনতি হয়, কুফ্র, শির্ক ও পাপ কার্যাদি অবনতির কারণ। সংক্ষেপে কথা হল নেকির পথই হচ্ছে উন্নতির পথ। আর পাপের পথ হচ্ছে অবনতির পথ।

এই বক্তব্যের কাছাকাছি হাদীছের বক্তব্য লক্ষ করুন। এক নাতিদীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে আছে,

www.maktabatulabrar.com

مَنْ حَسَّنَ خُلُقَهُ بُنِيَ لَهُ فِيْ أَعْلَاهَا. (رواه الترمذي برقم ١٩٩٣ وقال: هذا حديث حسن.)

অর্থাৎ, যে তার চরিত্রকে সুন্দর করে, তার জন্য জান্নাতের উঁচু স্তরে বালাখানা নির্মাণ করা হবে। (তিরমিযী: হাদীছ নং ১৯৯৩)

এখানেও লক্ষণীয় যে, চরিত্রকে সুন্দর করলে জান্নাতের উঁচু স্তর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। বুঝা গেল চরিত্রকে সুন্দর করলে উঁচু হওয়া যায়। এর দ্বারা উঁচু হওয়া যায় বলেই এর দ্বারা জান্নাতের উঁচু স্তর পাওয়া যায়। আর উঁচু হওয়াই তো হল উন্নতি। তাহলে অবশ্যই প্রমাণিত হল চরিত্রের উন্নতি হচ্ছে মানুষের উন্নতি। আর চরিত্রের অবনতি হচ্ছে মানুষের অবনতি। চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন হচ্ছে উন্নতির নিয়ামক। আর চরিত্রের অপকর্ষ সাধন হচ্ছে অবনতির কারণ। অতএব পর্দাহীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নাচ-গান ইত্যাদি যেসব জিনিস দ্বারা চরিত্রের অধপতন ঘটে তা কোনোক্রমেই উন্নতির উপকরণ হতে পারে না। এসব জিনিসের অবাধ বিস্তৃতি ঘটলে তাকে উন্নতি আখ্যা দেয়া সঠিক নয়।

এ হল কুরআন-হাদীছের বক্তব্য অনুযায়ী কোন্টা উন্নতি আর কোন্টা অবনতি, কোন্টা উন্নতির নিয়ামক আর কোন্টা অবনতির কারণ তার বিবরণ। অতএব আমাদের যাদের মধ্যে এর বিপরীত চিন্তা রয়েছে তারা নিজেদের চিন্তা দোরস্ত করে নিতে পারি। মনে রাখা চাই চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের এই পরিচ্ছেদের আলোচনার সারকথা হল–

- ঈমান ও নেক আমল উন্নতির নিয়ামক। পক্ষান্তরে কুফ্র, শির্ক ও পাপ কার্যাদি অবনতির কারণ।
- ঈমান, আমল-আখলাক ও আখেরাত বর্জন করে হলেও গাড়ি-বাড়ি, ধন-দৌলত করতে পারা উন্নতি নয় বরং অধঃগতি বা অবনতি।
- চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন উন্নতির নিয়ামক। পক্ষান্তরে চরিত্রের অপকর্ষ সাধন অবনতির কারণ।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

- পর্দাহীনতা, নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, নাচ-গান ইত্যাদি দ্বারা চরিত্রের অধপতন ঘটে বিধায় তা উন্নতির উপকরণ নয় বরং অবনতির কারণ।

যা ভাবা হয় কঠিন অথচ তা সহজ

কঠিনকে সহজ ভাবা কিংবা সহজকে কঠিন ভাবাও চিন্তার এক ধরনের ভুল। আমাদের জীবনে এরূপ ভুলও রয়েছে প্রচুর। এরূপ বিষয়ের বিবরণ প্রদানের পূর্বে কঠিন ও সহজ কথা দু'টো সম্বন্ধে কিছু ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন মনে করছি।

'কঠিন' ও 'সহজ'-এর সংজ্ঞা

'কঠিন' ও 'সহজ' কথা দু'টোর শাশ্বত ও সর্বজনমান্য সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়। বস্তুত কঠিন বা সহজ হল আপেক্ষিক জিনিস, যুগ ও ব্যক্তির পার্থক্যে এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য ঘটে থাকে। এক যুগে যেটা কঠিন বলে মনে হয় আরেক যুগে সেটা আর কঠিন বলে মনে হয় না। আবার একই জিনিস একজনের কাছে অনেক কঠিন মনে হয় কিন্তু অন্য অনেকের কাছে সেটা কঠিন মনে হয় না বরং সহজ বোধ হয়। এভাবে যুগ ও ব্যক্তির পার্থক্যে এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য ঘটে থাকে। বহু রোগের চিকিৎসা এক যুগে কঠিন ছিল এখন সেগুলো আর কঠিন থাকেনি, ডাল ভাতের মত সহজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এক সময় বলা হত, যার হয় যক্ষা তার নেই রক্ষা, কিন্তু এখন আর সেটা থাকেনি। এক যুগে কয়েক ঘণ্টায় দূর-দূরান্তের দেশে চলে যাওয়া শুধু কঠিনই ছিল না অসম্ভব ছিল, সুদূর পরাহত ছিল, অথচ বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে এখন তা শুধু সহজ ও সম্ভবই নয় নিত্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এভাবে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের ফলে অনেক কঠিনই এখন সহজ হয়ে পড়েছে। এ হল যুগের পার্থক্যে কঠিন ও সহজের মধ্যে পার্থক্য ঘটার উদাহরণ। অতএব কঠিন ও সহজ-এর শাশ্বত সংজ্ঞা দেয়া (তথা এমন সংজ্ঞা দেয়া যা সর্বযুগে চলনসই) সম্ভব নয়। আর ব্যক্তির পার্থক্যে এ দু'টোর মধ্যে পার্থক্য ঘটার ব্যাপারটা তো আমাদের প্রত্যেকের জীবনে নিত্য ঘটে থাকে। যে বিষয় একজনের মাথায় কোনোভাবেই ঢোকে না- এত কঠিন, সেটাই হয়ত

www.maktabatulabrar.com

অন্য একজনের কাছে পান্তা ভাতের মত সহজ। ছাত্রদের অংক শেখানোর সময় এই খেলা খুব দেখা যায়। কারও মাথায় হয়তো একটা অংক কোনোভাবেই ঢোকে না আবার সেটাই অন্য অনেকের মাথায় সহজে ঢুকে যায়। অতএব কঠিন ও সহজ-এর সর্বজনমান্য সংজ্ঞা (তথা এমন সংজ্ঞা যা সকলের বেলায় প্রযোজ্য) দেয়াও সম্ভব নয়। তাই বলছিলাম, 'কঠিন' ও 'সহজ' কথা দু'টোর শাশ্বত ও সর্বজনমান্য সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়।

বস্তুত 'কঠিন' ও 'সহজ' হল আপেক্ষিক জিনিস। একই জিনিস এক সময়ে কঠিন অন্য সময়ে কঠিন নয়, একজনের কাছে কঠিন আরেকজনের কাছে কঠিন নয়।

একজনের কাছে কঠিন বোধ হওয়া আরেকজনের কাছে কঠিন বোধ না হওয়ার কারণ দু'জনের মেধাগত পার্থক্যও হতে পারে, আবার বিভিন্ন রকমের আনুষঙ্গিক বিষয় যেমন অভ্যাস থাকা না থাকাও তার কারণ হতে পারে। অনেক জিনিস এমন আছে যা অভ্যাস না থাকার কারণে একজনের কাছে কঠিন লাগতে পারে অথচ সেটাই অভ্যাস থাকার কারণে অন্য একজনের কাছে মোটেই কঠিন লাগে না। এও এক ধরনের আপেক্ষিকতা। এ ক্ষেত্রে অভ্যাস থাকা না থাকার পার্থক্যে কঠিন বা সহজ হওয়ার উপলব্ধিতে পার্থক্য ঘটে থাকে। নামায, রোযা, ইবাদত-বন্দেগী সৎ থাকা, পর্দায় থাকা, দাড়ি রাখা ইত্যাদি বিষয়গুলো এমনই। যাদের অভ্যাস হয়ে যায় তাদের কাছে এগুলো মোটেই কঠিন লাগে না, অথচ যাদের অভ্যাস নেই তাদের কাছে এগুলো কতইনা কঠিন বোধ হয়। একজন বে-নামাযী পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে হবে চিন্তা করলে তার মাথায় যেন আসমান ভেঙ্গে পড়ে, নামাযের জন্য তাকে ডাকা হলে সে বিব্রত বোধ করতে থাকে, এটা তার জন্য অস্বস্তি বোধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, অথচ নিয়মিত নামাযী কোন নামাযের ওয়াক্ত এসে গেলে সেই ওয়াক্তের নামায আদায় না করা পর্যন্ত স্বস্তি বোধ করে না। নামায আদায় করা তার জন্য শুধু সহজই নয় বরং স্বস্তি লাভের উপকরণ। একজন পর্দাহীন নারীকে পর্দা করতে বললে পর্দা শুরু করার আগেই

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যেন তার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। সে মনে করে পর্দা ছাড়া কী সুন্দর ফুরফুর করে চলছি। পর্দা করতে গেলে যে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব! পর্দা করা তার কাছে অনেক কঠিন বোধ হয়। সে পর্দা ছাড়াই চলতে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। অথচ পর্দায় অভ্যস্থ নারী পর্দা ছাড়া রাস্তায় বের হলে ফুরফুরে মনোভাব তো দূরের কথা তার হাত-পা যেন অবশ হয়ে আসবে, চলৎশক্তি যেন হারিয়ে বসবে। তার জন্য পর্দা করা কঠিন বোধ হয় না, বরং পর্দা করে চলতেই সে স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। যারা দাড়ি রাখেনি তাদের কাছে দাড়ি রাখা কঠিন বোধ হয়, এরকম অনেকের কাছে মনে হয় দাড়ি রেখে ওরকম জবুথবু হয়ে চলাও কি সম্ভব? অথচ যারা দাড়ি রাখে তারা দিব্যি চলছে– কোনোই প্রতিকূলতা অনুভব করছে না। এই যে বোধের পার্থক্য তা অভ্যাস থাকা না থাকার কারণে হয়ে থাকে।

শরীয়তের অনেক বিধানই এমন। প্রথম প্রথম চলতে অনেকের কাছে কঠিন লাগলেও চলতে চলতে অভ্যস্ত হওয়ার পর আর কঠিন লাগে না।

শরীয়তের বিধান কি কঠিন?

বস্তুত শরীয়তের কোনো বিধানই কঠিন না অর্থাৎ এমন নয় যা মানুষের সাধ্যের বাইরে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا.﴾

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাআলা কাউকে তার সাধ্যের বাইরে কোনো বিধান দেন না।" (সূরা বাকারা: ২৮৬) আর যা সাধ্যের মধ্যে তা প্রকৃতপক্ষে কঠিন নয়। অতএব যদি শরীয়তের কোন বিধান কঠিন বোধ হয় তাহলে বুঝতে হবে এটা প্রকৃতপক্ষে কঠিন না হওয়া সত্ত্বেও যখন কঠিন বোধ হচ্ছে, তাহলে অন্য কোন কারণ রয়েছে যার ফলে কঠিন বোধ হচেছ, বস্তুত সেই কারণ দূর করতে পারলেই তা আর কঠিন বলে মনে হবে না।

নজর হেফাজত করা কি কঠিন?

যা ভাবা হয় কঠিন অথচ তা সহজ এরকম আর একটা বিষয় হল নজর হেফাজতের বিষয়। অনেকেই এটাকে খুব কঠিন মনে করে থাকেন।

www.maktabatulabrar.com

তারা বলেও থাকেন রাস্তা-ঘাটে, হাট-বাজারে, গ্রাম-গঞ্জে, অফিস-আদালতে সর্বত্র মহিলাদের যেভাবে ছড়াছড়ি তাতে নজর হেফাজত করা কঠিন। অথচ নজর হেফাজত করা খুবই সহজ। নজর হেফাজতের জন্য মাত্র একটা কাজই করতে হয়। তা হল নিচের দিকে নজর দিয়ে চলা। তাহলে মানুষের শুধু নিচের অংশেই নজরে পড়বে, তারপর নারী বোধ হলে আর উপরের দিকে নজর তুলবেন না। ব্যস এভাবে আপনার নজরের হেফাজত হয়ে যাবে। তাছাড়া কখনও অনিচ্ছায় নজর পড়ে গেলে সে নজরকে দীর্ঘায়িত না করলেই হল। তাহলেও আপনার কোন গোনাহ হবে না। নিচের দিকে নজর দিয়ে চললে যে নজর হেফাজত করা সম্ভব তার একটা ঘটনা শুনুন। এক বুযুর্গের কাছে তার এক মুরীদ এই আপত্তি তুলেছিল যে, হযরত! সর্বত্র নারীদের বিচরণ, নজর হেফাজত করা যে সম্ভব হয় না। তখন ঐ বুযুর্গ তাকে পূর্ণাঙ্গ দুধে ভরা একটা গ্লাস দিয়ে বললেন, এই গ্লাসটা হাতে নিয়ে অমুক জায়গা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসবে। সাবধান এক ফোটা দুধ যদি ছলকে পড়ে তাহলে তোমার পিছনে এই লোককে নিয়োজিত করলাম দুধ পড়ামাত্র সে তোমাকে লাঠি দিয়ে পেটানো শুরু করবে। মুরীদ দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে খুব সাবধানে ধীর পায়ে গ্লাসের দিকে নজর রেখে সেই স্থান পর্যন্ত গেল এবং ফিরে এল। বুযুর্গ জিজ্ঞাসা করলেন, এই আসা যাওয়ার মধ্যে কোন নারীর দিকে তোমার নজর পড়েছে কি? সে উত্তর দিল, জী না হযরত! আমি তো এদিক ওদিক তাকানোর সুযোগই পাইনি, দুধ পড়ে গেলে লাঠির আঘাত খেতে হবে এই ভয়ে দুধের গ্লাসের দিকে আর নিচে রাস্তার দিকে নজর দিয়ে হাঁটতে হয়েছে, কোন নারীর দিকে নজর যায়নি। তখন ঐ বুযুর্গ বললেন, এমনিভাবে কেউ যদি নারীর দিকে নজর দিলে আল্লাহর আযাব হবে এই আযাবের ভয়ে নিচের দিকে নজর দিয়ে চলে, তাহলে তার পক্ষেও নজর হেফাজত করা সম্ভব।

সুদ ঘুষ থেকে বেঁচে থাকা কি কঠিন?

যা ভাবা হয় কঠিন অথচ তা সহজ– এরকম আর একটা বিষয় হল সুদ ঘুষ থেকে বেঁচে থাকা। অনেকেই এটাকে খুব কঠিন মনে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করেন। তারা বলেও থাকেন, সুদ ঘুষ ছাড়া অফিস আদালতের কোন কাজই উদ্ধার হয় না। তাহলে কীভাবে আমরা সুদ ঘুষ থেকে বেঁচে থাকব? সুদ ঘুষ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অথচ সুদ ঘুষ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব। সুদ থেকে কীভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব তা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর ঘুষ থেকে কীভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব তা শুনুন। অন্যায়ভাবে কোন স্বার্থ উদ্ধার করার জন্য ঘুষ দিবেন না। অন্যায়ভাবে স্বার্থ উদ্ধার করা তো অন্যায়। সেই অন্যায় থেকে তো বেঁচে থাকতে চান। অন্যায় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ঘুষ দেয়াকে ঘুষ দেয়ার অপারগতা বলা যায় না, সেটা হল লোভ থেকে বিরত হতে না পারা। আর ন্যায্য স্বার্থ উদ্ধারের জন্য (অর্থাৎ, যেখানে নিজের ন্যায্য হক প্রতিষ্ঠিত, সেই হক আদায় করার জন্য) যদি ঘুষ দেয়া ছাড়া কোন উপায় না থাকে, তাহলে আপনি সেখানে মাযূর, সে ক্ষেত্রে ঘুষ দেয়া আপনার জন্য অন্যায় নয়। সেরূপ ক্ষেত্রে ঘুষ দিলেও তাতে আপনার পাপ হবে না। কাজেই সেখানে ঘুষ দিলেও যেন আপনি দেননি, যেন ঘুষ দেয়া থেকে বিরতই রয়েছেন। তাহলে ঘুষ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় কথাটা ঠিক নয়।

বস্তুত শরীয়তের কোন বিধানই প্রকৃতপক্ষে কঠিন নয়। বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কারণে অথবা বিভিন্ন অমূলক ধারনার কারণে কিংবা বিভিন্ন রকমের পাপ চিন্তাকে চরিতার্থ করার মত ভ্রান্ত মানসিকতার কারণে সেগুলো কঠিন মনে হয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নে শরীয়তের কয়েকটা বিধান ও তা কঠিন বোধ হওয়ার কারণ উল্লেখ করে বিষয়টা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি।

শরীয়তের বিভিন্ন বিধান কঠিন বোধ হওয়ার কিছু কারণ

- নামায কঠিন বোধ হয় অভ্যাস না থাকার কারণে কিংবা অলসতার কারণে।
- রোযা কঠিন বোধ হয় অভ্যাস না থাকার কারণে কিংবা কষ্টসহিষ্ণুতার অভাব থাকার কারণে কিংবা রসনা সংযত রাখার মত মানসিক শক্তি না থাকার কারণে।

www.maktabatulabrar.com

- হজ্জ-উমরা কঠিন বোধ হয় কার্পণ্যের কারণে বা অর্থ সঞ্চিত রাখার অতিরিক্ত মোহের কারণে কিংবা হজ্জ-উমরায় অর্থ ব্যয় করলে ভবিষ্যতে আল্লাহ বরকত দিবেন– এই বিশ্বাস দুর্বল থাকার কারণে। ক্ষেত্র বিশেষে শারীরিক কষ্টসহিষ্ণুতার অভাব থাকার কারণে।
- যাকাত কঠিন বোধ হয় কার্পণ্যের কারণে বা অর্থ সঞ্চিত রাখার অতিরিক্ত মোহের কারণে কিংবা যাকাত দিলে ভবিষ্যতে আল্লাহ বরকত দিবেন– এই বিশ্বাস দুর্বল থাকার কারণে।
- দান-সদকা কঠিন বোধ হয় কার্পণ্যের কারণে বা অর্থ সঞ্চিত রাখার অতিরিক্ত মোহের কারণে কিংবা দান-সদকা করলে ভবিষ্যতে আল্লাহ বরকত দিবেন– এই বিশ্বাস দুর্বল থাকার কারণে অথবা গরীব-দুঃখীদের প্রতি সহমর্মিতাবোধ পর্যাপ্ত না থাকার কারণে।
- দাড়ি রাখা কঠিন বোধ হয় বউয়ের কাছে আকর্ষণীয় থাকা যাবে না– এই ভ্রান্ত চিন্তায়। তার চেয়ে আরও মারাত্মক হল পরনারীদের কাছে আকর্ষণীয় থাকা যাবে না, পরনারীদের সাহচর্য লাভ করা যাবে না, খেলাধুলা, নাচ-গান, ক্লাব পার্ক ইত্যাদিতে যাওয়া যাবে না, জীবনে রোমান্স থাকবে না– এইসব পাপী খাহেশ মনের মধ্যে লালন করার কারণে। অনেকের ক্ষেত্রে এই মানসিকতার কারণে যে, দাড়ি রাখলে প্রগতিশীল দেখাবে না, সেকেলে মনে হবে, মানুষে হুজুর বলবে ইত্যাদি।
- দ্বীনী লেবাস-পোশাক, টুপি পাগড়ী ইত্যাদি কঠিন বোধ হওয়ার কারণও সেগুলোই যা দাড়ি রাখা কঠিন বোধ হওয়ার কারণ হিসেবে কেবলমাত্র উল্লেখ করা হল।
- পর্দা করা কঠিন বোধ হয় অভ্যাস না থাকার কারণে কিংবা পরপুরুষদেরকে নিজের রূপ প্রদর্শনের চিন্তা থাকার কারণে কিংবা অবাধে পর পুরুষদের সাথে মেলামেশার মাধ্যমে খাহেশাত পূরণের উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে– এই চিন্তায় কিংবা নিজেকে তথাকথিত প্রগতিশীলা, আধুনিকা ও স্মার্ট প্রতিপন্ন করা যাবে না– এই চিন্তায়।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

- হালাল উপার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা কঠিন বোধ হয় তথা সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম উপার্জনের পন্থা বর্জন করা কঠিন বোধ হয় এই চিন্তায় যে, হালাল উপার্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে আয়-উপার্জন কমে যেতে পারে, তাহলে গাড়ি বাড়ি করা যাবে না, বিলাসিতা করা যাবে না, টাকা-পয়সা না থাকলে মানুষের কাছে দাম পাওয়া যাবে না, মাথা উঁচু করে থাকা যাবে না, ফুটানি দেখানো যাবে না, পরমুখাপেক্ষী হওয়া লাগতে পারে, মানুষের কাছে হাত পাতার মত বে-ইজ্জতীর পথে যাওয়া লাগতে পারে ইত্যাদি।

এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, কেউ যদি হালাল পথে থেকেও পরমুখাপেক্ষী হওয়া থেকে বাঁচতে চায় এবং পরের কাছে হাত পাতার মত বে-ইজ্জতী থেকে বাঁচতে চায় তাহলে আল্লাহ তাকে পরমুখাপেক্ষী বানান না। এ সম্পর্কিত হাদীছের স্পষ্ট ভাষ্য লক্ষ করুন। বোখারী মুসলিমসহ হাদীসের অনেক কিতাবে এসেছে– এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«مَنْ يَسْتَعِفَّ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ.»

অর্থাৎ, যে পবিত্র থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন, আর যে পরমুখাপেক্ষী না হয়ে থাকতে চায় আল্লাহ তাকে পরমুখাপেক্ষীহীন রাখেন।

- নজর হেফাজত করা কঠিন হয়ে থাকে নিচের দিকে নজর দিয়ে না চলার কারণে। নিচের দিকে নজর দিয়ে চললে এবং অনিচ্ছাবশত নজর পড়ে গেলে সে নজরকে দীর্ঘায়িত না করলেই নজর হেফাজত করা সহজ।
- সুদ ঘুষ থেকে বাঁচা কঠিন বোধ হয়ে থাকে লোভ ছাড়তে না পারার কারণে, কিংবা মাসআলা না বুঝার কারণে।

যা ভাবা হয় সহজ অথচ তা কঠিন

পূর্বের পরিচ্ছেদে আমরা এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যে বিষয়গুলো কঠিন ভাবা হয় অথচ প্রকৃতপক্ষে সেগুলো কঠিন নয় বরং

www.maktabatulabrar.com

সহজ। বিভিন্ন আনুষঙ্গিক কারণে অথবা বিভিন্ন অমূলক ধারনার কারণে কিংবা বিভিন্ন রকমের পাপ চিন্তাকে চরিতার্থ করার মত ভ্রান্ত চিন্তা-চেতনার কারণে সেগুলো কঠিন মনে হয়। এবার এমন কিছু বিষয়ের কথা উল্লেখ করছি যেগুলোকে সহজ ভাবা হয় অথচ তা সহজ নয় বরং কঠিন। কঠিনকে সহজ মনে করাও চিন্তার এক ধরনের ভুল।

মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ঘাটিগুলো কি সহজ?

যে বিষয়গুলোকে সহজ ভাবা হয় অথচ তা কঠিন তার মধ্যে একটা হল মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ঘাটিগুলো। এই ঘাটিগুলোকে অনেকেই খুব সহজ বোধ করে থাকে। তারা বলে থাকে, আরে মরার পর কী হয় তা তখন দেখা যাবে! তার মানে তারা মরার পরের বিষয়গুলোকে খুব সহজ বা হালকা মনে করছে। অনেকে মুখে না বললেও তাদের হাবভাবে মনে হয় মরার পরে কবরের আযাব, জাহান্নামের শাস্তি ইত্যাদি যেন তেমন কঠিন কিছু নয়। কঠিন বিশ্বাস করলে এবং মনের মধ্যে সেই বিশ্বাস-সঞ্জাত চিন্তা-চেতনা সক্রীয় থাকলে কীকরে মানুষ অবলীলায় পাপের পথে যেতে পারে! যদি কেউ সত্যিকার অর্থে বিশ্বাস করে একটা বাক্সের মধ্যে বীষাক্ত সাপ আছে তাহলে কি সে কখনও সেই বাক্সে হাত দিতে পারে যদি তার সামান্য বোধ থাকে? বস্তুত কবরের আযাব, জাহান্নামের আযাব সহজ নয় অনেক কঠিন! এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ.﴾

অর্থাৎ, বরং আল্লাহর শাস্তি বড়ই কঠিন। (সূরা হজ্জ: ২)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ.﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই আল্লাহর পাকড়াও বড়ই কঠিন। (সূরা বুরূজ: ১২)

এক হাদীছে কবরের শাস্তির একটা বিবরণে ইরশাদ হয়েছে,

«يُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ تِنِّيناً تَنْهَشُهُ وَتَلْدَغُهُ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ وَلَوْ أَنَّ تِنِّيناً مِنْهَا نَفَخَ فِي الأَرْضِ مَا أَنْبَتَتْ خَضْرَاءَ.»

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, কবরে কাফেরের উপর এমন নিরানব্বইটা বিষাক্ত সাপ নিযুক্ত করা হবে যারা কেয়ামত পর্যন্ত তাকে দংশন করতে থাকবে। তার একটা সাপ যদি ভূপৃষ্ঠে একবার ফুঁ দিত তাহলে তার বীষক্রিয়ায় তাতে আর কোনোদিন ঘাসপাতা গজাত না। (সুনানে দারিমী, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

আল্লাহ তায়ালা আমাদের মনে জাহান্নামের আযাবের ভয়, কবরের আযাবের ভয় সৃষ্টি করে দিন। আমাদের চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করে দিন। আমীন!

কুরআনের তাফসীর করা কি সহজ?

যে বিষয়গুলোকে সহজ ভাবা হয় অথচ তা কঠিন তার মধ্যে আর একটা বিষয় হল কুরআনের তাফসীর করা। ইদানিং মসজিদে-মসজিদে বা তাফসীরের মজলিসে কিছু লোকের তাফসীর করা দেখে মনে হচ্ছে কুরআনের তাফসীর করতে যেন কোন যোগ্যতারই প্রয়োজন নেই। আরব দেশে কিছুদিন চাকরি করে এসেছে, দু' চারটে আরবী কথা বলতে বা বুঝতে শিখেছে, ব্যস তাফসীর করার যোগ্যতা এসে গেছে, মহল্লার মসজিদে পাঁচজনকে ডেকে নিয়ে তাফসীর করতে আরম্ভ করেছে। এমন অনেক লোকও আমরা দেখেছি, যারা অতটুকু আরবীও বোঝে না, বাজারে কুরআনে মাজিদের তরজমা তাফসীর পাওয়া যায় ব্যস তা দেখে নিজেই মুফাসসিরে কুরআন সেজে বসেছে, তাফসীর করা শুরু করে দিয়েছে। এসব লোকের ভাব দেখে মনে হয় কুরআন মাজীদের তাফসীর করা যেন একটা ছেলেখেলা, এর জন্য কোনই যোগ্যতার প্রয়োজন নেই। অথচ উলামায়ে কেরাম তাফসীরের জন্য বেশ কিছু গুণাবলী ও যোগ্যতা থাকার কথা বলেছেন। আল্লামা ইব্‌নে আবিদ্দুনিয়া (রহ.) বলেছেন, ১৫টা বিষয় এমন রয়েছে, যে সম্বন্ধে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কেউ মুফাস্‌সির হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে না। এই ১৫টা বিষয়ের পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করা ব্যতীত কেউ তাফসীর করলে তার তাফসীর 'তাফসীর বির্‌-রায়' তথা মনগড়া তাফসীর তথা মনগড়া ব্যাখ্যা বলে আখ্যায়িত হবে। বিষয় পনেরটা এই:–

www.maktabatulabrar.com

১. লোগাত (আরবী ভাষা)।
২. নাহু (আরবী ব্যাকরণ)।
৩. সরফ (আরবী শব্দ প্রকরণ)
৪. ইল্‌মে ইশতেক্বাক্ব (শব্দের ব্যুৎপত্তি জ্ঞান)।
৫. ইল্‌মে মাআনী (আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা)।
৬. ইল্‌মে বয়ান (আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা)।
৭. ইল্‌মে বাদী' (আরবী অলংকার শাস্ত্রের একটি শাখা)।
৮. ইল্‌মে ক্বেরাত।
৯. উসূলে দ্বীন।
১০. উসূলে ফেকাহ।
১১. ফেকাহ।
১২. আসবাবে নুযূল ও ক্বাসাস (কুরআনের অবতরণ–পেক্ষাপট ও সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলী)।
১৩. নাসেখ, মান্‌সূখ।
১৪. কুরআনের মুজমাল ও মুবহাম–এর ব্যাখ্যা সম্বলিত হাদীছসমূহ।
১৫. 'ইলমুল মাওহিবাহ' তথা কেউ ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করলে আল্লাহ তা'আলা তাকে যে বিশেষ জ্ঞান দান করেন সেই জ্ঞান।

উপরোক্ত বিষয়াদি সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান অর্জন করার সাথে সাথে মুফাসসিরের মধ্যে আরও কয়েকটি বিষয় থাকতে হবে। ইমাম আবুত্তাইয়্যেব তাবারী (রহ.) বলেছেন, মুফাসসিরের আকীদা সহীহ হতে হবে, তার মধ্যে সুন্নাতের ইত্তেবা থাকতে হবে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বর্ণনার উপর নির্ভরতা থাকতে হবে, সাহাবা ও তাবিয়ীনের বর্ণনার উপর নির্ভরতা থাকতে হবে। তাঁদের বর্ণনার মধ্যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে যথাসাধ্য সেগুলোর মাঝে সমন্বয় সাধন করা সম্ভব হলে তা করতে হবে।

(الإتقان في علوم القران للسيوطي থেকে গৃহীত।)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ইজতিহাদ করা বা মুজতাহিদ হওয়া কি সহজ?

যে বিষয়গুলোকে সহজ ভাবা হয় অথচ তা কঠিন তার মধ্যে আর একটা বিষয় হল ইজতিহাদ করা বা মুজতাহিদ হওয়া। এখন তো মনে করা হয় মুজতাহিদ হওয়া পানি পান্থার মত এক সহজ ব্যাপার। দু' চারটে হাদীছের বাংলা অর্থ জানেন কিংবা দু' পাঁচটা আয়াতের তর্জমা জানেন ব্যস ইজতিহাদ তথা গবেষণা শুরু করে দেন এবং বড় বড় মুজতাহিদ মনীষীর মতামতকে উড়িয়ে দিয়ে নিজে নতুন কিছু একটা মত পেশ করে বসেন। অথচ মুজতাহিদ হওয়া এত চাট্টিখানি কথা নয়। উলামায়ে কেরাম লিখেছেন– কুরআন হাদীছ থেকে ইজতিহাদ করার জন্য তথা মুজতাহিদ হওয়ার জন্য কুরআন হাদীছের ভাষা আরবী ও আরবী সাহিত্য সম্বন্ধে যথেষ্ট পারদর্শিতা থাকতে হবে। সেই সাথে নাহু (আরবী ব্যকরণ), সরফ (আরবী শব্দ প্রকরণ), বালাগাত (আরবী অলংকার), হাদীছ, উলুমূল হাদীছ, উসূলে ফেকাহ ইত্যাদি বহু বিষয়ে পারদর্শিতা থাকতে হবে। মুজতাহিদ হওয়ার জন্য আরোপিত এসব শর্ত উলামায়ে কেরামের গায়ের জোরে আরোপ করা শর্ত নয়। একটু চিন্তা করলেই বুঝে আসবে এসব বিদ্যায় পারদর্শী না হলে তার পক্ষে কোনোভাবেই ইজতিহাদ তথা গবেষণা করা সম্ভব নয়। এটা এতটাই স্পষ্ট ও স্বতঃসিদ্ধ (ঝবষভ বারফবহঃ) বিষয় যে, এর বেশি ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন নেই। কারও মধ্যে এসব জ্ঞান বিদ্যমান না থাকা সত্ত্বেও সে যদি ইজতিহাদ করতে লেগে যায়, তাহলে তা তেমনই হাস্যকর ছেলেখেলা বলে আখ্যায়িত হবে যেমন একজন লোক ইংরেজি ভাষা ও ইংরেজি ভাষার গ্রামার না বুঝা সত্ত্বেও ইংরেজি ভাষায় লিখিত কোন বইয়ের শুধু অনুবাদই নয় রীতিমত তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও তা থেকে সুক্ষ্ম তত্ত্বকথা বের করতে প্রবৃত্ত হলে তা হাস্যকর ছেলেখেলা বলে আখ্যায়িত হবে।

কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া কি সহজ?

যে বিষয়গুলোকে সহজ ভাবা হয় অথচ তা কঠিন তার মধ্যে আর একটা বিষয় হল কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া। ইদানিং দেখা যাচ্ছে কেউ

www.maktabatulabrar.com

একটা শাস্ত্রের একটা দু'টো বই পাঠ করেই সে নিজেকে সেই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ মনে করে বসছে। এমনকি একটা বই পাঠ না করেও হয়তো সেই বিষয়ে কোথাও কয়েকদিনের একটা প্রশিক্ষণকোর্সে অংশ নিয়েছে, ব্যস নিজেকে সেই বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ভাবা শুরু করে দিয়েছে, এমনকি সেমতে অন্যদেরও সে বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া শুরু করেছে। অথচ যারা সত্যিকার অর্থেই কোন শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞ হয়েছেন তারা বলেন, কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হতে চাইলে সেই শাস্ত্রের উপর লেখা ছোটবড় সব বইপত্রই মোটামুটি পাঠ করা আবশ্যক। অন্তত তার সম্যক খোঁজখবর থাকা আবশ্যক। এবং সেই শাস্ত্রের উপর লেখা বইপত্রের মধ্যে অন্তত একটা মৌলিক বইয়ের বিষয়বস্তু আদ্যোপান্ত আত্মস্থ থাকা আবশ্যক। আরও আবশ্যক সেই শাস্ত্রের বিষয়াদি নিয়ে যেসব মত মতান্তর রয়েছে সেগুলোর মধ্যে পর্যালোচনা পূর্বক শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয় বা সমন্বয় সাধনের যোগ্যতা অর্জিত হওয়া।

"যা ভাবা হয় সহজ অথচ তা কঠিন" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- মৃত্যু পরবর্তী ঘাটিগুলো সহজ নয় বরং কঠিন।
- কুরআনের তাফসীর করা সহজ নয় বরং কঠিন।
- ইজতিহাদ করা বা মুজতাহিদ হওয়া সহজ নয় বরং কঠিন।
- কোন শাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ হওয়া সহজ নয় বরং কঠিন।

যা মনে করা হয় ভাল অথচ তা মন্দ কিংবা মনে করা হয় মন্দ অথচ তা ভাল

ভালকে ভাল ভাবা এবং মন্দকে মন্দ ভাবা যেমন চিন্তার ভারসাম্য, তেমনি যেটা যতটুকু ভাল কিংবা যেটা যতটুকু মন্দ সেটাকে ততটুকুই ভাল বা মন্দ বিবেচনা করা– এটাও চিন্তার ভারসাম্যের অন্তর্ভুক্ত। তার বিরপীত চিন্তার ভারসাম্যহীনতা, চিন্তার ভুল।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পৃথিবীতে ভাল ও মন্দ উভয় ধরনের জিনিস রয়েছে। সবকিছুই যেমন ভাল নয় তেমনি সবকিছু মন্দও নয়। আবার যাকিছু ভাল তার পুরোটাই যে ভাল তা না-ও হতে পারে, হতে পারে তার মধ্যে কিছু মন্দ দিকও রয়েছে। এমনিভাবে যাকিছু মন্দ তার পুরোটাই যে মন্দ তা না-ও হতে পারে, হতে পারে তার মধ্যে কিছু ভাল দিকও রয়েছে। আয়-উপার্জন করা, খাবার তৈরি করার জন্য রান্নাবান্না করা, খাদ্য-খাবার গ্রহণ করা এগুলো ভাল, কিন্তু এগুলোর মধ্যে মন্দ দিকও রয়েছে: আয়-উপার্জন করতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলার কষ্ট হয়, রান্নাবান্না করতে গিয়ে আগুনের তাপ ও ধোঁয়ার কষ্ট সইতে হয়, খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করলে সেগুলো দুর্গন্ধযুক্ত মল-মূত্র হয়ে কষ্ট দেয়। পক্ষান্তরে সাপ মন্দ, কারণ সাপ মানুষের জীবন নাশের কারণ হয়, কিন্তু তার মধ্যে ভালোর দিকও রয়েছে, তার বীষে ওষুধ হয়।

যেগুলো পুরোপুরি ভাল তাকে চোখ বন্ধ করেই ভাল আখ্যায়িত করা হয়। তদ্রূপ যার পুরোটাই খারাপ তাকেও চোখ বন্ধ করেই মন্দ আখ্যায়িত করা হয়। কিন্তু যেসব জিনিসের মধ্যে ভাল ও মন্দ উভয় দিক রয়েছে সেগুলোকে দ্ব্যর্থহীনভাবে ভাল কিংবা মন্দ আখ্যায়িত করা যায় না। সেরূপ ক্ষেত্রে ভালোর দিক প্রবল হলে তাকে ভাল আখ্যায়িত করা হয়, তখন সামান্য মন্দের দিকটাকে উপেক্ষা করে তথা সামান্য মন্দের দিকটাকে ধর্তব্যে না এনেই তাকে ভাল আখ্যায়িত করা হয়। পক্ষান্তরে মন্দের দিক প্রবল হলে তাকে মন্দ আখ্যায়িত করা হয়, তখন সামান্য ভালোর দিকটাকে উপেক্ষা করে তথা সামান্য ভালোর দিকটাকে এড়িয়ে গিয়েই তাকে মন্দ আখ্যায়িত করা হয়।

এখন প্রশ্ন হল, কোন্‌টা পুরোপুরি ভাল বা পুরোপুরি মন্দ তা আমরা নির্ণয় করব কীভাবে? এমনিভাবে কোনটার মধ্যে ভাল-মন্দ উভয় দিক থাকলে তার ভাল কত পার্সেন্ট বা কী পরিমাণ বেশি হলে ভালোর দিক প্রবল ধরে তাকে ভাল আখ্যায়িত করা হবে, পক্ষান্তরে মন্দ কত পার্সেন্ট বা কী পরিমাণ বেশি হলে মন্দের দিক প্রবল ধরে তাকে মন্দ

www.maktabatulabrar.com

আখ্যায়িত করা হবে? আবার সেই পার্সেন্টিজ বা পরিমাণ মাপাই বা হবে কী দিয়ে? এই ভাল মন্দ নির্ণয়ের কাজ বা ভাল মন্দের পার্সেন্টিজ ও পরিমাপ নিরুপণের কাজ তো পাল্লা পড়ের বা বাটখারা পাথর দিয়ে সম্ভব নয়। মানুষের বিচার-বিবেচনার উপর কি তা ছেড়ে দেয়া যায়? না, তা যায় না। কারণ একই জিনিস লাখো কোটি মানুষের বিচার-বিবেচনায় মন্দ সাব্যস্ত হওয়ার পরও কিছু লোকের বিচার-বিবেচনায় তা ভাল মনে হতে পারে। এই দেখুন সম্প্রতি (২০১৫ সনে) পুরুষে পুরুষে সমকামিতার মত একটা প্রায় সর্বসম্মত চির শাশ্বত মন্দ পন্থাকেও আমেরিকায় কিছু লোক পছন্দ করে আইন বানিয়ে তাকে বৈধতা দিয়ে দিল। মানুষে মানুষে বিচার-বিবেচনায় এমন অস্বাভাবিক পার্থক্যও দেখা যায়। আবার যুগের পরিবর্তনেও মানুষের বিচার-বিবেচনা পাল্টে যায়। এক সময় মানুষ ভাল বিবেচনা করে যেটাকে সাদরে কোলে তুলে নেয়, চুমু খায়, পরবর্তি এক সময়ে সেটাকেই ঘৃণাভরে ডাস্টবিনে ছুড়ে মারে ও তার উপর থুথু দেয়। কিংবা এক সময় মানুষ যেটাকে খারাপ মনে করে, যুগের পরিবর্তনে সেটাকেই অতি ভাল মনে করতে শুরু করা হয়। এই দেখুন খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, দুনিয়ার বহু দেশের মানুষ কমুনিজমকে ভাল মনে করে লুফে নিয়েছিল, কিন্তু কয়েক যুগ পার হতে না হতেই ঘৃণাভরে আবার সেটাকে তারা ডাস্টবিনে ছুড়ে মারল। আরও দেখুন যে খেলাধুলাকে এক সময় সবাই বাজে কাজ মনে করত, ছেলেরা নিতান্ত সাস্থ্যচর্চার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে অতিরিক্ত খেলাধুলায় মত্ত হয়ে পড়লে মুরব্বীরা মনে করতেন ওরা উচ্ছন্নে গেছে, সেই খেলাধুলাকেই এখন জাতীয় মর্যাদার ভিত্তি বানিয়ে ফেলা হয়েছে। ছেলেরা এখন লেখাপড়া সিকেয় তুলে রেখেও যদি খেলাধুলায় পারদর্শী হতে পারে তবুও গুরুজনরা তা নিয়ে গর্বে বুক ফুলায়। এই যেখানে মানুষে মানুষে যুগে যুগে বিচার-বিবেচনায় এমন আসমান-জমিনের তফাৎ, সেখানে মানুষের বিচার-বিবেচনার উপর ভাল-মন্দ নিরূপনের কাজটা কীভাবে ছেড়ে দেয়া যায়?

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বস্তুত মানুষের বিচার-বিবেচনার ওপর ভাল-মন্দ নিরূপনের চূড়ান্ত ভার ছেড়ে দেয়া যায় না। কারণ তারা অনেক ক্ষেত্রে ভালকে মন্দ ভেবে ভুল করে, আবার মন্দকে ভাল ভেবে বিভ্রান্ত হয়। কুরআনে কারীমে এ কথাটিকেই কত সুন্দরভাবে বলা হয়েছে,

﴿عَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.﴾

অর্থাৎ, হতে পারে তোমরা কোন কিছুকে খারাপ মনে করবে অথচ সেটি তোমাদের জন্য ভাল, আবার হতে পারে কোনকিছুকে তোমরা ভাল মনে করবে অথচ সেটা তোমাদের জন্য মন্দ। বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। (সূরা বাকারা: ২১৬)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে ভাল মন্দ নিরূপনের চূড়ান্ত ভার মানুষের ওপর ছাড়া যায় না, কারণ তাদের বিচার-বিবেচনায় ভুল হতে পারে, তারা উল্টো বুঝে বসে থাকতে পারে।

তাহলে কোন্‌টি ভাল আর কোন্‌টা মন্দ তা চূড়ান্তভাবে নিরূপনের পদ্ধতি কী? সেই পদ্ধতিটা কি তার দিকেও উপরোক্ত আয়াতে ইংগিত করে দেয়া হয়েছে। "বস্তুত আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না।" –এ কথার মধ্যেই সে ইংগিতটি রয়েছে। এ কথার দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে, তোমরা যেহেতু জান না অর্থাৎ পরিপূর্ণভাবে ও অকাট্যভাবে জান না, তোমাদের জ্ঞান যেহেতু পরিপূর্ণ ও অকাট্য নয়, তাই ভাল মন্দ নিরুপণের পূর্ণাঙ্গ ও অকাট্য মাপকাঠি তোমাদের কাছে নেই। অতএব কোন্‌টি ভাল কোন্‌টা মন্দ তা চূড়ান্তভাবে নিরূপনের ভার তোমাদের উপর ছাড়া যায় না। পক্ষান্তরে আল্লাহর জ্ঞান যেহেতু পরিপূর্ণ ও অকাট্য, তাই ভাল মন্দ নিরুপণের পূর্ণাঙ্গ ও অকাট্য মাপকাঠি তাঁর কাছে রয়েছে। অতএব কোন্‌টি ভাল কোন্‌টা মন্দ তা চূড়ান্তভাবে নিরূপনের বিষয়টা আল্লাহর উপর ন্যাস্ত রাখ। সেমতে তিনি যেটা করতে বলেছেন বা যার অনুমতি দিয়েছেন, সেটাকেই চূড়ান্তভাবে ভাল ও মঙ্গলজনক বিশ্বাস করে তদনুযায়ী কাজ করে যাও, যদিও তা তোমাদের কাছে খারাপ মনে হয়। পক্ষান্তরে তিনি

www.maktabatulabrar.com

যেটা করতে বারণ করেছেন বা যার অনুমতি দেননি সেটাকেই চূড়ান্তভাবে খারাপ বিশ্বাস করে তা থেকে বিরত থাক, যদিও তা তোমাদের কাছে ভাল মনে হয়। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও যেটা করতে বলেছেন বা যার অনুমতি দিয়েছেন, সেটাকেও চূড়ান্তভাবে ভাল ও মঙ্গলজনক বিশ্বাস করে তদনুযায়ী কাজ করে যেতে হবে, যদিও তা আমাদের কাছে খারাপ মনে হয়। পক্ষান্তরে তিনি যেটা করতে বারণ করেছেন বা যার অনুমতি দেননি সেটাকে চূড়ান্তভাবে খারাপ বিশ্বাস করে তা থেকে বিরত থাকতে হবে, যদিও তা আমাদের কাছে ভাল মনে হয়। কারণ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বীনী বিষয়ে কোনো কিছুই নিজের থেকে বলতেন না, যা কিছু তিনি বলতেন আল্লাহ তাআলা থেকে ওহীর মাধ্যমে জেনেই বলতেন। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى.﴾

অর্থাৎ, সে (মুহাম্মাদ সা.) নিজের খেয়াল-খুশি থেকে কিছুই বলে না, যা বলে তা শুধু ওহী, যে ওহী তাঁর কাছে পাঠানো হয়।

(সূরা নাজ্‌ম: ৩-৪)

এতক্ষণের আলোচনার সারকথা হল, আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আদেশকৃত বা অনুমোদিত বিষয় চূড়ান্তভাবেই ভাল বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের বারণকৃত বিষয় চূড়ান্তভাবেই খারাপ বলে বিবেচিত হবে। আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আদেশকৃত বা অনুমোদিত বিষয় কোনক্রমেই খারাপ হতে পারে না। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের আদেশ বা অনুমোদনের বিরুদ্ধ কোনো বিষয়ই ভাল হতে পারে না। আরও সংক্ষেপে কথা হল শরীয়ত অনুমোদিত বিষয় নির্দ্বিধায় ভাল, আর শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয় নির্দ্বিধায় মন্দ। অতএব নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা, জেহাদ, দাড়ি, টুপি, তাসবীহ, জুব্বা, আসকান, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি বিষয়কে যত মানুষই মন্দ বলুক বা মন্দ মনে করুক না কেন এগুলো ভালই। কেননা এগুলো

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

শরীয়ত নির্দেশিত বিষয়। পক্ষান্তরে মদ, নেশা, খেল-তামাশা, নাচ-গান, যেনা, সমকামিতা, বেহায়া-বেলেল্লাপনা, সিনেমা বাইস্কোপ ইত্যাদি বিষয়কে যত মানুষই ভাল বলুক বা ভাল মনে করুক না কেন এগুলো মন্দই। কেননা এগুলো শরীয়ত নিষিদ্ধ বিষয়।

সুতরাং কেউ যদি আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা, জেহাদ, দাড়ি, টুপি, তাসবীহ, জুব্বা, আসকান, মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ ইত্যাদি বিষয় মন্দ, তাহলে নির্দিধায় আপনি মনে করতে পারেন এটা একটা উল্টো চেষ্টা। পক্ষান্তরে কেউ যদি আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করে যে, মদ, খেল-তামাশা, নাচ-গান, যেনা, সমকামিতা, বেহায়া-বেলেল্লাপনা, সিনেমা বাইস্কোপ ইত্যাদি বিষয় ভাল, তাহলেও নির্দিধায় আপনি মনে করতে পারেন এটা একটা উল্টো চেষ্টা।

উল্টো চেষ্টা মূলত শয়তানের কাজ। শয়তানই মনের মধ্যে উল্টো চিন্তা-চেতনার উদ্রেক করে থাকে। কুরআনে কারীমের বহু সংখ্যক আয়াতে এ কথা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, আল্লাহ যে চিন্তা-চেতনার কথা বলেন শয়তান তার বিপরীত চিন্তা-চেতনার কথা বলে। আল্লাহ যা বোঝান শয়তান তার বিপরীতটা বোঝায়। যেমন: একটা বিষয়– আল্লাহ যেনা ও অশ্লীলতার ধারে কাছে যেতেও নিষেধ করেন, ইরশাদ হচ্ছে,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.﴾

অর্থাৎ, তোমরা যেনার কাছেও যেয়ো না, অবশ্যই সেটা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ। (সূরা বাণী ইসরাঈল: ৩২)

আর অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা প্রকাশ্য অ-প্রকাশ্য কোনো রকম অশ্লীলতার কাছেও যেয়ো না। (সূরা আনআম: ১৫১)

এ দুই আয়াতে যেনা ও অশ্লীলতার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। অর্থাৎ, আল্লাহ এগুলো থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ

www.maktabatulabrar.com

শয়তান তার বিপরীত নির্দেশ দেয়, সে অশ্লীলতার নির্দেশ দেয়। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ.﴾

অর্থাৎ, সে (শয়তান) তো অশ্লীল ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়।
(সূরা বাকারা: ১৬৯)

আর একটা বিষয়– আল্লাহ বোঝান, দান-সদকা করলে যাকাত দিলে সম্পদ বাড়বে, সম্পদে বরকত হবে। আর শয়তান বোঝায় দান-সদকা করলে যাকাত দিলে সম্পদ হ্রাস পায়, অভাব আসে। এই দুই মর্মে কুরআনে কারীমের দু'টো ভাষ্য লক্ষ করুন।

﴿يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ সুদ (তথা সুদী কারবার-এর বরকত)কে মোচন করে দেন এবং দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। (সূরা বাকারাহ: ২৭৬)

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ.﴾

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদেরকে (দান-সদকা করলে) অভাব এসে যাওয়ার ভয় দেখায়। (সূরা বাকারা: ২৬৮)

আর একটা বিষয়– আল্লাহ বলেন, শয়তান তোমাদের শত্রু, সে তোমাদের কল্যালকামী নয়। আর শয়তান মানুষকে বোঝায় আমি তোমাদের কল্যাণকামী। এই দুই মর্মে কুরআনে কারীমের দু'টো ভাষ্য লক্ষ করুন।

﴿وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ.﴾

অর্থাৎ, আর শয়তান যেন কোনক্রমেই তোমাদেরকে সঠিক পথ থেকে প্রতিহত করতে না পারে। অবশ্যই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।
(সূরা শূরা: ৬২)

﴿وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ.﴾

অর্থাৎ, আর সে (শয়তান) তাদেরকে (আদম ও হাওয়াকে) কসম দিয়ে বলল, অবশ্যই আমি তোমাদের কল্যাণকামী। (সূরা আ'রাফ: ২১)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আর একটা বিষয়– আল্লাহ তাআলা হযরত আদম ও হাওয়া (আ.)কে বোঝালেন এই বৃক্ষের ফল খেয়ো না তাহলে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচারকারী হয়ে দাঁড়াবে, (সেটা তোমাদের ঠিক হবে না।) এর বিপরীত শয়তান তাদেরকে বোঝাল এই বৃক্ষের ফল খেলে তোমরা ফেরেশতা হয়ে যেতে পারবে কিংবা জান্নাতের স্থায়ী হতে পারবে। এই দুই মর্মে কুরআনে কারীমের দু'টো ভাষ্য লক্ষ করুন।

﴿وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা এই গাছের ধারে কাছেও যাবে না, তাহলে তোমরা নিজেদের প্রতি অবিচারকারী হবে। (সূরা বাকারা: ৩৫)

﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ.﴾

অর্থাৎ, সে (শয়তান) বলল, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদেরকে এই বৃক্ষ থেকে নিষেধ করেছেন শুধু এ কারণে যাতে তোমরা ফেরেশতা না হয়ে যাও কিংবা তোমরা স্থায়ী না হয়ে যাও। (সূরা আ'রাফ: ২০)

এভাবে আল্লাহ আল্লাহর রসূলের তথা কুরআন সুন্নাহর বিপরীত বোঝানো শয়তানেরই কাজ। অনেক মানুষ স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে শয়তানের এই কাজে নিজেদের জড়িয়ে শয়তানের দোসর সেজে বসে। অনেকে না জেনে না বুঝেও এসব কাজে জড়িয়ে শয়তানের দোসর হয়ে পড়ে। তারাও মানুষকে উল্টো বোঝানোর কাজে লেগে পড়ে। এ ব্যাপারে আমাদের মুমিনদের হুশিয়ার থাকা চাই। কে আমাদের কী চিন্তা গেলাতে চায়, সে চিন্তা কি আল্লাহ আল্লাহর রসূলের দেয়া চিন্তা না শয়তানের উদ্রেক করে দেয়া চিন্তা সে ব্যাপারে সজাগ সচেতন থাকা চাই। চিন্তা-চেতনা দোরস্ত রাখার স্বার্থেই এটা চাই। মনে রাখা চাই চিন্তা-চেতনার বিভ্রান্তি বড় বিভ্রান্তি, চিন্তা-চেতনার বিভ্রান্তি মৌলিক বিভ্রান্তি।

যা মোটাকথা, তবুও অনেকের মাথায় ঢোকে না

আমাদের জীবনে এমন বহু বিষয় রয়েছে, যা সহজ হওয়া সত্ত্বেও, মোটাকথা হওয়া সত্ত্বেও অনেকের মাথায় ঢোকে না, ফলে বিভ্রান্তির অন্ত

www.maktabatulabrar.com

থাকে না। এরূপ কয়েকটা মোটাকথা সম্বন্ধে এখানে আলোচনা করতে চাই।

যা মোটাকথা হওয়া সত্ত্বেও অনেকের মাথায় ঢোকে না, যার ফলে অনেক বিভ্রান্তি হয়– এরূপ একটা বিষয় হল কিছু ভণ্ড লোকের কথা– যেমন মারেফতী লাইনে গেলে নামায, রোযা ইত্যাদি করা লাগে না। এটা যে বিভ্রান্তিকর তা একটা মোটা বিষয়। যে ইবাদত-বন্দেগীর জন্য আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করলেন, যে ইবাদত-বন্দেগী শিক্ষা দেয়ার জন্য কুরআন নাযেল করলেন, যে কুরআনের ব্যাখ্যা বোঝানোর জন্য রসূল প্রেরণ করলেন, সেই আল্লাহ কুরআনের কোথাও বললেন না, রসূলও কোথাও বললেন না যে, লাইন দু'টো: শরীয়তের লাইন আর মারেফাতের লাইন। যারা শরীয়তের লাইনে থাকবে তাদের জন্য ইবাদত-বন্দেগী আর যারা মারেফাতের লাইনে যাবে তাদের জন্য ইবাদত-বন্দেগী নয় বরং তাদের জন্য গান-বাদ্য আর ঢাক-ঢোল। আশ্চর্য লাগে আমাদের সমাজের ঐসব লোকদের প্রতি যারা এই ভণ্ডদের এমন মোটা বিভ্রান্তিকর কথার পেছনে পড়ে নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ছেড়ে দিয়ে গান-বাদ্য আর ঢোল-ঢাকরের তালে নাচতে শুরু করে। তাদের কি এতটুকু চিন্তাশক্তিও নেই?

যা মোটাকথা হওয়া সত্ত্বেও অনেকের মাথায় ঢোকে না, যার ফলে অনেক বিভ্রান্তি হয়– এরূপ আর একটা বিষয় হল কিছু ভণ্ডের দর্শন–মন ঠিক হয়ে গেলে ইবাদত করা লাগে না। এটা যে বিভ্রান্তিকর তা একটা মোটা বিষয়। যদি মন ঠিক হয়ে গেলে নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত করার প্রয়োজন না থাকে, তাহলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম, তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন এবং যুগ যুগের লক্ষ কোটি আলেম, বুযুর্গ ও দ্বীনদার মানুষ কেন ইবাদত-বন্দেগী করতেন, করে আসছেন? ঐ ভণ্ডরা অন্যদের বেলায় না হয় দুঃসাহসের সাথেই বলে ফেলল যে, তাদের মন ঠিক হয়নি, কিন্তু তারা কি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের ব্যাপারেও দুঃসাহসের সাথে বলতে পারবে তাঁদের মনও ঠিক হয়নি?

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যা মোটাকথা হওয়া সত্ত্বেও অনেকের মাথায় ঢোকে না, যার ফলে অনেক বিভ্রান্তি হয়– এরূপ আর একটা বিষয় হল তাকলীদের বিষয়। তাকলীদ তথা কোন ইমামের মাযহাব মান্য করার প্রয়োজন এমন একটা মোটাবিষয়, যা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার হওয়ার কথা নয়। এ রকম একটা মোটাবিষয় নিয়ে কারও বিভ্রান্তিতে পড়ারও কথা নয়। অথচ এই মোটাবিষয়টাও অনেকের মাথায় ঢোকে না, এর প্রয়োজন তাদের বুঝে আসে না। ফলে এ বিষয়টা নিয়ে তারা বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছেন।

কুরআন-হাদীছ মানা জরুরি– এটা যেমন একটা মোটাকথা, তেমনি সরাসরি যারা কুরআন-হাদীছ বোঝেন না, কিংবা কিছু বুঝলেও কুরআন-হাদীছ থেকে ইজতেহাদ তথা গবেষণা করে সবকিছুর বিধি-বিধান ও হুকুম-আহকাম বের করতে সক্ষম নন, তাদের পক্ষে কুরআন-হাদীছ অনুযায়ী চলতে হলে যারা কুরআন-হাদীছ ভাল করে বোঝেন এবং কুরআন-হাদীছ থেকে ইজতেহাদ গবেষণা করে সবকিছুর হুকুম-আহকাম ও বিধি-বিধান সঠিকভাবে বের করতে সক্ষম তাদের স্মরণাপন্ন হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই– এটাও একটা মোটাকথা। অর্থাৎ, নিজে না বুঝলে বুঝমানদের স্মরণাপন্ন হতে হবে– এটা একটা মোটাকথা। যারা বোঝেন না তারা বুঝমান লোকদের স্মরণাপন্ন হবেন এবং তারা যেভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে যেভাবে বিধি-বিধান বলবেন সেটা মেনে চলবেন এর প্রয়োজন আর ব্যাখ্যা করার দরকার রইল কোথায়? এই যে, বুঝমান লোকদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মেনে চলা এ-ই তো হল তাকলীদ। ছোট্ট একটা ঘটনা বলি। একবার হজ্জের সময় আমরা বেশ কিছু আলেম ও গর আলেম মক্কা শরীফের মসজিদে হারামে যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার মুহতামিম ও শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মাহমুদুল হাসান সাহেবের কাছে বসা ছিলাম। তিনি বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে একজন ইয়ামানী আরব এসে হযরতকে জিজ্ঞাসা করলেন। আপনারা নাকি বলেন, তাকলীদ করা ওয়াজিব? হযরত বললেন, হাঁ তাকলীদ করা ওয়াজিব। (সওয়াল জওয়াব আরবীতেই হচ্ছিল। আমি তার সারকথা বাংলায় উল্লেখ করছি।) লোকটি তখন বলল, কোন মানুষের কথা মানা ওয়াজিব হবে কেন? কুরআন-হাদীছের কথা মানা

www.maktabatulabrar.com

ওয়াজিব। তখন হযরত উল্টো তাকে প্রশ্ন করলেন। যারা কুরআন-হাদীছ বোঝে না, কুরআন হাদীছ থেকে হুকুম-আহকাম বের করতে পারে না তারা কী করবে? তারা কীভাবে আমল করবে? লোকটা উত্তর দিল, কোন বিজ্ঞ আলেমকে জিজ্ঞাসা করে সে অনুযায়ী আমল করবে। হযরত বললেন, এটাই তো তাকলীদ। আলেমকে কেন মানা হবে? মানতে হবে কুরআন হাদীছকে! লোকটি অল্প কথায় বুঝে গেল এবং বলে উঠল, মা শাআল্লাহ ইয়া শায়েখ। আরও কিছু সামান্য কথা হওয়ার পর লোকটি বিদায় নিল।

বস্তুত তাকলীদের প্রয়োজন এভাবে অল্পতেই সকলেরই বুঝে আসার কথা ছিল। এটা এমন একটা মোটা বিষয় যা মাথায় না ঢোকার কথা নয়, কিন্তু তবুও অনেকের মাথায় ঢোকে না। যারা তাকলীদের বিরোধী তথা যারা আহ্‌লে হাদীছ বা গায়র মুকাল্লিদ বা সালাফী নামে পরিচিত তাদের সাধারণ যে কোনো লোককে যদি জিজ্ঞাসা করা হয়– ভাই, আপনি মাসআলা-মাসায়েল কোত্থেকে শেখেন, কোন্ আমল কীভাবে করতে হবে তা কীভাবে জানেন? সে নির্দ্বিধায় বলবে, আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব থেকে জেনে নেই, বা বলবে, আমাদের আলেমদের থেকে জেনে নেই, কিংবা বলবে, বই-কিতাব পড়ে জেনে নেই। এখানে কেন তাদের মনে প্রশ্ন জাগে না, ইমাম সাহেবের কথা কেন মানা হবে? আলেমদের কথা কেন মানা হবে? কোন বই-কিতাবের লেখকের কথা কেন মানা হবে? তাদেরকে মানা হলে সেটাও তো তাদের তাকলীদই হয়ে গেল। এভাবে যে তারা অসংখ্য আলেমের তাকলীদ করে চলেছেন– এমন প্রশ্ন করা হলে অবশ্যই তারা উত্তর দিবে, ইমাম সাহেব বা আলেমরা তো কুরআন-হাদীছ থেকেই বলেন। তাদের প্রতি আমাদের আস্থা আছে, তারা কুরআন-হাদীছের বাইরে কিছু বলেন না। তাহলে আমরা বলব, এটাই তো তাকলীদ। যারা তাকলীদের প্রবক্তা, তারাও তো একথাই বলেন, আমাদের ইমামগণের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা ও সুধারণা রয়েছে যে, তারা কুরআন-হাদীছ বুঝেই সে অনুযায়ী বিধি-বিধান বলেছেন, কুরআন-হাদীছের খেলাপ কিছু বলেননি। যদি কখনও কোন বিষয়ে প্রমাণিত হয় যে, তাদের কোন বক্তব্য কুরআন-হাদীছ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বিরোধী হয়েছে, তাহলে অবশ্যই আমরা তা প্রত্যাখ্যান করব। দেখা গেল আহ্‌লে হাদীছের লোকজনকর্তৃক কোন আলেমকে মানা তথা তার তাকলীদ করার ক্ষেত্রে তাদের যে ব্যাখ্যা তাকলীদের ক্ষেত্রে তাকলীদের প্রবক্তাদেরও সেই একই ব্যাখ্যা। তাহলে তাকলীদের প্রবক্তারা তাকলীদ করলে দোষের হয়, তারা করলে দোষের হয় না কেন? তারা বহু লোকের তাকলীদ করে আর তাকলীদপন্থীরা একজনের তাকলীদ করে তাই কি দোষের, নাকি তারা ছোট খাট কোন আলেমের তাকলীদ করে আর তাকলীদপন্থীরা সর্বজন স্বীকৃত অনেক বড় মাপের আলেমের তাকলীদ করে তাই দোষের?

বস্তুত তাকলীদ সকলেই করে। আহলে হাদীছ ভাইয়েরা অসংখ্য আলেমের তাকলীদ করেন আর তাকলীদপন্থীগণ নির্দিষ্ট উচ্চমানের কতিপয় আলেমের তাকলীদ তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম শাফিয়ী, ইমাম মালেক ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের তাকলীদ করেন। তাকলীদপন্থীদের মধ্যে যারা আলেম তারাও তাকলীদ করেন এই ভেবে যে, এইসব ইমামের ইল্‌মের তুলনায় আমাদের ইল্‌ম কিছুই না, তাঁরা আমাদের চেয়ে অনেক বড় আলেম, তাই তাদেরকে আমাদের ইমাম মেনে চলা কর্তব্য। এভাবে আমরা সকলেই সর্বজনস্বীকৃত বড় আলেম বিধায় এই ইমামগণের তাকলীদ করে থাকি। আহ্‌লে হাদীছ ও অন্যান্য তাকলীদ-বিরোধী ভাইগণ এভাবে সামান্য একটু চিন্তা করলেই ইনশাআল্লাহ তাকলীদের প্রয়োজনের বিষয়টি তাদের মাথায় ঢুকবে। এটা এমন কোন জটিল বিষয় নয় যা মাথায় ঢোকাতে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর প্রয়োজন হবে।

তাকলীদের ক্ষেত্রে অনেকে একটা শব্দের কারণে বিভ্রান্ত হন। শব্দটি হল "মাযহাব"। যারা কোন ইমামের তাকলীদ করেন তারা বলেন, আমরা অমুক ইমামের মাযহাব মানি। এখানে মাযহাব অর্থ চলার পথ। অমুক ইমামের মাযহাব মানি অর্থ অমুক ইমাম (কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক) যেপথে চলেছেন আমরাও সেপথে চলি। মাযহাব শব্দটিকে এ অর্থে বুঝলে কোন বিভ্রান্তি আসার অবকাশ ছিল না। কিন্তু কিছু লোক এখানে মাযহাব শব্দটির অর্থ বুঝেছেন ধর্ম। তাই তারা ভাবছেন এক নবী, এক রসূল, এক কুরআন-হাদীছ, তাহলে এত মাযহাব তথা এত ধর্ম কেন? বস্তুত তারা ইমামদের মাযহাব অনুসরণ করা কথাটার মধ্যে "মাযহাব" শব্দটি কি অর্থে প্রয়োগ হয়েছে তা বুঝতে ভুল করেছেন, তাই বিভ্রান্ত হয়েছেন। আসলে এক ভুল বহু ভুল-ভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায়।

www.maktabatulabrar.com

যা মোটাকথা হওয়া সত্ত্বেও অনেকের মাথায় ঢোকে না, যার ফলে অনেক বিভ্রান্তি হয়– এরূপ আর একটা বিষয় হল পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণের বিষয়। এরূপ অন্ধ অনুকরণকারীরা বাপ-দাদারা করে আসছেন দোহাই দিয়ে প্রচলিত মীলাদ, কুলখানী, চেহলাম তথা চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী, ওরশ ইত্যাদি বেদআত ও রসম পালন করে আসছেন। বাপ-দাদা তথা পূর্বসূরীরা সহীহ ইল্‌ম (সঠিক জ্ঞান) ও হেদায়াতের অনুসারী হয়ে থাকলে এবং সে অনুযায়ী কিছু করে থাকলে সে ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু তারা যদি সহীহ ইলমের অধিকারী না হয়ে থাকেন, তারা যদি হেদায়েতপ্রাপ্ত না হয়ে থাকেন, ফলে তারা গলত ও বিভ্রান্তিমূলক কিছু করে গিয়ে থাকেন, তাহলেও তাদের অনুসরণ করতে হবে– এটা যে একটা মোটা ভুল তা তো সহজেই মাথায় ঢোকার কথা। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলেও সত্য এই মোটাকথাটাও আমাদের সমাজের অনেকের মাথায় ঢুকছে না। ফলে তারা বাপ-দাদা প্রমুখ পূর্বসূরীদের অনুসরণের দোহাই দিয়ে নানা রকম বেদআত কুসংস্কারের অনুসরণ করে পাপী হয়ে চলেছেন।

তাকলীদের বিষয় ও পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণের বিষয়সহ যে কয়টা বিষয় পূর্বে উল্লেখ করা হল সেগুলো মোটাবিষয় হওয়া সত্ত্বেও মাথায় ঢোকে না– এ তো গেল আম জনতার কথা। এগুলো মোটাবিষয় হওয়া সত্ত্বেও আম জনতার মাথায় তা ঢোকে না। এবার কিছু বিষয় উল্লেখ করব যা শুধু আম জনতার মাথায় নয় বড় বড় মাথাওয়ালাদের –যারা সমাজে বুদ্ধিজীবী বলে বিশেষভাবে পরিচিত তাদের– মাথায়ও ঢোকে না। যেমন:

শহীদ মিনারে ফুল অর্পনের অযৌক্তিকতাও একটা মোটাকথা, তবুও তা বুদ্ধিজীবীদের মাথায় ঢোকে না। শহীদ মিনারে ফুল অর্পন করার পশ্চাতে বুদ্ধিজীবীদের যুক্তি হল এতে করে ভাষার জন্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

প্রাণদানকারীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন হয়ে থাকে। কিন্তু এই যুক্তির পশ্চাতে কথা থেকে যায় এই যে, শহীদ মিনার বা এরূপ কোন স্মৃতিস্তম্ভে ফুল প্রদানের ক্ষেত্রে শ্রদ্ধা পাওয়ার ব্যক্তি রইল কোথায় আর ফুল দেয়া হল কোথায়? ব্যক্তি রইল একখানে, আর অন্যত্র ফুলের তোড়া অর্পন করে তার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মহড়া দেয়া হল- এটা অসংগতিমূলক হাস্যকর হয়ে যায় কি না তা কি একবারও ভেবে দেখা হয়েছে? ভাষা শহীদদের কবরের কাছে গিয়ে ফুল অর্পন করলেও অন্তত এই অসংগতির দায় কিছুটা হলেও হয়তো এড়ানো যেত। যদি কেউ বলতে চান, এখানে তাদের আত্মার উপস্থিতি কল্পনা করে ফুল অর্পন করা হয়ে থাকে, তাহলে বলা যেতে পারে প্রত্যেকে যার যার ঘরে তাদের আত্মার উপস্থিতি কল্পনা করে নিজ নিজ ঘরেই ফুলের মাল্য ঝুলিয়ে রাখতে পারেন, তাতে উদ্দেশ্যও সিদ্ধি হবে, নিজের ঘরের শোভা বর্দ্ধনও ঘটবে, আবার এত মূল্যবান ফুলের তোড়াগুলো অরণ্যে নিবেদন হওয়া থেকেও রক্ষা পাবে।

এ ব্যাপারে শেষ কথা হল– আমাদের তো এমন কিছু করা উচিত, যাতে জাতীয় ভাষার জন্য প্রাণ বিসর্জনকারীদের বিদেহী আত্মার উপকার সাধিত হয়। কিন্তু স্মৃতিস্তম্ভে ফুল ছড়ালে তাদের আত্মার কী উপকার সাধিত হবে বলে বুদ্ধিজীবীরা মনে করেন তা জানি না। এর কোনো সুব্যাখ্যা তারা দিতে পারবেন না তা প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায়। যদি তা-ই হয়, এতে তাদের কোনো উপকার সাধিত না হয়, তাহলে কি এভাবে তাদের আত্মত্যাগকে অবমূল্যায়িত করা হবে না?

মৃত্যুর পর কোন আত্মার উপকার সাধনের একটি মাত্র পথ আছে। তা হল তাদের উদ্দেশে কোন নেক কাজ করে ঈছালে ছওয়াব করা। এভাবে তাদের উপকার করলেই হবে তাদের মূল্যায়ন এবং সত্যিকার অর্থে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। এ ছাড়া আর যা কিছুই করে মনে করা হবে তাদের আত্মার উপকার করা হল, সেটা হবে অলিক ও অবাস্তবসম্মত কল্পনা। সেটা হবে নিতান্তই অবান্তর কর্ম। বরং বলা যায় খোদা না করুন তাদের যদি কোন আযাব হতে থাকে, আর তাদের উপকারের নামে বা তাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে আমরা এই ফুল

www.maktabatulabrar.com

ছড়াতে থাকি, তাহলে তা হবে তাদের আত্মার সাথে এক ধরনের উৎকট রসিকতা। ভাষা শহীদদের উদ্দেশে ফুল অর্পনকে তাই একটা অবান্তর ও উৎকট রসিকতা কর্ম বলে আখ্যা দিলে কি তা খণ্ডন করার কোন পথ আছে? দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথেই বলা যায় নেই।

শুধু উপরোক্ত বিষয়টাই নয়। মৃতের আত্মার জন্য কিছু করার আরও বেশ কিছু পদ্ধতি আমাদের অনেকে অনুসরণ করে চলেছেন, যার অসারতা দিবালোকের মত স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবীসহ অনেকের মাথায় তা ঢোকে না। যেমন: মৃতের আত্মার উদ্দেশ্যে কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকা তথা নীরবতা পালন করা, কারও প্রতি শোক প্রকাশার্থে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা, কাল পতাকা উত্তোলন করা ইত্যাদি। বুদ্ধিজীবীগণ এগুলোর করণীয়তা গুরুত্বের সাথেই বয়ান করে থাকেন। কিন্তু এগুলোর কোনটার দ্বারাই যে মৃতের আদৌ কোনো উপকার হয় না, তা মোটাকথা হলেও বুদ্ধিজীবীদের মাথায় তা ঢোকে না। একটা গল্প মনে পড়ে গেল। এক ঠাকুরজী তার সাঙ্গাতকে জিজ্ঞাসা করল কি হে, এবার মৃত বাবার আত্মার জন্য কি কি করলে? সাঙ্গাত উত্তর দিল, "এবার বাবার জন্য তেমন কিছু করতে পারিনি, মাত্র দশ হাজার বেলপাতা ঘিতে ভেজে জলে ছেড়ে দিয়েছি।" বা! বা!! বা!!! কতই না কাজের কাজ (?) করেছে!

এই নীরবতা পালন, জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করণ, কাল পতাকা প্রদর্শন ইত্যাদির পশ্চাতে যুক্তি হিসাবে হয়তো কেউ বলতে পারেন, আমরা তাদের মৃত্যুতে শোকাহত, এমনকি শোকে বেদনায় আমাদের বাক পর্যন্ত লোপ পেয়েছে– তা প্রকাশের জন্য নীরবতা প্রদর্শন করা হয়। আর তাদের মৃত্যুতে জাতি ভেঙ্গে পড়েছে তা প্রকাশের জন্য জাতীয় সত্তার প্রতীক জাতীয় পতাকাকে নত দেখানো হয়ে থাকে। আর কাল রং হল শোকের প্রতীক, তাই কালো রংয়ের পতাকা প্রদর্শন হয়ে থাকে তাদের প্রতি শোক প্রকাশার্থে। এ ব্যাখ্যাগুলো স্থূল দৃষ্টিতে একেবারে অযুৎসই মনে হয় না। কিন্তু কারও মৃত্যু-শোকে প্রকৃতই কেউ মুহ্যমান হয়ে গেলে সে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়তে পারে, শোকে সে নীরব

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নিথর হয়ে পড়তে পারে– এমনটা তো মাঝে মধ্যে হয়ে থাকে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কেউ ঐ রকম শোকাহত না হওয়া সত্ত্বেও যদি সে বাকরুদ্ধতা প্রকাশ করে, তাহলে সেটাকে শোক প্রকাশ বলা হবে, না কি শোকের অভিনয় বলা হবে, না কি সেটা বালখিল্যতা আখ্যা পাবে, তা একটু পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে বৈকি। শোকের অভিনয় বা বালখিল্যতা দ্বারা কারও প্রতি শ্রদ্ধা নয় বরং তার সাথে উপহাস প্রদর্শনই হয়ে থাকে।

আর জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত করণের মাধ্যমে শোক প্রকাশ– এ ক্ষেত্রে বিষয়টা এভাবে বিবেচনা করাও কি অযৌক্তিক যে, কারও মৃত্যুতে জাতির সদস্যগণ শোকাহত হতে পারে, কিন্তু জাতির সত্তা তাতে নত হতে পারে না, জাতির স্বাধীনতা তাতে খর্ব হতে পারে না। জাতীয় পতাকাকে যদি জাতিসত্তার স্বতন্ত্র পরিচয়ের প্রতীক মনে করা হয়, এটাকে যদি জাতির স্বাধীনতার প্রতীক মনে করা হয়, তাহলে কোন ব্যক্তির মৃত্যুতে জাতীয় পতাকাকে নমিত করলে জাতির সত্তাকে খর্ব করে দেখানো হয় কি না তা কি পুনর্বিবেচনা করে দেখা যায় না? তদুপরি কোন জাতীয় ব্যক্তিত্বের মৃত্যুকে জাতীয় শোকে নয় বরং জাতীয় শক্তিতে পরিণত করার দৃষ্টিভংগিতে এক্ষেত্রে জাতীয় পতাকাকে নমিত না করে বরং সেটির মাথা আরও উঁচু করে শক্তি প্রদর্শন করলেই তো যুক্তিসংগত হতে পারত।

রইল কারও মৃত্যুতে কালো রংয়ের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে শোক প্রকাশের নীতি। এ সম্পর্কে কেউ যদি বলে, কালো রংকে যেমন শোকের প্রতীক মনে করা হয়, তেমনি অশুভ সংকেতও মনে করা হয়ে থাকে। যাত্রাকালে কালো হাড়ি বা কালো কলসি দেখলে অনেকেই সেটাকে অশুভ সংকেত হিসাবে বিবেচনা করে থাকে। ঘনঘটা করে আচ্ছন্ন হয়ে আসা কালো মেঘকে অশনি সংকেত মনে করা হয়। আবার প্রেয়সীর মেঘকালো চুল প্রেমকে উদ্বেলিত করে থাকে। রাতের জমকালো আঁধার গা-ছমছম-করা ভীতির সঞ্চার করে থাকে। এভাবে কালো রং বিপরীতমুখী বিভিন্ন চেতনার প্রতীক হিসাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় কারও মৃত্যুতে কালো রংয়ের যে পতাকা উত্তোলন করা

www.maktabatulabrar.com

হবে, সেটাকে কিসের সংকেত বা কোন্ ধরনের চেতনা উদ্রেককারী হিসাবে গ্রহণ করা হবে?

যদিও ইসলামের দৃষ্টিতে কোন রং বা কোন কিছুকে কুলক্ষণ হিসাবে দেখা হয় না। কোনো কিছুকে কুলক্ষণ হিসাবে মূল্যায়ন করার নীতি ইসলামে স্বীকৃত নয়। কিন্তু এ জাতীয় ক্ষেত্রকে সাধারণত কেউ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করেন না। এসব ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভংগিকে কয়জনই বা কেয়ার করে থাকেন। তাহলে তো স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করা, দিবস পালন করা– কোনটারই অবকাশ থাকবে না।

চূড়ান্ত কথা হল, হয় সত্যিকার মুসলমান হিসাবে ইসলামী স্পিরিট নিয়ে সবকিছু বিচার-বিবেচনা করা চাই। কিংবা অন্তত বুদ্ধি-বিবেচনা সম্পন্ন মানুষ হিসাবে সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃত যুক্তি দিয়ে সবকিছুর কর্মপদ্ধতি ও নীতি নির্ধারণ করা চাই। এ দুটোর বাইরে যা কিছু করা হয় তাকে কী আখ্যা দেয়া যায় বলুন তো?

যা মোটাকথা তবুও মাথায় ঢোকে না– এর তালিকা অনেক দীর্ঘ। বর্ষবরণ তথা পুরাতন বর্ষকে বিদায় জানানো ও নতুন বর্ষকে স্বাগত জানানো উপলক্ষে পটকা ফোটানো ইত্যাদির অসারতা এই তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। বর্ষের কি জ্ঞান-বুদ্ধি আছে যে, সে বিদায় জ্ঞাপন ও স্বাগত জানানোকে উপলব্ধি করে আপ্লুত হবে?

যা মোটাকথা তবুও মাথায় ঢোকে না– এর আর একটা ছেলেমিমূলক চর্চা দেখলাম বিগত ২০১৪ সালে। মুক্তিযুদ্ধকালীন যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে ঢাকার শাহবাগে জড় হওয়া কিছু লোক (যারা শাহবাগী নামে খ্যাত হয়েছেন।) বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যারা শহীদ হয়েছিলেন সেই শহীদদের উদ্দেশে পত্র লিখে সেই পত্রগুলোর সাথে গ্যাস বেলুন লাগিয়ে ছেড়ে দিলেন। বেলুনগুলো আকাশের দিকে উড়তে উড়তে এক সময় চোখের আড়ালে চলে গেল। ব্যস পত্রগুলো শহীদদের কাছে পৌঁছে গেল (?)। এমন ছেলেমিপনাকেও আমাদের দেশের কথিত বুদ্ধিজীবীরা বাহবা জানাতে কসুর করলেন না। শহীদদের কবরের মধ্যে পত্রগুলো গুঁজে দিলেও না হয় স্থূল অর্থে বলা যেত, তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এখানে যে পত্রগুলো হাওয়ায় মিলে গেল তা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তো সাদা চোখেই দেখা গেল। অথচ সেই মোটাকথাটুকুও শাহবাগী আর তাদের অন্ধ সমর্থক বুদ্ধিজীবীদের মাথায় ঢুকল না।

আমাদের সমাজে এরকম আরও বহু জিনিস রয়েছে, যা নিতান্তই মোটাবিষয় কিংবা মোটাকথা, তবুও তা অনেকের মাথায় ঢোকে না। ফলে তাদের মধ্যে সঠিক চেতনা জাগ্রত হয় না, ভুল চেতনায় পরিচালিত হতে থাকে তারা। উদাহরণ স্বরূপ এখানে কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করা হল। আল্লাহ আমাদের চিন্তা-চেতনাকে দোরস্ত করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

"যা মোটাকথা, তবুও অনেকের মাথায় ঢোকে না" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- মারেফতী লাইনে গেলে নামায, রোযা করা লাগে না– এটা যে বিভ্রান্তিকর তা একটা মোটা বিষয়।
- মন ঠিক হয়ে গেলে ইবাদত করা লাগে না– এটা যে বিভ্রান্তিকর তা একটা মোটা বিষয়।
- সাধারণ মানুষের জন্য তাকলীদের প্রয়োজন একটা মোটাকথা।
- পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুকরণ গ্রহণযোগ্য না হওয়ার বিষয় একটা মোটাকথা। প্রচলিত মীলাদ, কুলখানী, চেহলাম তথা চল্লিশা, মৃত্যুবার্ষিকী, ওরশ ইত্যাদি পূর্ব পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ থেকেই হয়ে থাকে।
- শহীদ মিনারে ফুল অর্পনের অযৌক্তিকতাও একটা মোটাকথা।
- মৃতের আত্মার উদ্দেশে কিছুক্ষণ থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকা তথা নীরবতা পালনের অসারতা একটা মোটাকথা।
- মৃতের আত্মার উদ্দেশে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা ও কাল পতাকা উত্তোলন করার অসারতাও একটা মোটাকথা।
- বর্ষবরণ তথা পুরাতন বর্ষকে বিদায় জানানো ও নতুন বর্ষকে স্বাগত জানানো উপলক্ষে পটকা ফোটানো ইত্যাদির অসারতা একটা মোটাকথা।

www.maktabatulabrar.com

- মৃতদের উদ্দেশ্যে পত্র লিখে সেই পত্রগুলোর সাথে গ্যাস বেলুন লাগিয়ে ছেড়ে দেয়ার অসারতাও একটা মোটাকথা।

বহু চিন্তা-ভাবনা করেও যেসব বিষয়ের কুল-কিনারা করা যায় না

মানুষ অনেক কিছুই বুঝার চেষ্টা করে। বুঝার জন্য চিন্তা-ভাবনা করে। চিন্তা-ভাবনা করার ফলে অনেক কিছু মানুষের বুঝে আসেও। তাই চিন্তা-ভাবনা একটা উপকারী জিনিস, চিন্তা-ভাবনা একটা ভাল বিষয়। এটা ভাল এজন্য যে, এর দ্বারা অনেক অ-বুঝা বিষয় বুঝে আসে, অনেক অজানা বিষয় জানা হয়, অনেক বিষয়ের কুল-কিনারা করা যায়। অতএব যদি কোন চিন্তা-ভাবনা এমন হয়, যা দ্বারা কিছুই বুঝে আসবে না, যা দ্বারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কোনই কুল-কিনারা করা যাবে না, তাহলে সে চিন্তা-ভাবনা বর্জনীয়। বস্তুত আমাদের সামনে এমন অনেক বিষয় রয়েছে বহু চিন্তা-ভাবনা করেও যার কোনো কুল-কিনারা করা যায় না। শরীয়ত তাই সেসব ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করতে নিষেধ করেছে। যেমন:

আল্লাহর সত্তার বিষয় নিয়ে ভেবে কুল কিনারা করা যায় না

বহু চিন্তা-ভাবনা করেও যেসব বিষয়ের কোনো কুল-কিনারা করা যায় না, তার মধ্যে একটা বিষয় হল আল্লাহর সত্তার বিষয়। অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তার প্রকৃত স্বরূপ কি, তাঁর সত্তা কত বড়, তাঁর সত্তা কোথায় অবস্থানরত ইত্যাদি।

আল্লাহর সত্তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কোনো কুল-কিনারা করা যায় না। কারণ আল্লাহর সত্তা অসীম, অথচ মানুষের ব্রেন হল সসীম। আর সসীম ব্রেনে অসীম জিনিসকে ঢোকানো সম্ভব নয়। সমুদ্রের পানি অসীম নয়, তারপরও যদি কেউ হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ছোট্ট শিশির মধ্যে গোটা সমুদ্রের পানি ঢোকাতে চায় তাহলে তাকে বোকা ছাড়া আর কি আখ্যা দেয়া হবে? কেউ যদি ওরকম শিশি দিয়ে সমুদ্রের পানি মাপতে শুরু করে তাহলেও তাকে বোকা ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেয়া হবে না। তাহলে কেউ সসীম ব্রেণ দিয়ে অসীম সত্তাকে মাপতে চাইলে তাকে কেন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

বোকা আখ্যা দেয়া হবে না? বস্তুত আল্লাহর সত্তার প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন মানুষের ধারণ-ক্ষমতার বাইরের জিনিস। তাই আল্লাহ তাঁর অসীম সত্তা ও গুণাবলী নিয়ে বিদ্যমান– এতটুকু বিশ্বাস করার পর তাঁর সত্তা নিয়ে আর বেশি ঘাটাঘাটি করা থেকে বিরত থাকা চাই। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকেও এরূপ বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন,

تفَكَّرُوا فِي كُلّ شَيْء وَلَا تفكَّرُوا فِي ذَات اللّه. (تهذيب سنن أبي داود قال الحافظ في الفتح : موقوف وسنده جيد. وقال السخاوي : هذه الأحاديث أسانيدها كلها ضعيفة لكن اجتماعها يكسب قوة.)

অর্থাৎ, "তোমরা সবকিছু নিয়ে ভাবতে পারো, তবে আল্লাহর সত্তা নিয়ে ভেবো না।" হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকেও কাছাকাছি এরূপ বক্তব্য বর্ণিত আছে। (তাহযীবে সুনানে আবূ দাউদ)

আল্লাহর সত্তা নিয়ে ভাবনার মধ্যে একটা বিষয় হল তিনি কোথায় আছেন– এ নিয়ে ভাবনা। এ বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কোনো কুল-কিনারা করা যাবে না। যদি বলা হয়, তিনি আমাদের উপরে আছেন, বা বলা হয় তিনি আরশে আছেন, আর আরশ হচ্ছে আসমানের উপরে অর্থাৎ আমাদের উপরে, তাহলে প্রশ্ন হবে আমাদের উপরে বলতে কাদের উপরে? এশিয়াবাসীদের উপরে হলে তো আমেরিকাবাসীদের নিচে হয়ে যায়, আমেরিকাবাসীদের উপরে হলে তো এশিয়াবাসীদের নিচে হয়ে যায়? যদি সবার উপরে মানা হয়, তাহলে তো আল্লাহর সত্তাকে এমন গোল মানতে হয় যার মাঝে খোল আছে। তাহলে বিষয়টা কেমন বিদঘুটে হয়ে দাঁড়ায়! তিনি গোল বা লম্বা বা চওড়া কিংবা স্কয়ার– এমনতর কোন ধারণা তাঁর (আল্লাহর) ব্যাপারে রাখা যাবে না। কারণ তিনি সৃষ্টির কোনো কিছুর মত নন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ.﴾

অর্থাৎ, কোনো কিছুই তাঁর মত নয়। (সূরা শূরা: ১১)

যদি বলা হয়, আল্লাহ আসমানে আছেন তাহলেও প্রশ্ন হবে আসমানে কোন্ বরাবর আছেন? আমাদের উপর বরাবর না কি আমাদের নিচ বরাবর? এখানেও ঐই বিদঘুটে ব্যাপার এসে দাঁড়াবে।

www.maktabatulabrar.com

এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ আসমানে আছেন বা আরশে আছেন– কুরআন-হাদীছে এরকম অনেক ভাষ্য রয়েছে, যার ভিত্তিতে পূর্বসূরীদের অনেকে বলেছেন, আল্লাহ আসমানে আছেন বা আরশে আছেন। তবে মনে রাখতে হবে তাদের কথার দ্বারা এ উদ্দেশ্য নয় যে, তিনি স্বশরীরে আসমানে বা আরশে আছেন। আল্লাহ স্বশরীরে আসমানে আছেন বা স্বশরীরে আরশে আছেন– এমন ব্যাখ্যা করেও স্পষ্টতভাবে কেউ বলেননি। এবং সেভাবে বললে সমস্যাও রয়েছে। তা হল– আল্লাহ স্বশরীরে আসমানে বা আরশে আছেন বললে কোন মাখলূক (সৃষ্টিজীব) যেমন নির্দিষ্ট স্থানে থাকে তিনিও তেমন একটা নির্দিষ্ট স্থানে আছেন বলা হয়ে যায়। অথচ আল্লাহ তাআলাকে কোন নির্দিষ্ট স্থানে আছেন মানলে তাঁকে গণ্ডিবদ্ধ সত্তা মানা হয়ে যায়। আর আল্লাহ তাআলাকে কোন স্থানে গণ্ডিবদ্ধ মানা যায় না। তাঁর সত্তা অসীম। বিদ্যমান সকল স্থান আল্লাহর সত্তার চেয়ে ছোট ও ক্ষুদ্র। আসমান জমিনের মালিক আল্লাহর সত্তা সবকিছুর চেয়ে বড়, তিনি কীভাবে তাঁর ক্ষুদ্র সৃষ্টির মাঝে সামাই হবেন? আমাদের কারও হাতে একটা সরিষার দানা যত ক্ষুদ্র আসমান- জমিন আল্লাহর কুদরতী হাতে তার চেয়েও ক্ষুদ্র। অতএব কোন লোকের হাতে যদি সরিষার একটা দানা থাকে তাহলে কি এটা সম্ভব যে, সেই লোকটা সেই সরিষার দানার মধ্যে বা তার কোন অংশ বিশেষের মধ্যে ঢুকতে পারে? না তা কক্ষণও পারে না। কেননা সেটা তার চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ। যখন এটা জানা গেল তখন এটাও জানা গেল যে, আসমান-জমিনের মালিক সবকিছুর চেয়ে বড় ও মহান।

বস্তুত এসব কারণে আল্লাহ স্বশরীরে আসমানে আছেন বা স্বশরীরে আরশে আছেন– এভাবে বলা থেকে বিরত থাকা চাই। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত দলীল-প্রমাণ সহকারে আমার রচিত "পরিশিষ্ট: ইসলামী আকীদা ও বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থে "আল্লাহ কোথায়?" শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে।

আল্লাহর সত্তা সংক্রান্ত আরও যেসব বিষয় বুঝা আমাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে তার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ কীকরে হলেন, তাঁর আগে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কে? একই সঙ্গে তিনি সবদিকে অভিমুখী থাকেন কীকরে? তিনি নির্দিষ্ট কোন স্থানে না থেকেও সর্বত্র বিরাজমান থাকেন কীকরে? ইত্যাদি। এসব বিষয় চুলচেরা করে বুঝা আমাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। কিছু দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝার কাছাকাছি পৌঁছার চেষ্টা করা যেতে পারে। একবার নাস্তিক গোছের কয়েকজন লোক হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কে কিছু কুট প্রশ্ন করেছিল। তার মধ্যে কয়েকটা প্রশ্ন ও ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কর্তৃক প্রদত্ত সেগুলোর উত্তর শুনুন। একটা প্রশ্ন ছিল আল্লাহর আগে কে? কেউ তার আগে না থাকলে তিনি এলেন কোত্থেকে? এর উত্তরে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছিলেন, ২, ৩, ৪, ইত্যাদি সংখ্যার পূর্বের সংখ্যা আছে, ১-এর আগে কোন্ সংখ্যা? তারা বলেছিল, ১-এর আগে কোন সংখ্যা থাকে না। হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছিলেন, তদ্রূপ আল্লাহও এক, তাঁর পূর্বে কেউ নেই। আর একটা প্রশ্ন ছিল– আল্লাহ একই সঙ্গে সবদিকে অভিমুখী থাকেন কীকরে? এর উত্তরে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছিলেন, যখন বাতি জ্বালানো হয়, তখন তার আলোর মুখ কোন্ দিকে থাকে? তারা বলেছিল, আলোর মুখ তো সবদিকে থাকে। তখন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছিলেন, আলোর মুখ যদি সবদিকে থাকতে পারে তাহলে আল্লাহর মুখ কেন সবদিকে থাকতে পারবে না? আর একটা প্রশ্ন ছিল– আল্লাহ নির্দিষ্ট কোন স্থানে না থেকেও সর্বত্র বিরাজমান থাকেন কীকরে? এর উত্তরে হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছিলেন, দুধের মধ্যে ঘী কোথায় থাকে? নির্দিষ্ট কোন স্থান থাকে কি? তারা বলেছিল, ঘী দুধের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকে। তখন হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেছিলেন, আল্লাহর সামান্য এক সৃষ্টি ঘীর পক্ষে যদি দুধের সর্বত্র বিরাজমান থাকা সম্ভব হয় তাহলে আল্লাহর পক্ষে কেন তাঁর সৃষ্টির সর্বত্র বিরাজমান থাকা সম্ভব হবে না? (তবে এখানে উল্লেখ্য যে, আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান– এ কথাটার অর্থ হল তিনি জ্ঞানগত ও কুদরতগতভাবে সর্বত্র বিরাজমান। এ সম্বন্ধেও আমার রচিত

www.maktabatulabrar.com

"পরিশিষ্ট: ইসলামী আকীদা ও বিভিন্ন ভ্রান্ত মতবাদ" গ্রন্থে "আল্লাহ কোথায়?" শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ইমাম আবূ হানীফা রহ. ঘী-র উদাহরণ টেনেছেন সম্ভবত বিরোধীদের প্রশ্নের অ্যাঙ্গেলে জবাব দেয়ার জন্য।)

তাকদীর নিয়ে ভেবে কুল-কিনারা করা যায় না

বহু চিন্তা-ভাবনা করেও যেসব বিষয়ের কোনো কুল-কিনারা করা যায় না, তার মধ্যে আর একটা বিষয় হল তাকদীরের বিষয়। তাকদীর হচ্ছে আল্লাহর এক মহা পরিকল্পনা, এক অনাদি অনন্ত পরিকল্পনা। আর মানুষের সসীম ব্রেণ দিয়ে অনাদি অনন্ত কোন বিষয় আয়ত্ব করা সম্ভব নয়। তাকদীরের বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা ঘাটাঘাটি করা যাবে, অনেক প্রশ্ন ও উত্তর চালাচালি করা যাবে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর রহস্য অনুদঘাটিতই থেকে যাবে, শেষ পর্যন্ত প্যাঁচ থেকেই যাবে, যা ছাড়ানো সম্ভব হবে না। যেমন: কেউ প্রশ্ন করল, যা নির্ধারিত আছে তা হবেই, তাহলে আমলের জন্য চেষ্টা-তদবীর করার প্রয়োজনটা রইল কোথায়? আর পাপ করলেই বা শাস্তি হবে কেন, সবই তো নির্ধারিত, যার ব্যতিক্রম করার সাধ্য আমাদের নেই? যখন ভাল-মন্দ কোন্টা হবে তা নির্ধারিত আছে তখন আমার ভাল-র জন্য চেষ্টা করার দরকার কী? আপনি বলবেন, অনেক বিষয়ের তাকদীর এভাবে লেখা আছে যে, চেষ্টা করলে এক রকম হবে চেষ্টা না করলে অন্য রকম হবে। তাই আপনাকে চেষ্টা করতে হবে। সে বলবে, আমি চেষ্টা করব কি না তা-ও তো লেখা আছে, তাহলে চেষ্টার জন্য আমার মাথা ব্যাথার দরকার কী? আপনি বলবেন, চেষ্টা কর চেষ্টা করলে হবে, চেষ্টা করা তোমার দায়িত্ব তাই তোমাকে চেষ্টা করতে হবে। সে বলবে, আমার দ্বারা চেষ্টা হবে কি না তা-ও তো নির্ধারিত আছে, আর যা নির্ধারিত আছে তা-ই হবে, অতএব আমার দ্বারা চেষ্টার প্রয়োজন কী রইল? আপনি বলবেন, তুমি চেষ্টা করার ইচ্ছাটুকু অন্তত কর, তুমি ইচ্ছা করছ কি না আল্লাহ এতটুকু দেখবেন। সে বলবে, আমার দ্বারা ইচ্ছা হবে কি না তা-ও তো আল্লাহ নির্ধারিত করে রেখেছেন। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর চাওয়া ছাড়া তোমরা চাইতেও পারবে না।

(সূরা দাহ্‌র: ৩০)

এভাবে প্রশ্ন ও তার উত্তর চলতে থাকবে, প্রশ্নকারীকে নিবৃত্ত করা সম্ভব হবে না। বিষয়টার খোলাসা হবে না। তাকদীর নিয়ে আলোচনা করে কোন ফয়সালায় উপনীত হওয়া সম্ভব হবে না। আমাদের উস্তাদ দারুল উলূম দেওবন্দের স্বনামধন্য মুহাদ্দিছ শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপূরী (দামাত বারাকাতুহুম) এক দরসে তাকদীর প্রসঙ্গে আলোচনাকালে বলেছিলেন, তাকদীর সম্বন্ধে আলোচনা করে কোনো ফয়সালায় উপনীত হওয়া যায় না। এ ব্যাপারে ফয়সালা এই যে, "কোনো ফয়সালা নেই"।

বস্তুত এ সম্বন্ধে আলোচনার খোলাসা করা সম্ভব নয়। সবকিছু নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের এতসব কিছুর দায়িত্ব, এর মধ্যে কী রহস্য, চূড়ান্ত পরিণতি নির্ধারিত থাকা আবার দায়িত্বও থাকা– এ দু'টোর মাঝে সমন্বয় হয় কীভাবে তা বুঝা আমাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। তাই তাকদীর নিয়ে ঘাটাঘাটি করা নিষেধ। তাকদীর কী, তাকদীর সম্বন্ধে কী আকীদা রাখতে হয়, এতটুকু জানা বুঝার জন্য যা দরকার তার চেয়ে বেশি তাকদীর নিয়ে চর্চা ও ঘাটাঘাটি করা ঠিক নয়। এটা ঠিক নয় দুই কারণে।

১. এটা বুঝা আমাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। অতএব এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করে কোনো কূল-কিনারা করা যাবে না। এক ব্যক্তি হযরত আলী (রা.) কে তাকদীর সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন,

طريق مظلم لا تسلكه، وأعاد السؤال فقال: **بحر عميق لا تلجه**، وأعاد السؤال فقال: **سر الله قد خفي عليك فلا تفتشه**. (تحفة الأحوذي للمباركفوري وفيض القدير للمناوي)

অর্থাৎ, এটা এক অন্ধাকারাচ্ছন্ন পথ; এ পথে চলো না। লোকটি আবার প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, এটা এক গভীর সমুদ্র; এতে ডুব দিয়ো না। লোকটি আবার প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন, এটা আল্লাহর

www.maktabatulabrar.com

এক গোপন রহস্য –যা তোমার কাছে অস্পষ্ট– অতএব এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করো না।

২. তাকদীর নিয়ে বেশি চর্চা ঘাটাঘাটি নিষিদ্ধ হওয়ার আর একটা কারণ হল এটা নিয়ে চর্চা ঘাটাঘাটি করলে হয় তাকদীরকে অস্বীকার করার মাধ্যমে কাদ্‌রিয়া (তাকদীরকে অস্বীকারকারী এক ভ্রান্ত দল) হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, কিংবা জাবরিয়া হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। (জাবরিয়া হল এমন এক ভ্রান্ত দল যারা বলত, বান্দা নিতান্তই অক্ষম, তার কিছুই করার নেই।) এই দুই কারণে তাকদীর নিয়ে বেশি ঘাটাঘাটি করা ঠিক নয়। করলে ভ্রান্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এভাবে তাকদীর নিয়ে আলোচনা ধ্বংস ডেকে আনে। এ কারণেই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকদীর নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে দেখলে রাগান্বিত হয়ে উঠতেন। ইবনে মাজা শরীফে বর্ণিত এক সহীহ হাদীছে এসেছে,

خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب فقال : «**بِهٰذَا أُمِرْتُمْ أَوْ لِهَذَا خُلِقْتُمْ تَضْرِبُوْنَ الْقُرْآنَ بَعْضَه بِبَعْضٍ بِهذَا هَلَكَتِ الْأَمَمُ قَبْلَكُمْ**». (في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات)

অর্থাৎ, একদিন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (হুজরা শরীফ থেকে) বের হয়ে তাঁর সাহাবীদের কাছে এলেন, যখন তারা তাকদীর নিয়ে কথা কাটাকাটিতে লিপ্ত ছিলেন। (কেউ তাকদীরের কোন বিষয়ের পক্ষে কোন আয়াত পেশ করছিলেন, আবার কেউ তার বাহ্যত বিপক্ষের কোন আয়াত পেশ করছিলেন। এ শুনে তিনি এমন রাগান্বিত হলেন) যেন তার চেহারায় ডালিমের রস নিংড়ে দেয়া হচ্ছে। তিনি বললেন, তোমাদেরকে এর নির্দেশ দেয়া হয়েছে? না কি তোমাদেরকে এর জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে? তোমরা কুরআনের এক অংশ দিয়ে অন্য অংশের উপর আঘাত করছ! এরই কারণে তোমাদের পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে।

যাহোক তাকদীর সম্বন্ধে এতক্ষণের আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল, তাকদীর এমন এক বিষয় যা নিয়ে বহু চিন্তা-ভাবনা করেও তার

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কোনো কুল-কিনারা করা যায় না। তাই এ বিষয়টা নিয়ে বেশি চর্চা ও ঘাটাঘাটি না করাই শ্রেয়।

জান্নাতের নেয়ামত ও জাহান্নামের আযাবের প্রকৃত স্বরূপ নিয়ে ভেবে কুল- কিনারা করা যায় না

বহু চিন্তা-ভাবনা করেও যেসব বিষয়ের কোনো কুল-কিনারা করা যায় না, তার মধ্যে আর একটা বিষয় হল জান্নাতের নেয়ামতসমূহের স্বরূপ, তদ্রূপ জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতা। জান্নাতের নেয়ামতসমূহের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা, সেগুলোর সৌন্দর্য, চমৎকারিত্ব ও মাহাত্মের যথাযথ পরিমাপ করা মানুষের ধারণ ক্ষমতার বাইরে। যেমন একটা বিষয় উল্লেখ করা যায়। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, জান্নাতের তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হবে। তাফসীরে বায়যাবীতে হযরত মাছরূক (রহ.) থেকে এ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে,

أنهار الجنة تجري في غير أخدود.

অর্থাৎ, "জান্নাতের নহরসমূহ কোন গর্ত বা নিচ জায়গা ছাড়াই চলবে।" এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কোন গর্ত বা নিচ জায়গা ছাড়া পানি চলার বিষয়টা বোধগম্য নয়। অন্য এক আয়াতে এসেছে,

﴿لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ.﴾

অর্থাৎ, "যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে এমনসব কক্ষ যেগুলোর উপরেও থাকবে কক্ষ। সেগুলোর তলদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত থাকবে।" (সূরা যুমার: ২০) এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে জালালাইনে বলা হয়েছে,

أيْ مِنْ تَحْتِ الْغُرَفِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ.

অর্থাৎ, "উপরস্থ তলার কক্ষসমূহের তলদেশ দিয়েও নহর প্রবাহিত থাকবে, নিম্নস্থ তলার কক্ষসমূহের তলদেশ দিয়েও নহর প্রবাহিত থাকবে।"

www.maktabatulabrar.com

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, নিম্নস্থ তলার কক্ষসমূহের তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হওয়ার বিষয়টা বোধগম্য হলেও উপরস্থ তলার কক্ষসমূহের তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হওয়ার বিষয়টা বোধগম্য নয়। এমনিভাবে কোন গর্ত বা নিচ জায়গা ছাড়াই পানি চলার বিষয়টাও বোধগম্য নয়। কারণ তাহলে নহরসমূহের ঝুলন্ত থাকতে হয় যা বোধগম্য নয়। এখানে অবশ্য এরূপ বলার অবকাশ আছে যে, জান্নাতে যদি দুনিয়ার মত নিম্ন আকর্ষণ না থাকে, বরং মধ্যাকর্ষণ থাকে, তাহলে কোন জিনিস নিচের দিকে আকৃষ্ট হবে না, বরং যে জিনিস যেখানে রাখা হবে সেখানেই থাকবে, তাহলে জান্নাতের উপরস্থ তলার কক্ষসমূহের তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হওয়া এবং কোন গর্ত বা নিচ জায়গা ছাড়াই নহরসমূহের চলতে পারার বিষয়টা বোধগম্যতার পর্যায়ে আসে। কিন্তু জান্নাতে কি নিম্ন আকর্ষণ থাকবে, না ঊর্ধ আকর্ষণ, না মধ্য আকর্ষণ তার কোনটাই আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়, নিশ্চিত নয়। তাই জান্নাতের নেয়ামতসমূহের যে অল্প-বিস্তর বর্ণনা পাওয়া যায় তার অনেক কিছুই পরিপূর্ণভাবে অনুধাবন করা আমাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে।

জান্নাতের নেয়ামতসমূহের প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করা, সেগুলোর সৌন্দর্য, চমৎকারিত্ব ও মাহাত্মের যথাযথ পরিমাপ করা যে মানুষের ধারণ ক্ষমতার বাইরে এক হাদীছে কুদছীতে এ সম্পর্কিত বর্ণনা এভাবে এসেছে,

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «قال الله عز وجل : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل : ﴿فَلاَ تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ.﴾» (متفق عليه)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য (জান্নাতে) এমন সবকিছু তৈরি করে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

রেখেছি যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি, কোনো মানুষের অন্তরে তার ধারণাও আসেনি। (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,) এ বিষয়ে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতেও (সূরা আলিফ লাম মীম সাজদা: ১৭) সমর্থন পাওয়া যায়। ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَآءً بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ অর্থাৎ, লোকেরা জানে না, তাদের আমলের প্রতিদান স্বরূপ তাদের জন্য পর্দার অন্তরালে কীসব শান্তির উপকরণ রেখে দেয়া হয়েছে। (বোখারী ও মুসলিম)

"বহু চিন্তা-ভাবনা করেও যেসব বিষয়ের কোনো কুল-কিনারা করা যায় না" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- আল্লাহর সত্তার প্রকৃত স্বরূপ কী– তিনি কীভাবে হলেন, তিনি কিসের তৈরি ইত্যাদি নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। কারণ এসবের কোনো কুল-কিনারা করা যাবে না।
- আল্লাহর সত্তা স্বশরীরে কোথায় অবস্থিত তা নিয়ে ভাবনায় লিপ্ত হওয়া যাবে না। কারণ তার কোনো কুল-কিনারা করা যাবে না।
- তাকদীরে সবকিছু নির্ধারিত আছে, যা নির্ধারিত আছে তা হবেই, তাহলে আমলের জন্য চেষ্টা-তদবীর করার প্রয়োজনটা রইল কোথায়, আর পাপ করলেই বা শাস্তি হবে কেন, সবই তো নির্ধারিত তার ব্যতিক্রম করার সাধ্য আমাদের নেই– এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনায় লিপ্ত হওয়া যাবে না।
- জান্নাতের নেয়ামতসমূহের প্রকৃত স্বরূপ কি তা নিয়ে চুল-চেরা বিশ্লেষণে লিপ্ত হওয়া যাবে না, কারণ তার কোন কুল-কিনারা করা যাবে না। তদ্রূপ জাহান্নামের শাস্তির ভয়াবহতাও এমন যা পূরোপুরি বুঝা আমাদের ধারণ ক্ষমতার বাইরে।

যা নিয়ে ভাবা উচিত কিন্তু ভাবা হয় না

মৃত্যু তথা পরকাল নিয়ে ভাবা উচিত

মৃত্যু তথা পরকাল নিয়ে ভাবনা মানুষকে আখেরাতমুখী চিন্তায় মগ্ন করে তোলে, গাফলতকে দূর করে আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে তোলে।

www.maktabatulabrar.com

কারণ মৃত্যুর স্মরণ দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ হ্রাস করে দেয়, দুনিয়ার স্বাদ কর্তন করে দেয়। আর যখন দুনিয়ার আকর্ষণ কমে যায় তখন আখেরাতের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এজন্যই হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ» يعني الموت (رواه الترمذي برقم ٢٣٠٧ وقال : هذا حديث حسن غريب.)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, স্বাদ কর্তনকারী মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর। (তিরমিযী: হাদীছ নং ২৩০৭)

নিজের দোষ-ক্রটি নিয়ে ভাবা উচিত

আমরা অন্যের দোষ-ক্রটি নিয়ে ভাবতে বেশি অভ্যস্ত। অথচ নিজের দোষ-ক্রটি নিয়েই ভাবা উচিত। নিজের দোষ-ক্রটি না দেখে শুধু অন্যের দোষ-ক্রটি দেখলে নিজেকে বড় মনে হয়, অন্যকে তুচ্ছ মনে হয়। এভাবে নিজের মধ্যে অহংকার আসে। যেহেতু অন্যকে তুচ্ছ জানা এবং অহংকার করা দুটোই নিষিদ্ধ, তাই যে কারণে এ দুটো তৈরি হয় সেটাও নিষিদ্ধ। তদুপরি নিজের দোষ-ক্রটি না দেখায় নিজেকে ইসলাহ করার চিন্তা জাগ্রত হয় না, তাই নিজের ইসলাহের প্রয়োজনে নিজের দোষক্রটি দেখা চাই। এসব কারণে শরীয়ত বলেছে অন্যের ভালটা বেশি দেখ আর নিজের দোষগুলো বেশি দেখ। যদি কেউ মুরব্বী বা মুসলিহ হয়ে থাকেন তাহলে তিনি অধীনস্থদের দোষ-ক্রটি দেখবেন ইসলাহের নিয়তে। কিন্তু সেখানেও অধীনস্থদের তুচ্ছ জ্ঞান করবেন না, নিজেকে ভাল ভেবে অহংবোধের শিকার হয়ে পড়বেন না। অন্যের দোষ সন্ধান ও অন্যের দোষচর্চার ব্যাপারে হাদীছে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা এসেছে। বোখারী শরীফের একটি দীর্ঘ হাদীছের একাংশে এসেছে– নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا»

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, তোমরা অন্যের দোষচর্চা করো না, অন্যের দোষ সন্ধান করো না। (বোখারী: হাদীছ নং ৬০৬৪)

ঈমান-আমলের উন্নতি নিয়ে ভাবা উচিত

আমরা অনেকেই ঈমান-আমলের গুরুত্ব উপলব্ধি করে থাকি এবং সে মোতাবেক ঈমান-আমলের চর্চাও করে থাকি, কিন্তু সময় পার হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঈমান-আমলের উন্নতি হচেছ না অবনতি হচ্ছে তা নিয়ে তেমন ভাবি না। ফলে দেখা যায় দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে, বছরের পর বছর পার হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঈমান আমলের চর্চায় সেই আগের স্থানেই পড়ে থাকছি, কিংবা নিজের অজান্তে হয়তো পূর্বের স্থান থেকেও পিছে চলে যাচ্ছি। এজন্য নিজের আমলের হিসাব আগে নিতে বলা হয়েছে। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আউছ (রা.) বর্ণনা করেন– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. (رواه الترمذي برقم ٢٤٥٩

وقال : هذا حديث حسن)

অর্থাৎ, বুদ্ধিমান সে-ই যে নিজের হিসাব নেয় এবং মৃত্যুপরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে। (তিরমিযী: হাদীছ নং ২৪৫৯) ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন, এখানে হিসাব নেয়ার অর্থ হচ্ছে পরকালের হিসাবের পূর্বে নিজের হিসাব নিজে নেয়া। যেমন হযরত ওমর (রা.) তাঁর খুতবায় বলতেন,

حاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا وَزِنُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُوزَنُوا وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الأَكْبَرِ. (رواه الترمذي تحت الحديث السابق وابن أبي شيبة برقم ٣٥٦٠٠)

অর্থাৎ, তোমাদের হিসাব নেয়ার পূর্বে তোমরা নিজেরা নিজেদের হিসাব নাও, তোমাদের ওজন নেয়ার পূর্বে নিজেরা নিজেদের ওজন নাও। এবং মহাবিচারের জন্য সজ্জিত হয়ে নাও। (তিরমিযী ও মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীছ নং ৩৫৬০০)

এসব হাদীছের আলোকে বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, প্রত্যেকের উচিত প্রতিদিন একটা সময় নিজের ঈমান-আমলের হিসাব নেয়া। এই

www.maktabatulabrar.com

হিসাব নেয়াকে বলা হয় "মুহাছাবা"। হিসাব নেয়ার পর কোন ত্রুটি পেলে সামনে আর সেই ত্রুটি না করার জন্য মনের সঙ্গে শর্ত করে নেয়া তথা মনে মনে প্রতিজ্ঞা নেয়া। এই শর্ত করা বা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করাকে বলা হয় "মুশারতা"। আর প্রতিজ্ঞা গ্রহণের পর সারাদিন পদে পদে খেয়াল রাখা আবার সেই ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে না তো। এভাবে সযত্ন খেয়াল রাখাকে বলা হয় "মুরাকাবা"। সারকথা, প্রতেক্যেরই উচিত মুহাছাবা, মুশারতা ও মুরাকাবা–র অভ্যাস গড়ে তোলা।

শুধু নিজেকে নিয়ে নয় অন্যকে নিয়েও ভাবা উচিত

ইসলাম আমাদেরকে এই শিক্ষা দেয়নি যে, আমরা শুধু নিজেদেরকে নিয়েই ভাবব। বরং এই শিক্ষা দিয়েছে যে, নিজেকে নিয়েও যেমন ভাবব সকলকে নিয়েও সেভাবে ভাবব। মানুষের মধ্যে একজনের প্রতি আরেকজনের সৌজন্যবোধ থাকবে, একজনের প্রতি আরেকজনের সহানুভূতি থাকবে, একজনের সাথে আরেকজনের ভালবাসা থাকবে। একজনের সাথে আরেকজনের কথা-বার্তা, আচার-ব্যবহার সবকিছুর মধ্যে ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে হবে। সবকিছুর মধ্যে সহানুভূতি ফুটে উঠতে হবে। সহানুভূতি অর্থ হল একই রকম অনুভুতি, অর্থাৎ, আমি আমার নিজের ব্যাপারে যেমন অনুভূতি রাখি, অন্য সকলের ব্যাপারেও তেমন অনুভূতি রাখব, নিজের স্বার্থ নিয়ে যেমন ভাবব, সকলের স্বার্থ নিয়েও তেমনি ভাবব, নিজের উন্নতি, নিজের মঙ্গল ও নিজের মুক্তি নিয়ে যেমন ভাবব সকলের উন্নতি, সকলের মঙ্গল ও সকলের মুক্তি নিয়েও তেমনি ভাবব। আমি শুধু আমার জন্য নই, আমি আমার জন্যও সকলের জন্যও। সকলের মধ্যে এরূপ পারস্পরিক ঐক্যবোধ গড়ে তোলার জন্যই এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– « **الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنِ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ** ». (رواه مسلم برقم ٢٥٨٦)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, হযরত নুমান ইবনে বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সমস্ত মুসলমান একটা মানুষের অর্থাৎ, একটা দেহের মত। চোখে ব্যাথা হলে সারা দেহ সে ব্যাথা টের পায়, মাথায় ব্যথা হলে সারা দেহ সে ব্যথা টের পায়। (মুসলিম: হাদীছ নং ৬৭৫৪) এভাবে সমস্ত মুসলমান একটা দেহের মত- একজনের সুখে-দুঃখে আরেকজন শরীক থাকবে, একজনের সুখে আরেকজন সুখী হবে একজনের ব্যথায় আরেকজন ব্যথীত হবে। সহানুভুতি সৃষ্টির জন্য এর চেয়ে ভাল অভিব্যক্তি আর কী হতে পারে?

"যা নিয়ে ভাবা উচিত কিন্তু ভাবা হয় না" শিরোনামে যা কিছু আলোচনা করা হল তার সারকথা হচ্ছে–

- মৃত্যু তথা পরকাল নিয়ে ভাবা উচিত।
- নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে ভাবা উচিত।
- ঈমান-আমলের উন্নতি নিয়ে ভাবা উচিত।
- শুধু নিজেকে নিয়ে নয় অন্যকে নিয়েও ভাবা উচিত।

যা নিয়ে ভাবা উচিত নয় কিন্তু অনেক ভাবা হয়

পূর্বের পরিচ্ছেদে যা নিয়ে ভাবা উচিত কিন্তু ভাবা হয় না– এরকম কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এবার তার বিপরীত যা নিয়ে ভাবা উচিত নয় কিন্তু অনেক ভাবা হয়– এরকম কিছু বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

চিন্তা-ভাবনা ভাল জিনিস যদি তা হয় কোন ভাল বা উচিত বিষয় নিয়ে। পক্ষান্তরে সেই চিন্তা-ভাবনা ভাল নয় যা হয় কোন মন্দ বা অনুচিত বিষয় নিয়ে। তাই চিন্তার বিষয় নিয়েও চিন্তা করে নিতে হবে তা নিয়ে চিন্তা করা ঠিক হবে কি না। ভাবনার বিষয় নিয়েও ভাবতে হবে তা নিয়ে ভাবা ঠিক হবে কি না। আমাদের জীবনে এমন অনেক বিষয় আছে যা নিয়ে ভাবা উচিত নয় অথচ আমরা অনেকে সে বিষয়গুলো নিয়ে ভেবে থাকি, শুধু ভাবি না, অনেক ভেবে থাকি। এ প্রসঙ্গে আমার রচিত "যদি জীবন গড়তে চান" বই থেকে কিছু লেখা তুলে ধরছি।

www.maktabatulabrar.com

অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে খুব ভাবা উচিত নয়

অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে খুব ভাবা উচিত নয়, কিন্তু এ নিয়ে আমরা অনেকেই খুব ভেবে থাকি। ভবিষ্যত নিয়েও খুব ভাবা উচিত নয়। আজ নিয়ে তেমন ভাবা হয় না, কাল নিয়ে খুব ভাবা হয়। অতীত নিয়ে ভেবে কী হবে? অতীত কখনই আর ফিরে আসবে না। দুনিয়ার জিন-ইনসান সকলে মিলে চেষ্টা করলেও অতীতকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। মাতা-পিতা মরে গেছেন, তাদের জন্য দুঃখ দুশ্চিন্তা অনেক করা হলেও তারা আর দুনিয়ায় ফিরে আসেননি। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু গাছপালা ঘরবাড়ি সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, তা নিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসে অনেক কান্নাকাটি হয়েছে, কিন্তু সেই গাছপালা ঘরবাড়ি আর পুনঃস্থাপিত হয়নি। অতীতে কোন এক সময় আপনার ব্যবসায় লোকসান হয়েছিল, তা নিয়ে আপনি অনেক দুশ্চিন্তা করেছেন, তাতে কি আপনার ব্যবসার সেই ক্ষতি লাভে পরিণত হয়েছে? আপনার সন্তান কখনও পরীক্ষায় ফেল করেছিল, তা নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করেছেন, তাতে কি সেই ফেল পাসে পরিবর্তিত হয়েছে? অতএব অতীতকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বাদ দিন। হযরত সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ তাছতুরী (রহ.) বলেছেন,

أمس قد مات، واليوم في النزع، وغدا لم يولد. (قيمة الزمن عند العلماء)

অর্থাৎ, গতকাল তো মরে গেছে, আজকের তো মরার উপক্রম হয়েছে, আর আগামীকালের তো জন্মই হয়নি।

বস্তুত দুশ্চিন্তা টেনশন কখনই অতীতকে সংশোধন করতে পারবে না। দুশ্চিন্তা টেনশন দ্বারা অতীত ঠিক হয়ে যায় না। দুশ্চিন্তা টেনশন দ্বারা অতীত তো ঠিক হয়ই না বরং তাতে বর্তমান এবং ভবিষ্যতও নষ্ট হয়। এরূপ দুশ্চিন্তা-টেনশন বর্তমান ও ভবিষ্যতের সময় নষ্ট করে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চেষ্টা-সাধনার স্পৃহা নষ্ট করে। এভাবে আপনার ক্ষতি আরও বৃদ্ধি করে। তাই অতীতের ফাইল নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করবেন না। সামনে এগিয়ে চলুন, সামনের কথা ভাবুন। অতীতের কোন পাপ থাকলে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। আর অতীতের ভুল-ত্রুটি থেকে কোন শিক্ষা নেয়ার থাকলে সেই শিক্ষা নিয়ে সামনে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এগিয়ে চলুন। সামনে এগিয়ে চলাই জীবন জগতের সবকিছুর চিরাচরিত রীতি। সেটাই প্রকৃতিসম্মত নীতি। বাতাস পিছনের দিকে নয় সামনের দিকে ধেয়ে চলে। পানি পিছনের দিকে নয় সামনের দিকে বয়ে চলে। কাফেলা পিছনের দিকে নয় সামনের দিকে এগিয়ে চলে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুই সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এটাই সৃষ্টির স্বাভাবিক রীতি। এটাই প্রকৃতিসম্মত রীতি।

অতীতে কোন কিছু নিয়ে হাজার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি? চেষ্টা ছাড়বেন না। হাল ছেড়ে দিবেন না। হতাশ হয়ে পড়বেন না। কুরআনে কারীমের বাণী স্মরণে রাখবেন-

﴿لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ.﴾

"তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না।" (সূরা যুমার: ৫৩)

ইসলামে হতাশার স্থান নেই। প্রকৃতির কোন কিছুর মাঝেও হতাশা নেই। একটা পিঁপড়া তার আহার সংগ্রহের জন্য একটা গাছে হয়তো শতবার ওঠার চেষ্টা করে, পড়ে যায় আবার ওঠার চেষ্টা করে, আবার পড়ে যায় আবার ওঠার চেষ্টা করে। সে হাল ছেড়ে দেয় না, চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয় না। অবশেষে এক সময় সে তার চেষ্টায় সফল হয়। চেষ্টা করুন এক সময় আপনি সফল হবেন নিশ্চয়ই। যার জন্য আল্লাহ যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন তখনই তা হবে। চেষ্টা করতে থাকুন, নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর সফলতা আসবে। বন্ধ তালা খোলা হয় নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর। বন্দী মুক্তি পায় নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর। দূরবর্তী নিকটে আসে নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর। অনুপস্থিত এসে উপস্থিত হয় নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর। তাই চেষ্টা করতে থাকুন, নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর সফলতা আসবে। আর বহু চেষ্টার পরও যদি আপনার কাংখিত জিনিস না পান তাতেও ব্যর্থতা বোধ করবেন না। আপনার চেষ্টার পিছনে যদি কোন সদুদ্দেশ্য থাকে, তাহলে অন্তত ভাল কিছুর জন্য আপনার চেষ্টা নিবেদিত হয়েছে- এর পুরস্কার তো আপনি অবশ্যই পাবেন। অতএব সার্বিকভাবে আপনি ব্যর্থ- এমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই।

www.maktabatulabrar.com

ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা নিয়ে ভাবার দরকার নেই

এতক্ষণ অতীত নিয়ে ভেবে লাভ নেই- এর বর্ণনা দেয়া হল। এবার ভবিষ্যত নিয়েও তেমন ভাবার দরকার নেই- এ সম্বন্ধে কিছু কথা শুনুন। আপনি ভাববেন ভবিষ্যতে যদি অভাব দেখা দেয় তখন কী হবে! যদি কোন দিন চাকরিটা না থাকে তাহলে কী হবে! যদি কোন দিন অমুক রোগ হয় তখন কী হবে! যদি কোন দিন এমন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে কী হবে! স্ত্রী ভাবে যদি কোন দিন স্বামী মারা যায় তাহলে কী হবে! স্বামী ভাবে যদি কোন দিন স্ত্রী মারা যায় তাহলে এই সন্তানাদি নিয়ে আমার কী দশা হবে! এভাবে ভবিষ্যতের কোন বিষয় নিয়ে অনাকাংখিত ভাবনা থেকে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় টেনশন। অতএব ভবিষ্যত নিয়ে এমনতর ভাবনার দরকার নেই। ভবিষ্যত নিয়ে এত বেশি ভাববেন না। ভবিষ্যতের সংক্ষিপ্ত প্লান-প্রোগ্রাম থাকতে পারে তা নিষেধ নয়। ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত কিছু প্রস্তুতি রাখাও নিষেধ নয়। তবে ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করবেন না, দুশ্চিন্তা তো মোটেই না। মনে রাখবেন ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা করা এক রকম আল্লাহর প্রতি কুধারণা রাখা। আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখুন। বান্দা আল্লাহর প্রতি যেমন ধারণা রাখে আল্লাহ তার সঙ্গে তেমনই করেন। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ الحديث. (رواه البخاري ٧٤٠٥ ومسلم ٢٦٧٥)

অর্থাৎ, (আল্লাহ বলেন,) বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে আমি তার সঙ্গে তেমন-ই মুআমালা করি।

(বোখারী: হাদীছ নং ৭৪০৫ ও মুসলিম: হাদীছ নং ২৬৭৫)

এ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখলে আল্লাহ ভালই করবেন। অতএব আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা রাখুন। তিনি আপনার সঙ্গে থাকলে কার থেকে ভয়? আর তিনি আপনার সঙ্গে না থাকলে কার থেকে আশা? অতএব ভবিষ্যত নিয়ে এত বেশি ভাববেন না। যখন ভবিষ্যত আসবে তখন ভবিষ্যত নিয়ে খুব ভাববেন, এখন নয়। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা সময় হলেই দেখতে পাবেন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তখন যা করার করবেন। সময়ের আগেই গর্ভপাত করে তা দেখতে চাওয়া কেন? অনাগত ভবিষ্যতের বিপদ-আপদের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা টেনশনকে আগাম দাওয়াত দিয়ে ঘরে আনা কোন্ বুদ্ধিমানের কাজ? মনে রাখতে হবে ভবিষ্যত একটা অনিশ্চিত বিষয়। আজকের সূর্য দেখতে পাচ্ছি আগামীকালের সূর্য দেখতে পাব কি না তা অনিশ্চিত। সকাল পেয়েছি, বিকাল পাব কি না তা অনিশ্চিত। আজকের দিন পেয়েছি আগামীকালের দিন পাব কি না তা অনিশ্চিত। অতএব অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় নিশ্চিত বর্তমানকে নষ্ট করা বোকামী হবে বৈ কি।

জীবনকে শুধু আজকের মধ্যে এবং শুধু এই মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবতে শিখুন। আমরা যদি আজকের দিনকেই জীবনের শেষ দিন ভাবতে শিখি, তাহলে জীবনের সবকিছুই সুন্দর হবে। তাহলে আজকের নামায হবে জীবনের শেষ নামাযের উপলব্ধিতে। তাতে কতইনা সুন্দর নামায হবে। আজকের তেলাওয়াত হবে জীবনের শেষ তেলাওয়াতের উপলব্ধিতে। তাতে কতইনা সুন্দর তেলাওয়াত হবে। এভাবে ইবাদত-বন্দেগী, চেষ্টা-সাধনা, আচার-ব্যবহার সবকিছুই হবে সুন্দর। কারণ মনের মধ্যে থাকবে এটাই হচ্ছে এ ক্ষেত্রে আমার জীবনের শেষ করা। এর চেয়ে এটা সুন্দরভাবে করার সুযোগ আর হয়তো পাব না।

পাখীর মত জীবন-পদ্ধতি অবলম্বন করুন। পাখী সকালে বাসা থেকে বেরিয়ে যায়, জীবিকা আহরণ করে, বিকালের চিন্তায় মগ্ন হয় না। আবার বিকালে বেরিয়ে যায়, জীবিকা আহরণ করে, পরবর্তী সকালের জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে না। কারও থেকে আশাও করে না, কারও উপর ভরসা করে বসেও থাকে না। সামান্য মাথা গোঁজার মত একটু ছায়া পেলেই তৃপ্ত, সামান্য জীবন-স্পন্দন নিয়েই ক্ষান্ত। কত সুন্দর হাদীছের এই বর্ণনা-

عن عمر بن الخطاب رضـ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : **لَوْ أَنَّكُمْ كنتم تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُو**

خِمَاصاً وَتَرُوحُ بِطَاناً. (رواه الترمذي في أبواب الزهد باب ما جاء في الزهادة في الدنيا ٢٣٤٤ وقال : حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্র প্রতি যথাযথ তাওয়াক্কুল কর, তাহলে তোমাদেরকে রিযিক দান করা হবে, যেরূপ পাখীকে রিয্ক দেয়া হয়– তারা ভোর বেলায় খালি পেটে বের হয়, দিনের শেষে ভরা পেটে (বাসায়) ফিরে আসে। (তিরমিযী: হাদীছ নং ২৩৪৪)

ঈমান-বিরোধী ভাবনা উচিত নয়

"যা নিয়ে ভাবা উচিত নয় কিন্তু অনেক ভাবা হয়"– এরকম বিষয় রয়েছে অনেক। ঈমান-বিরোধী যেকোনো রকম ভাবনা এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। যেমন: আল্লাহ কি আসলেই আছেন? জান্নাত-জাহান্নাম আসলেই আছে কি? সত্যিই কি কবরের আযাব বলে কিছু আছে? ফেরেশতা বলে কোন মাখলূক আসলেই আছে কি? জিন শয়তান যাদের কথা কুরআন-হাদীছে আছে আসলেই কি তারা আছে? এরকম ঈমান-বিরোধী যত চিন্তা মনে জাগতে পারে তা সবই নিষিদ্ধ চিন্তার অন্তর্ভুক্ত। শয়তানই ঈমান নষ্ট করার জন্য মানুষের মনে এ জাতীয় চিন্তার উদ্রেক ঘটায়। মনের মধ্যে এরূপ চিন্তা অল্পবিস্তর অনুরণিত হলেও ঈমানের কিছু না কিছু ক্ষতি সাধিত হয়। তাই মুসলিম শরীফের হাদীছে এসেছে, এরূপ ঈমান-বিরোধী চিন্তা মনে জাগ্রত হলে তখন ৩টা কাজ করতে হয়।

১. শয়তানকে তাড়ানোর জন্য "আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রজীম" পড়ে নিতে হয়।
২. "আমান্তু বিল্লাহ" (আমি ঈমান আনলাম) বলে ঈমান নবায়ন করে নিতে হয়।
৩. এই চিন্তা বাদ দিয়ে অন্য চিন্তায় লিপ্ত হতে হয়।

উল্লেখ্য, ঈমান-বিরোধী চিন্তা বা ওয়াছওয়াছা মনে এলে সেইসব

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ওয়াছওয়াছার প্রতিকার কীভাবে করতে হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য আমার লেখা "নফ্‌ছ ও শয়তানের মোকাবেলা" শীর্ষক গ্রন্থটি পাঠ করতে পারেন। ইনশাআল্লাহ বহু উপকার হবে।

কারও ক্ষতি বা পাপের চিন্তা উচিত নয়

"যা নিয়ে ভাবা উচিত নয় কিন্তু অনেক ভাবা হয়"– এরকম বিষয়ের মধ্যে আরও রয়েছে– কারও ক্ষতি করার চিন্তা-চেতনা, যেকোনো পাপের চিন্তা, হিংসা-বিদ্বেষ পরশ্রীকাতরতা, অহংকার প্রভৃতি চেতনা– এসব কিছুই নিষিদ্ধ চিন্তা-চেতনার অন্তর্ভুক্ত।

"যা নিয়ে ভাবা উচিত নয় কিন্তু অনেক ভাবা হয়" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে খুব ভাববেন না।
- ভবিষ্যত নিয়েও খুব ভাববেন না।
- ঈমান-বিরোধী কোন বিষয় নিয়ে ভাববেন না।
- কারও ক্ষতি করা নিয়ে ভাববেন না।
- কোনো পাপের চিন্তাকে মনে স্থান দিবেন না।
- হিংসা-বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, অহংকার প্রভৃতি চেতনাকে মনে স্থান দিবেন না।

যা আগেভাগেই জেনে নেয়া হয় না, বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়

মানুষের জীবনে সঠিক বুঝ ও সঠিক চেতনা এবং যথাসময়ে বুঝ ও যথাসময়ে চেতনা এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোনো বিষয়ে যথাসময়ে চেতনা জাগ্রত হলেই এবং বুঝ হলেই মানুষ সে কাজ করে বা তা থেকে বিরত থাকে। ভাল বুঝলে তা করে আর মন্দ বুঝলে তা থেকে বিরত থাকে। এই বুঝ যদি সঠিক হয় এবং যথাসময়ে সেই বুঝসঞ্জাত চেতনা অর্জন হয়, তাহলে সে সঠিক কাজটি সময়মত করতে পারে কিংবা মন্দ কাজ থেকে যথাসময়ে বিরত হতে পারে। কিন্তু বুঝ যদি হয় ভুল তাহলে সে বুঝ দ্বারা মানুষ ভাল কিছু অর্জন করতে পারে না। কিংবা যদি বুঝ বা

www.maktabatulabrar.com

বুঝসঞ্জাত চেতনা অর্জিত হয় সময় পার হয়ে যাওয়ার পর, তাহলে সে বুঝ সঠিক হলেও তা কাজে লাগাতে পারে না। তখন অতীতে করা দরকার ছিল কিন্তু সঠিক বুঝ না থাকায় করা হয়নি– এমন কাজের কথা স্মরণ করে শুধু আফসোসই এসে থাকে। কিংবা যা থেকে বিরত থাকার দরকার ছিল সঠিক বুঝ না থাকার কারণে সে কাজ হয়ে গেছে বিধায় শুধু মনস্তাপে ক্লিষ্ট হওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না। বস্তুত আমাদের জীবনে এমন অনেক কিছু আছে যা বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়। তাই যথাসময়ে সঠিক বুঝ অর্জন হোক– এজন্য সচেতন থাকা চাই। এর জন্য আল্লাহর কাছে দুআও করা চাই। জীবনকে সুন্দর করার এবং জীবনকে অসুন্দর থেকে বাঁচানোর জন্য এ এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

আমাদের জীবনে অনেক ক্ষেত্রেই এমন হয়, একসময় হয়তো সঠিক বুঝ আসে কিন্তু তা এমন সময় যে, ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট কাজের সময় পার হয়ে গেছে। এরকম কয়েকটা বিষয়ে আলোচনা পেশ করছি। উদ্দেশ্য– যাদের এখনও সেসব ব্যাপারে সময় পার হয়ে যায়নি তারা যেন সচেতন হতে পারেন, সময় পার হয়ে যাওয়ার আগেই যেন সঠিক পদক্ষেপটি নিতে পারেন।

জীবনের অনেক বিষয় এমন আছে যা করতে করতে শেখা হয়ে যায় এবং সেগুলো আগে শিখে না নিলেও চলে। আবার এমনও অনেক বিষয় রয়েছে যেগুলো করতে করতে শিখলে চলে না, ফিল্ডে নামার আগেই জেনে নিতে হয়, শিখে নিতে হয়। চলতে চলতেও শেখা হয়ে যায় তবে তাতে অনেক খেসারত দিতে হয়। পক্ষান্তরে আগে থেকে শিখে নিলে অনেক খেসারত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

ছাত্র জীবনের গুরুত্ব

ছাত্র জীবনের গুরুত্ব এমন একটা বিষয় যা আগেভাগেই জেনে নেয়া হয় না, বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়। অনেকেরই ছাত্র জীবন হেলায় হারিয়ে যায়। লেখাপড়া, চারিত্রিক ও একাডেমিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের এই মোক্ষম সময় খেল-তামাশায় পার হয়ে যায়। লেখাপড়া ও বিদ্যায় যে যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন কাম্য ছিল তা সুদূরপরাহত থেকে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যায়। তার পর যখন কর্মজীবনে অবতরণ করে যোগ্যতার অভাবে পদে পদে হোঁচট খায়, বঞ্চিত হয়, লাঞ্ছিত হয়, তখন ছাত্র জীবনকে খেল-তামাশায় পার করে দেয়ার জন্য অনুশোচনা জাগে। তখন মনে অনুতপ্ততা আসে কেন ছাত্রজীবনে নিজেকে পড়াশোনায় অগ্রসর করলাম না, কেন লেখাপড়ায় মনোযোগ দিলাম না, কেন ভালভাবে লেখাপড়া করলাম না। তখন বুঝতে পারে ছাত্র জীবনের সময় কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কিন্তু সময় পার হয়ে যাওয়ার পরের এই বুঝ তার অনুতপ্ততা বৃদ্ধি করা ছাড়া আর তেমন কোন কাজে আসে না। কত ভাল হত যদি তা বুঝে আসত সময় পার হওয়ার আগেই। কত ভাল হত যদি আগেভাগেই এটা নিয়ে চিন্তা করা হত।

যৌবনের গুরুত্ব

যৌবনের গুরুত্বও এমন একটা বিষয় যা আগেভাগেই জেনে নেয়া হয় না, বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়। আমাদের অনেকেরই যৌবনের কদর ও গুরুত্ব বুঝে আসে যৌবন পার হয়ে যাওয়ার পর। যখন বার্ধক্যজনিত কোমর-ব্যথা শুরু হয়, যখন গিরায় গিরায় পেনশনের সুর বেজে ওঠে, যখন শরীরের তাকত কমে আসে, কর্মস্পৃহা হ্রাস পায়, চিন্তা-শক্তি স্পৃহা হারায়, দৈহিক শক্তি নেতিয়ে পড়ে, তখন যৌবনের কদর ও গুরুত্ব বুঝে আসে। তখন মনে হয় হায়রে ইবাদত-বন্দেগী, দ্বীনী কাজকর্ম কিছুই তো যথাযথভাবে করার শক্তি অবশিষ্ট নেই। এমনকি দুনিয়ার কাজ-কর্ম করার স্পৃহাও অক্ষুণ্ন নেই। কোনো কিছু করার ক্ষমতাই তো আর আগের মত নেই। তখন বুঝে আসে এবং নিজের কৃতকর্মের জন্য মনে মনে অনুতাপ জাগে, কেন যৌবনের উচ্ছলতাকে জীবন গড়ার সঠিক কাজে ব্যয় করিনি, কেন যৌবনের দৈহিক- আত্মিক শক্তিকে হেলায় খেলায় খুইয়ে বসেছি। কিন্তু এই বুঝ তখন আর তেমন উপকারে আসে না, কারণ ইতিমধ্যে সময় পার হয়ে গেছে। যৌবনও আর ফিরে আসবে না, যৌবনের দৈহিক আত্মিক সেই উচ্ছলতা, উদ্যম ও স্পৃহাও আর ফিরে আসবে না। কত ভাল হত যদি যৌবনের কদর বুঝে আসত সময় পার হয়ে যাওয়ার আগেই। কত ভাল হত যদি আগেভাগেই এটা নিয়ে চিন্তা করা হত।

www.maktabatulabrar.com

যৌবনে ইবাদত-বন্দেগীর মর্যাদা বেশি। বোখারী শরীফের এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ ... وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ ....

এই দীর্ঘ হাদীছের সংক্ষেপ কথা হল, কেয়ামতের দিন –যে দিন প্রচণ্ড গরম হবে এবং কোন ছায়ার ব্যবস্থা থাকবে না সেদিন– সাত ব্যক্তি আরশের তলে ছায়া লাভ করবে। সেই সাত জনের একজন হচ্ছে ঐ যুবক যে তার যৌবনকালেই ইবাদত-বন্দেগীতে রত হয়। (বোখারী: হাদীছ নং ৬৬০)

স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করার কলা-কৌশল

স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করার কলা-কৌশলও এমন একটি বিষয় যা আগেভাগেই জেনে নেয়া হয় না, বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়। বয়স্ক নারী পুরুষদের প্রায় সবারই দাম্পত্য জীবন গড়ার পালা আসে। এই দাম্পত্য জীবন গড়ার প্রথম পর্ব হচ্ছে পুরুষ হলে তার কোন নারী তথা স্ত্রী নির্বাচন, আর নারী হলে তার কোন পুরুষ তথা স্বামী নির্বাচন। নিজের স্ত্রী হিসেবে কেমন নারী নির্বাচন করা সংগত এবং নিজের স্বামী হিসেবে কেমন পুরুষ নির্বাচন করা সংগত এ বিষয়টিও এমন যা বুঝতে বুঝতে সময় পার হয়ে যায়। সাধারণত পুরুষরা কোন নারীর রূপ-লাবণ্য দেখে বা বিশেষ কোন কিছু দেখে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করে থাকে। অনেক নারীও সাময়িক কোন আবেগে পড়ে হুট করে কোন পুরুষের সঙ্গে সংসার গড়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। পরে তারা বুঝতে পারে ঐ নারীর সঙ্গে বা ঐ পুরুষের সঙ্গে বংশ, গোত্র, সামাজিক অবস্থান, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদির পার্থক্যের কারণে মন-মেজাযের মিল হচ্ছে না, চাহিদা রুচির মিল হচ্ছে না, চিন্তা-চেতনা ও ধ্যান-ধারণার মিল হচ্ছে না, তখন উপলব্ধিতে আসে বিয়ের আগে এসব বিষয় ভাববার প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এতদিনে পানি বহুদূর গড়িয়ে গেছে, এখন আর সংশোধনের পথ নেই। সাধারণত অনেক পুরুষ নারীই যৌবনের তাড়নায় যখন বিয়ের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

জন্য উদগ্র হয়ে ওঠে, তখন ঠাণ্ডা মাথায় এসব বিষয় ভাববার মত অবস্থা থাকে না। তখন সাময়িক আবেগকে সামনে রেখেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। আজকাল তো ফেসবুক-টুইটারে সামান্য যোগাযোগ হলেই পরস্পরে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে। পরে যখন মোহভঙ্গ হয়, যখন বাস্তবতার সম্মুখীন হয়, তখন বুঝতে পারে তাদের সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। বিয়ের বিষয়ে সমঝদার মুরব্বীদের নেতৃত্ব মেনে নিয়ে অগ্রসর হলে সেই মুরব্বীগণ ঠাণ্ডা মাথায় এসব বিষয়ে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। তারা তাদের দীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। ফলে তাদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অগ্রসর হলে এ জাতীয় সমস্যার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। কিন্তু তা করা হয় না। সে সময়ে এই বুঝ থাকেও না।

তাই বিয়ে-শাদির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে যথাসময়ে বুঝুন, সময় পার হওয়ার পূর্বেই বুঝুন। পাত্রী বা পাত্র নির্বাচনের নিয়ম-নীতি ও কলা-কৌশল জেনে নিন। (আমার রচিত "ফিকহুন নিছা" গ্রন্থে পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের নিয়ম-নীতি ও কলা-কৌশল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা দেখে নিতে পারেন।) এসব বিষয় না জেনে না বুঝে হুট করে সিদ্ধান্ত নিলে হয়তো পরে পস্তাতে হবে। বিশেষভাবে বিয়ে-শাদির বিষয়ে সমঝদার মুরব্বীদের সহযোগিতা নিন, তাদের হাতে এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত ছেড়ে দিন, তাহলে হয়তো অনেকটা রক্ষা পাবেন।

দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর করার কলা-কৌশল

এতক্ষণ দাম্পত্য জীবন গড়ার জন্য স্বামী ও স্ত্রী নির্বাচন করার কৌশল নিয়ে কিছু কথা আলোচনা করা হল। স্বামী-স্ত্রী নির্বাচন করার পর দাম্পত্য জীবন গড়ার পালা। এই দাম্পত্য জীবনকে সুন্দর করার কলা-কৌশল বুঝতেও দীর্ঘ সময় ও দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। এটিও এমন একটি বিষয় যা আগেভাগেই জেনে নেয়া হয় না, বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়। একজন স্ত্রী দীর্ঘদিন পর বহু ঘাত-প্রতিঘাত পার হওয়ার পর বুঝতে পারে স্বামীর সংগে কীভাবে জীবন কাটালে স্বামীর মনস্তুষ্টি সম্ভব। কীভাবে স্বামীর সংগে চললে নির্বিঘ্নে সংসার জীবনের

www.maktabatulabrar.com

সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব। অনুরূপ একজন স্বামীও দীর্ঘদিন স্ত্রীকে চালানোর পর বুঝতে পারে কীভাবে স্ত্রীকে চালালে সংসারে অনাকাংখিত পরিস্থিতি এড়ানো সম্ভব। কীভাবে স্ত্রীর সংগে আচরণ করলে ভারসাম্য রক্ষা করে জীবন-তরি কূলে নিয়ে নোঙ্গর করা সম্ভব। শুরু থেকেই যদি এসব ব্যাপারে সঠিকবুঝ অর্জন করা না হয়, তাহলে নির্বিঘ্নে সংসার জীবনের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেয়া সম্ভব হয় না, মাঝ নদীতেই জীবন-তরি নিমজ্জিত হয়, অনাকাংখিত বহু পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। তার পর বুঝে আসলেও সেই বুঝ কাজে লাগে না। কারণ ইতিমধ্যে সময় পার হয়ে গেছে। সুতরাং কত ভাল হয় যদি সময় পার হয়ে যাওয়ার আগেই এসব কলা-কৌশল রপ্ত করে নেয়া যায়, যা বুঝার তা আগেভাগেই বুঝে নেয়া হয়। যাদের এখনও দাম্পত্য জীবন শুরু হয়নি, কিংবা শুরু হলেও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে, তাদের বলব, আগেভাগেই হীতাকাংখী মুরব্বী থেকে কিংবা বিশুদ্ধ দ্বীনী কিতাব পড়ে জেনে নিন দাম্পত্য জীবনকে কীভাবে সুখী বানাতে হয়, জেনে নিন সংসার জীবনে অশান্তি কেন হয়, তার প্রতিকারের ব্যবস্থা কি, পুরুষ হলে জেনে নিন কীভাবে স্ত্রীকে চালাতে হয় আর নারী হলে জেনে নিন কীভাবে স্বামীর সাথে নির্বিঘ্নে সংসার-জীবন পাড়ি দেয়া যায়।

বিয়ের আগেই স্ত্রীকে চালানোর নিয়ম-নীতি ও কৌশলাদি জেনে নেয়ার দরকার, কিন্তু কেউ বিয়ের আগে এগুলো জেনে নেয়াকে দরকারী মনেই করে না। এর বিপরীত অনেকেই যা জানাকে দরকারী মনে করে "লজ্জাতুন নেছা" ও "স্বামী স্ত্রীর মিলন" ধরনের বই পড়ে, তা জানার তেমন কোন প্রয়োজনও নেই। কীভাবে যৌনকর্ম সম্পন্ন করতে হয়, কীভাবে তা শুরু আর কীভাবে তার সমাপ্তি ঘটাতে হয় তা কি বই পড়ে শেখার দরকার আছে? এগুলো তো হায়ান-জানোয়াররাও কোন কিছু লেখাপড়া না করেও স্বভাব থেকেই শিখে যায়। যদিও ইসলামে হায়ান-জানোয়ারের মত যৌনকর্ম সম্পাদন করা হবে তা বলা হয়নি, কিছু নিয়মনীতি সেখানেও আছে, কিন্তু তা জানার জন্য আদৌ "লজ্জাতুন নেছা" আর "স্বামী-স্ত্রীর মিলন"– এ ধরনের বই পড়ার প্রয়োজন নেই। তার জন্য ফেকার কিতাবে উল্লেখিত সংশ্লিষ্ট মাসআলা-মাসায়েল পাঠ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করে নিলেই চলে। আমি যেসব বিষয় জেনে নেয়ার প্রয়োজন বলছি তা স্বামী-স্ত্রীর মিলনের নিয়মনীতি নয়। সেগুলো জেনে নেয়ার প্রয়োজন কমবেশ সকলেই অনুভব করে থাকে। আমি যা বলছি তা হচ্ছে বিয়ের আগেই জেনে নিবেন স্ত্রীকে চালানোর নিয়ম-নীতি ও কৌশলাদি। কীভাবে স্ত্রী সংসার চালাবে তা তাকে শিখিয়ে দিবেন। দাম্পত্য জীবনে টুকিটাকি খটাখটি লেগেই থাকে, সেটা নিতান্তই স্বাভাবিক, তা কিছু একটা খটাখটি লাগলেই কি হুট করে বউকে তালাক দিয়ে দিবেন না তা নিষ্পত্তির ব্যবস্থা আছে? এগুলো আগেভাগেই জেনে নিবেন। কথায় কথায় বউকে গরু পেটা করবেন না। বউকে শাসন করার ভদ্রজনোচিত ও শালীন ব্যবস্থা আছে তাও সংসার জোড়ার আগেই জেনে নিবেন। বিয়ের আগেই এসব বিষয় জেনে নেয়ার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু অনেকেই তার প্রয়োজন বোধ করেন না। তারপর অজ্ঞতা নিয়ে সংসারজগতে পা দেয়ার ফলে পদে পদে লেজেগোবরে অবস্থা হয়ে দাঁড়ালে তখন হুজুরদের কাছে সমাধানের জন্য ছোটাছুটি শুরু করেন কিংবা একা একাই গোপনে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধ হতে থাকেন।

এখানে যে বিষয়গুলো সম্বন্ধে আগেভাগেই জেনে নেয়ার কথা বলা হল, আপনি সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানার জন্য অন্তত আমার রচিত "আহকামে যিন্দেগী" গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং উক্ত অধ্যায়ের "পরিবার-নীতি" শিরোনামের আওতাভুক্ত উপশিরোনামসমূহে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা পাঠ করে নিতে পারেন।

সন্তানকে গড়ে তোলার নিয়ম-নীতি

অনেক পিতা-মাতাই সন্তানকে গড়ে তোলার নিয়ম-নীতি ও কলা-কৌশল জানেন না, শুরু থেকে বুঝতে পারেন না। বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়। ফলে অনাকাংখিত পরিস্থিতি এড়ানো তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। যেমন: সন্তানকে পরিমিত শাসন করার একটা সু-ফল রয়েছে। শাসন অতিরিক্তও করতে নেই, আবার একেবারে লাগামহীনও ছেড়ে দিতে নেই। অতিরিক্ত শাসন করলে সন্তান বিগড়ে

www.maktabatulabrar.com

যায়, আবার পর্যাপ্ত শাসনে ত্রুটি থাকলে অর্থাৎ, আদর-সোহাগ বেশি করলে সন্তান বে-আড়া ও লাগামহীন হয়ে যায়, আবার আদর-সোহাগে কমতি থাকলে সন্তান রুক্ষ হয়ে ওঠে। এসব কৌশল না জানার ফলে কোন পিতা-মাতা হয়তো অতিরিক্ত শাসন করায় কিংবা অতিরিক্ত আদর-সোহাগ করায় সন্তান বিগড়ে গেল, সন্তান রুক্ষ মেজাযের হয়ে উঠল, কিংবা পর্যাপ্ত শাসনে ত্রুটি করায় সন্তান বে-আড়া ও লাগামহীন হয়ে গেল, পরে যখন বিষয়টা ঐ পিতা-মাতার বুঝে আসল তখন আর কিছুই করার থাকল না। কারণ ইতিমধ্যে সন্তান অনেক বড় হয়ে গেছে, তার ঘাড়ের রগ ত্যাড়া হয়ে গেছে, সে স্বাধীনচেতা হয়ে উঠেছে, অবলীলায় শাসন মানার স্বাভাবিক বয়স তার পার হয়ে গেছে। তাই এখন বুঝে আসলেও এই বুঝ তার জন্য সু-ফল বয়ে আনবে না। তার যে বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে গেছে।

শুধু সন্তানকে শাসন করার বিষয়ই নয়, সন্তানকে যথাসময়ে সু-শিক্ষা প্রদানের গুরুত্ব, সন্তানের চরিত্র গড়ে তোলার জন্য যথাসময়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্ব ইত্যাদি অনেক কিছুই আমাদের অনেকের বুঝে আসে, কিন্তু তা সময় পার হয়ে যাওয়ার পর। কত ভাল হত যদি তা বুঝে আসত সময় পার হওয়ার আগেই এবং আগেভাগেই সেগুলো বুঝে নেয়া হত। যারা সন্তানাদির অপেক্ষায় রয়েছেন, কিংবা যাদের সন্তানাদির এখনও পিতা-মাতার শাসন ও শিক্ষা মানার বয়স বা প্রবণতা রয়েছে তাদের বলব, এখনই হীতাকাংখী মুরব্বী থেকে কিংবা বিশুদ্ধ দ্বীনী কিতাব পড়ে জেনে নিন সন্তান লালন-পালন করার নিয়ম-নীতি কি, জেনে নিন সন্তান কীভাবে নষ্ট হয়, কেন নষ্ট হয়, তার প্রতিকার ব্যবস্থা কি।

সন্তান গ্রহণের পূর্বেই সন্তান গ্রহণ ও লালন-পালনের নিয়মনীতি ও কৌশলাদি জেনে নেয়ার দরকার। কিন্তু কেউ সন্তান গ্রহণের আগে এগুলো জেনে নেয়াকে দরকারি মনেই করে না। এ ব্যাপারে প্রায় অধিকাংশেরই কর্মনীতি হল চলতে চলতে শেখে। ফলে সন্তান বিপথে গেলেও কী কারণে বিপথে গেল, এ ব্যাপারে পিতা-মাতার কী করণীয়

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ছিল তা যখন বুঝে আসে তখন আর তেমন কিছুই করার থাকে না। কেননা ইতিমধ্যে সন্তান পুরোপুরিই খারাপ হয়ে সেরেছে। আগে থেকেই যদি জানা থাকত সন্তানকে কীভাবে সুসন্তান বানাতে হয়, সন্তানকে সুপথে রাখার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয় এবং সে মোতাবেক উদ্যোগ নেয়া হত তাহলে হয়তো সন্তান রক্ষা পেত। তাই বলছিলাম, সন্তান গ্রহণের পূর্বেই সন্তান লালন-পালনের নিয়মনীতি সম্বন্ধে জেনে নেয়া দরকার।

সন্তান গ্রহণের পূর্বেই সন্তান সম্বন্ধে যে বিষয়গুলো আগেভাগেই জেনে নেয়া দরকার সে বিষয়গুলো সম্বন্ধে জানার জন্য অন্তত আমার রচিত "আহকামে যিন্দেগী" গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের সন্তানের অধিকার শিরোনামের আলোচনা এবং "সন্তান লালন-পালন" শিরোনামের আওতাভুক্ত উপশিরোনামসমূহে যে বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে তা পাঠ করে নিতে পারেন।

স্বামী-স্ত্রীর কদর

অনেক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এমন হয় তারা উভয়ে বেঁচে থাকতে বা সংসারবদ্ধ থাকতে একে অপরের কদর বোঝে না, অপরের মৃত্যু হওয়ার পর বা সংসার বিচ্ছিন্ন হলেই তখন কদর বুঝতে পারে। অর্থাৎ, এটিও এমন একটি বিষয় যা বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়। সময় পার হওয়ার পর বুঝে আসে। স্ত্রীর অবর্তমানে স্ত্রীর কদর বুঝে আসে– এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল কখনও রাগের মাথায় তিন তালাক হয়ে গেলে দেখা যায় ঐ স্বামী ঐ স্ত্রীকে আবার কীভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তার উপায় জানার জন্য হুজুরদের কাছে ছোটাছুটি আরম্ভ করে। তখন স্ত্রীর কদর বুঝে আসে যে, ও না থাকলে আমার সন্তানাদিকে লালন-পালন করবে কে? আমার সংসার আগলে রাখবে কে? ওর শত-সহস্র ত্রুটি থাকলেও যতটুকু আমার আদর-যত্ন করত তা এখন করবে কে? অনুরূপভাবে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর বুঝে আসে স্বামীর কদর কী ছিল। তখন বুঝতে পারে স্বামী না থাকায় তাকে বিশেষ ধরনের আদর করার আর কেউ নেই, নতুন করে এমন কাউকে গ্রহণ করার চিন্তাও আর করা

www.maktabatulabrar.com

যাচ্ছে না, এক মহা শূন্যতায় পড়ে গেছে সে। তখন বুঝতে পারে স্বামী না থাকায় এখন সংসারে তার নেতৃত্বও নেই, এখন তাকে ছেলেদের বা ছেলে বউদের অধীন হয়ে থাকতে হচ্ছে। তখন বুঝতে পারে স্বামী বেঁচে থাকতে স্বামীর বশ্যতা স্বীকার করে চলার মধ্যেও, স্বামীর শত বকা ও শাসন সত্ত্বেও মাথা যতখানি উঁচু করে চলা যেত এখন তা আর পারা যাচ্ছে না। এভাবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একজনের অবর্তমানে অপরজনের বুঝে আসে যে অবর্তমান হয়ে গেল তার কদর ও গুরুত্ব কতখানি ছিল। কিন্তু সেই বুঝ তখন আর কাজে আসে না, তখন আর কিছুই করার থাকে না। তাই আমাদের স্বামী-স্ত্রীরা যেন সময় থাকতেই একে অপরকে মূল্যায়ন করতে শেখে।

পিতা-মাতার কদর

আমাদের অনেকের জীবনেই এমন ঘটে যে, পিতা-মাতার কদর বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়। অর্থাৎ, ইতিমধ্যেই পিতা-মাতা দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। সাধারণত মানুষের যখন সন্তান হয় তখন সে বুঝতে পারে মাতা-পিতার কদর কী। মা সন্তানের জন্য কত ত্যাগ স্বীকার করেন, কীভাবে কলিজা ছিড়ে সন্তানকে আদর-স্নেহে আগলে রাখেন, পিতা সন্তানের মঙ্গলের জন্য কত চিন্তা-ফিকির করেন, কীভাবে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সন্তানের ভবিষ্যত গড়ার জন্য চেষ্টা করেন– কেউ মাতা-পিতা হওয়ার পরই এসব বিষয় হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারে। তখন তার নিজের পিতা-মাতার কদর বুঝে আসে। কিন্তু ইতিমধ্যেই হয়তো পিতা-মাতা দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন।

পিতা-মাতার কদর আরও বুঝে আসে যখন কারও সন্তান তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে, যখন সন্তান তার অবাধ্য চলে, যখন সন্তান তার অধিকার আদায়ে ত্রুটি করে। তখন সে সন্তানের জন্য এতকিছু করা সত্ত্বেও কেন সন্তান তার সঙ্গে এভাবে চলে– এই ভেবে বিচলিত হয়, দুঃখ-বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়। তখন তার হাড়ে হাড়ে বুঝে আসে সন্তান কর্তৃক পিতা-মাতার অবাধ্যতা পিতা-মাতার জন্য কতটা পীড়াদায়ক। এভাবে পিতা-মাতার কদর তার বুঝে আসে। তখন তার মনে হয় হায়রে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পিতা-মাতার সঙ্গে আমি যে কত শত অনাকাংখিত অবাঞ্ছিত আচরণ করেছি। হায়! আজ যদি আমার পিতা-মাতা বেঁচে থাকতেন তাহলে অতীতের কৃত অনাকাংখিত অবাঞ্ছিত সব আচরণে সংশোধনী আনতে পারতাম, তাঁদের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারতাম, তাঁদের সেবায় নিজেকে উজাড় করে দিতে পারতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে সময় পার হয়ে গেছে। এখন যে আর কিছুই করার নেই! কত ভাল হত যদি পিতা-মাতার কদর বুঝে আসত সময় পার হওয়ার আগেই।

জ্ঞানী-গুণীদের কদর

জ্ঞানী-গুণীদের কদরও এমন একটি বিষয় যা বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়। আমাদের সমাজে জ্ঞানী-গুণীদের কদর বুঝতে বুঝতেই তাঁরা বিদায় নেন। জ্ঞানী-গুণীদের কদর মূল্যায়ন আমরা করি কিন্তু তা তাঁদের মৃত্যুর পর। তাঁদের কেউ মৃত্যুবরণ করলে তখন আমরা কত কথা বলি! তিনি সমাজের দিক-দিশারী ছিলেন, জাতির কাণ্ডারী ছিলেন, এই ছিলেন সেই ছিলেন– এরকম কত কথা বলে তাদের মূল্যায়ন করি। কিন্তু তাঁদের জীবদ্দশায় কি তাঁদের এই মূল্যায়ন হতে পারত না? জীবদ্দশায় কি তাঁদের মূল্যায়ন করা যায় না? যদি যায় তাহলে কেন আমরা তাঁদের জীবদ্দশায় তাঁদের মূল্যায়নে এত অনগ্রসর থাকি? দু' একটি ব্যতিক্রম বাদে সাধারণভাবে কেন আমরা জীবদ্দশায় জ্ঞানী-গুণীদের মূল্যায়ন করতে জানি না? জীবদ্দশায় কারও গুণাগুণ ও যোগ্যতা মূল্যায়িত হলে তাতে কি তার ব্যক্তিত্ব ও গুণাবলী আরও উৎসাহিত হয় না? তাতে কি তাঁর অনুপ্রাণিত কর্ম ও আদর্শ আরও বেশি প্রস্ফুটিত হয় না? তাতে কি জাতি হাতে কলমে আরও বেশি উপকৃত হতে পারে না? কিন্তু আমরা যেন কারও জীবদ্দশায় শুধু তাকে সমালোচনা ও অবহেলাই উপহার দিতে জানি আর মৃত্যুর পরই কেবল তার মূল্যায়ন করতে পারি। আমৃত্যু যাকে আমরা শুধু সমালোচনা আর অবহেলা দিয়ে নিবারিত করে রাখি, মৃত্যুর পরই তাকে প্রশংসা ও ভক্তির ডালি দিয়ে বরণ করতে শুরু করি। আমাদের আচরিত এই নীতি থেকে অনুমিত হয়

www.maktabatulabrar.com

যেন মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তার জীবনে ভাল কোনো দিক ছিল না, যা ছিল শুধুই দোষ আর দোষ, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সব দোষ যেন গুণে রূপান্তরিত হয়েছে! কী অদ্ভুত আমাদের নীতি! এ নীতি বিদ্যমান ব্যক্তিত্বের বিকাশমানতাকে উৎসাহিত না করার নীতি। এ নীতি জাতিকে বঞ্চিত করার নীতি। তদুপরি এ নীতি আত্ম-সংকীর্ণতারও নীতি, যদি তার অনুশীলন এ কারণে হয় যে, অন্যের মূল্যায়ন করলে নিজের হিস্‌সা কমে যাবে। এ নীতি থেকে আমরা কি উঠে আসতে পারি না? সময় পার হয়ে যাওয়ার আগেই কি আমরা জ্ঞানী-গুণীদের কদর করায় ব্রতী হতে পারি না?

আল্লাহ তায়ালা আমাদের তাওফীক দিন, যেসব কাজের সময় এখনও পার হয়ে যায়নি সেসব ব্যাপারে যেন আমাদের সঠিক বুঝ অর্জন হয়, সঠিক চেতনা জাগ্রত হয় এবং আমরা যেন সময়মত সঠিক পদক্ষেপটি নিতে পারি। আমীন!

"যা আগেভাগেই জেনে নেয়া হয় না বুঝতে বুঝতেই সময় পার হয়ে যায়" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- ছাত্রজীবনের সময় পার হওয়ার আগেই ছাত্রজীবনের গুরুত্ব বুঝুন।
- যৌবনের সময় পার হওয়ার আগেই যৌবনের কদর ও গুরুত্ব বুঝুন।
- দাম্পত্য জীবন গড়ার আগেই পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের নিয়ম-নীতি ও কলা-কৌশল সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে বুঝে নিন। এ বিষয়ে মুরব্বীদের সহযোগিতা নিন, তাদের নেতৃত্বে অগ্রসর হোন।
- দাম্পত্য জীবনের শুরুতেই দাম্পত্য জীবনকে কীভাবে সুখী বানাতে হয় এবং সংসার জীবনে অশান্তি কেন হয়, তার প্রতিকার ব্যবস্থা কি জেনে নিন।
- শুরু থেকেই সন্তানকে গড়ে তোলার নিয়ম-নীতি ও কৌশলাদি জেনে নিন এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ নিন। জেনে নিন সন্তান কীভাবে নষ্ট হয়, কেন নষ্ট হয়, তার প্রতিকার-ব্যবস্থা কি।
- হারানোর পূর্বে স্বামী-স্ত্রী একে অপরের কদর বুঝার চেষ্টা করুন।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

- পিতা-মাতা বেঁচে থাকতে তাঁদের কদর বুঝুন।
- জ্ঞানী-গুণীরা বেঁচে থাকতে তাঁদের কদর বুঝতে চেষ্টা করুন।

জেনে-বুঝেও যা করা হয় না

ইল্‌ম ও আমল তথা জানা আর করা– এ দুটোর মধ্যে কোন্‌টা আগে তা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা কঠিন। যদিও সাধারণভাবে জানা হল করার পূর্বের স্তরের বিষয়। কেননা, না জানলে করার চেতনা ও করার উৎসাহই সৃষ্টি হয় না। কারও মধ্যে কোনোভাবে চেতনা ও উৎসাহ সৃষ্টি হলেও সেটা কীভাবে করতে হবে তা না জানলে করবেই বা কী করে। তাই ইল্‌ম হাসেল করা তথা জানা হল আগে এবং আমল তথা করা হল পরে। তবে এটা সবক্ষেত্রে পুরোপুরি প্রযোজ্য নয়। অনেক বিষয় এমন আছে যা করতে করতে জানা হয়, করতে করতে বুঝা ও শেখা হয়। অফিস-আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, কায়-কারবার এবং পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবনের এমন অনেক কিছু রয়েছে যা আগে থেকে পুরোপুরি জানা ও বুঝা সম্ভব হয় না, করতে করতে জানা হয়, করতে করতে বুঝা ও শেখা হয়। তবে মোটামুটি মৌলিক ও প্রারম্ভিক জ্ঞান সবকিছুরই আগে থেকেই থাকতে হয়। বিশেষত বিধিবদ্ধ ধর্মীয় বিষয়াদির অন্তত প্রাথমিক জ্ঞান আমল করার আগেই অর্জন করা নিয়ম। আগে থেকেই এরূপ জ্ঞান-অর্জন করে নিলে সংশ্লিষ্ট আমল করার উৎসাহ সৃষ্টি হবে এবং তা সঠিকভাবে করা সম্ভব হবে।

অনেক বিষয়ই এমন যা জানলে বুঝলে করা হয়, না জানলে না বুঝলে করা হয় না। তবে আমাদের জীবনে এমনও অনেক বিষয় রয়েছে যা জানা-বুঝা সত্ত্বেও করা হয় না। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা এ ধরনের কিছু বিষয় উল্লেখ করার প্রয়াস পাব। ব্যক্তিগত জীবনেরও এমন বহু বিষয় রয়েছে যা জেনে-বুঝেও করা হয় না। পারিবারিক জীবনেরও এমন বহু বিষয় রয়েছে, যা জেনে-বুঝেও করা হয় না। রাষ্ট্রীয় অঙ্গনেরও এমন বহু বিষয় রয়েছে যা জেনে-বুঝেও করা হয় না। নিম্নে আমরা এই তিন ধরনের কিছু কিছু বিষয় উল্লেখ করছি, যা জেনে-বুঝেও করা হয় না।

www.maktabatulabrar.com

ব্যক্তিগত জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না

ব্যক্তিগত জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও যা করা হয় না, তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটা বিষয় লক্ষ করুন।

ছাত্রজীবনের মূল্যায়ন

ব্যক্তিগত জীবনের যেসব বিষয় জেনে বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে একটা হল ছাত্রজীবনের সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানোর বিষয়। যদিও সব ছাত্র-ছাত্রীই জানে ও বোঝে, শিক্ষকগণও তাদেরকে বিষয়টা জানান ও বোঝান যে, ছাত্র জীবনের সময় বহু মূল্যবান। ছাত্রজীবনের সময় নষ্ট করলে তার ক্ষতি আর কোনো দিনও পূরণ হবে না। কিন্তু জানা-বুঝা সত্ত্বেও ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের ছাত্রজীবনের সময়কে হেলায় নষ্ট করে দেয়, উদাসীনতা, খেল-তামাশা ও ক্রিড়া-কৌতুকের মধ্যে পার করে দেয়।

পরীক্ষার অনেক আগ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজন%

ব্যক্তিগত জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে আর একটা হল পরীক্ষার অনেক আগ থেকেই পড়াশুনা বাড়িয়ে দেয়ার বিষয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সাধারণত পরীক্ষা ঘনিয়ে এলে পড়াশোনার চেতনা জোরালো হয়, কিন্তু সেটা হয় এমন সময় যখন পরীক্ষা একেবারে মাথার উপর। তখন চাইলেও পর্যাপ্ত সময়ের অভাবে সব বই-কিতাব যথাযথভাবে আয়ত্ব করা হয়ে ওঠে না। তখন ছাত্র-ছাত্রীরা ভাবে আগামীতে পরীক্ষার অনেক আগ থেকেই পড়াশুনা বাড়িয়ে দিব। আগামীতে আর সময় নষ্ট করব না। আর এটা করব না, সেটা করব না ইত্যাদি অনেক প্রতীজ্ঞাই তারা মনে মনে করে থাকে। কিন্তু পরীক্ষা চলে যাওয়ার পর গলায় বিদ্ধ কাটা ছাড়িয়ে গেলে যা হয়, কাটাযুক্ত মাছ অসাবধানে না খাওয়ার সব প্রতীজ্ঞা হাওয়ায় উবে যায়।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই পাঠদানে যথাযথ গতি আনয়ন

ব্যক্তিগত জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে আর একটা হল শিক্ষকদের শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই পাঠদানে যথাযথ গতি আনয়ন করার বিষয়। ফাইনাল পরীক্ষার সময় এগিয়ে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আসলে শিক্ষকরা যখন দেখে পাঠ্য বই-কিতাবের পাঠদানের পরিমাণ অনেকই কম রয়ে গেছে, তখন কীভাবে কোনো রকমে নদী পাড়ি দেয়া যায় তার চেষ্টায় হাত-পা মারতে লেগে যায়। আর ভাবে আগামীতে আগেভাগেই বেশি করে পড়িয়ে রাখব, এমন কষ্টে যেন আর পড়তে না হয়। কিন্তু এই শিক্ষাবর্ষ পার হয়ে নতুন শিক্ষাবর্ষ এলে আবার তথৈবচ– শম্বুকগতিই চলতে থাকে।

যৌবনে ইবাদত-বন্দেগী

ব্যক্তিগত জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে আর একটা হল যৌবন বয়সে ইবাদত-বন্দেগী করার বিষয়। কে না বোঝে যখন বার্ধক্যে কোমর ব্যথা শুরু হবে, গিরায় গিরায় পেনশনের সুর বেজে উঠবে, কর্মক্ষমতা কর্মচাঞ্চল্য হ্রাস পাবে, তখন ইবাদত-বন্দেগী সুন্দরভাবে করা যাবে না। প্রত্যেকেই বোঝে ইবাদত-বন্দেগী সুন্দরভাবে করতে চাইলে যৌবন বয়সই হল তার জন্য মোক্ষম সময়। কিন্তু জেনে-বুঝেও তা করা হয় না। যৌবন কেটে যায় ইবাদতহীনতায়, যথেচ্ছাচারিতায়, খেল-তামাশায়, পাপাচারিতায়। বস্তুত যৌবনকালই ইবাদতের মোক্ষম সময়। প্রসিদ্ধ মহিলা তাবিয়ী হযরত হাফসা বিনতে সিরীন বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! خُذُوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ شَبَابٌ، فَإِنِّيْ مَا رَأَيْتُ الْعَمَلَ إِلَّا فِي الشَّبَابِ. (قيمة الزمن عند العلماء)

অর্থাৎ, হে যুব সমাজ! তোমরা যুবক থাকতেই জীবনকে কাজে লাগাও, আমি মনে করি যৌবনকালই আমলের সময়।

(কীমাতুয যামানি ইন্দাল উলামা)

আগামীর চক্করে না পড়া

ব্যক্তিগত জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে আর একটা হল আগামীর চক্করে না পড়ার বিষয়। আজ নয় কাল করব এ বিষয়। প্রত্যেক মানুষই জানে এক মিনিটও বেঁচে থাকার গ্যারান্টি নেই। মানুষ বলেও থাকে, নিঃশ্বাসের বিশ্বাস নেই, আজ মরলে

www.maktabatulabrar.com

কাল দুই দিন। অতএব এখনই আমল শুরু করে দেয়া চাই। কিন্তু জেনে-বুঝেও তারা এখনই আমল শুরু করে দেয় না, আজ নয় কাল করব– এভাবে আগামীর চক্করে পড়ে থাকে।

কতক্ষেত্রে মানুষ আগামীর চক্করে পড়ে থাকে?

আগামীর চক্করে পড়ার তালিকায় অনেক কিছু অন্তর্ভুক্ত। এখন সুস্থ আছি আগামীতে সুস্থ না-ও থাকতে পারি– এটা জেনে-বুঝেও এখন সুস্থতার মূল্যায়ন করলাম না, ভাবলাম আগামীতে করব। আগামীতে হয়তো এরকম সুস্থতা থাকল না। এটাও আগামীর চক্করে পড়ার শামিল। এখন সম্পদ আছে আগামীতে সম্পদ না-ও থাকতে পারে– এটা জেনে-বুঝেও এখন সম্পদের মূল্যায়ন করলাম না, সম্পদকে ভাল কাজে ব্যবহার করলাম না, সম্পদকে দান-সদকা ও নেক কাজে ব্যবহার করলাম না, আগামীতে করব ভাবলাম। আগামীতে হয়তো এভাবে সম্পদ থাকল না। এটাও আগামীর চক্করে পড়ার শামিল। এখন যতটুকু অবসর আছে আগামীতে ততটুকু অবসর না-ও থাকতে পারে, ব্যস্ততা বাড়তে পারে এটা জেনে-বুঝেও এখন অবসরকে কাজে লাগালাম না। আগামীতে করব ভাবলাম। আগামীতে হয়তো এরকম অবসর থাকল না। এটাও আগামীর চক্করে পড়ার শামিল। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে এখন হায়াত আছে পরবর্তীতে যেকোনো সময় মৃত্যু এসে যেতে পারে। তাই এখনই জীবনের সময়কে কাজের কাজে লাগানো উচিত। কিন্তু জেনে-বুঝেও জীবনের মূল্যবান সময়কে কাজের কাজে লাগানো হয় না। শুধু সামনে করব, সামনে করব ভাবা হয়। এসব ক্ষেত্রেই এখন নয় সামনে করব– এভাবে আগামীর চক্করে পড়ে থাকা হয়। এগুলো সবই আগামীর চক্করে পড়ার শামিল। এক হাদীছে এভাবে আগামীর চক্করে না পড়ার জন্য বলা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

« اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

مَوْتِكَ.» (رواه الحاكم فى المستدرك فى كذاب الرقاق برقم ٨٠١٠ وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين، وأقره عليه الذهبي فى التلخيص)

অর্থাৎ, পাঁচটা জিনিস আসার পূর্বে অন্য পাঁচটা জিনিসের মূল্যায়ন কর। বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনের মূল্যায়ন কর, অসুস্থতা আসার পূর্বে সুস্থতার মূল্যায়ন কর, অভাব আসার পূর্ব সচ্ছলতার মূল্যায়ন কর, ব্যস্ততা আসার পূর্বে অবসরের মূল্যায়ন কর এবং মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনের মূল্যায়ন কর। (মুস্তাদরকে হাকিম)

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে, ভবিষ্যতে বৃদ্ধ বয়সে কাজ করব, ভবিষ্যতে সুস্থতা বাড়বে তখন কাজ করব, ভবিষ্যতে অভাব কমবে তখন দান-খয়রাত করব, ভবিষ্যতে ব্যস্ততা কমবে তখন কাজ করব- এভাবে ভবিষ্যতে করার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এখনই কাজ শুরু করে দাও। ভবিষ্যত নয় বর্তমানকে সামনে রেখেই কাজ কর। ভবিষ্যতের চক্করে পড় না।

পারিবারিক জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না

পারিবারিক জীবনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও যা করা হয় না, তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটা বিষয় পেশ করা হচ্ছে।

রাগের মাথায় পারিবারিক পদক্ষেপ নেয়া

পারিবারিক জীবনের যেসব বিষয় জেনে বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে একটা বিষয় হল রাগের মাথায় স্বামী-স্ত্রী একে অপরের বিরুদ্ধে প্রান্তিক কোন পদক্ষেপ না নেয়া। স্ত্রী বোঝে রাগের মাথায় স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া বা স্বামীর সঙ্গে চরম লাগালাগি করা ঠিক হবে না। হুশ ফিরে আসার পর হয়তো এজন্য আমাকে লজ্জিত হতে হবে, শেষ পর্যন্ত এ স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব হবে না, তার সঙ্গেই আমাকে ঘর করতে হবে। কাজেই রাগের মাথায় চরম কিছু করা ঠিক হবে না। কিন্তু জেনে-বুঝেও রাগের মাথায় স্ত্রীরা এমনটাই অহরহ করে থাকে। স্বামীও বোঝে এই স্ত্রীকে বাদ দিয়ে চলা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, আমার ছেলে-মেয়ে আছে তাদের দেখাশুনা কে করবে, ঘর কে

www.maktabatulabrar.com

সামলাবে, এই স্ত্রী ছাড়া আমার চলবে না, সামাজিক মান-মর্যাদা ইত্যাদি বিষয়েরও প্রশ্ন আছে যার কারণে এই স্ত্রীকে ত্যাগ করে থাকা সম্ভব হবে না, কিন্তু জেনে-বুঝেও স্বামীরা রাগের মাথায় স্ত্রীদেরকে এমনভাবে তালাক দিয়ে দেয় যাতে আর ঐ স্ত্রীদেরকে রাখা সম্ভব হয় না। তখন হুজুরদের কাছে ছোটাছুটি শুরু করে কীভাবে আবার ঐ স্ত্রীদেরকে ফিরিয়ে আনা যায়।

শুরু থেকেই স্ত্রী সন্তানদেরকে দ্বীনের পথে চালানো

পারিবারিক জীবনের যেসব বিষয় জেনে বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে আর একটা হল স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বীনের পথে চালানোর বিষয়। সকলেই জানে, বোঝে এবং স্বীকারও করে যে, স্ত্রীকে দ্বীনের পথে চালানো উচিত, সন্তানদের দ্বীনের পথে চালানো উচিত এবং ছোট বয়সেই সন্তানদের দ্বীনের পথে চালানো না হলে বড় হওয়ার পর যখন তাদের রগ তেড়া হয়ে যাবে, তখন হয়তো তাদেরকে দ্বীনের পথে ওঠানো সম্ভব হবে না, কিন্তু জানা-বোঝা সত্ত্বেও প্রথম বয়সে সন্তানদের ছাড় দেয়া হয় এই ভেবে যে, ওদের কি এখন ধর্ম-কর্ম করার সময় হয়েছে, বয়স হোক তখন করবে। এভাবে জেনে-বুঝেও যথাসময়ে তাদেরকে দ্বীনের উপর ওঠানো হয় না। তারপর একসময় মনে-প্রাণে চাইলেও আর তাদেরকে দ্বীনের উপর ওঠানো সম্ভব হয় না।

পরিবারের একে অপরকে সালাম প্রদান

পারিবারিক জীবনের যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে আর একটা হল স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে, মাতা-পিতা ও সন্তানাদি একে অপরকে সালাম দেয়ার বিষয়। সবাই জানে সালাম দেয়া অনেক ছওয়াবের কাজ এবং সালামের মত এত উত্তম দুআ আর দ্বিতীয়টি নেই। কেননা সালামের মধ্যে, যাকে সালাম দেয়া হয় তার জন্য দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতের শান্তি কামনা করা হয়। তাহলে এর চেয়ে উত্তম দুআ আর কী হতে পারে? স্বামী-স্ত্রী একে অপরের জন্য শান্তি কামনা করবেনা তা কীকরে হতে পারে? তাদেরকে সালাম না দেয়ার অর্থ তো এই দাঁড়ায় যে, তাদের জন্য শান্তি কামনা করা থেকে বিরত থাকা হল।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পিতা-মাতা ও সন্তানাদি একে অপরের জন্য শান্তি কামনা করবেনা তা কীকরে হতে পারে? তাহলে কেন সালাম প্রদান করা থেকে বিরত থাকা হয়। এ বিষয়টা জানা-বুঝা সত্ত্বেও সঠিক চেতনা জাগ্রত না হওয়ায় স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে অনেকে একে অপরকে শরমে সালাম দেয়া থেকে বিরত থাকে। পিতা-মাতা ও সন্তানাদির মধ্যে অনেকে শরমে একে অপরকে সালাম দেয়া থেকে বিরত থাকে। এসব ক্ষেত্রে একে অপরকে সালাম দেয়া উত্তম বরং উচিত তা জেনে-বুঝেও সালাম প্রদান থেকে বিরত থাকা হয়।

রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না

ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের ন্যায় রাষ্ট্রীয় অঙ্গনেও এমন বহু বিষয় রয়েছে জেনে-বুঝেও যা করা হয় না। তার মধ্যে বিশেষ কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করা যাক।

বিশেষ ক্ষমতা আইন রহিত করা

রাষ্ট্রীয় অঙ্গনের যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে একটা হল বিশেষ ক্ষমতা আইন রহিত করার বিষয়। বিশেষ ক্ষমতা আইনের বলে বিনা অপরাধে বিনা অভিযোগে একজনকে আঁটক রাখা হয়। এভাবে একজনের প্রতি জুলুম করা, একজনের স্বাধীনতা নষ্ট করা এবং সেই আইনের প্রয়োগকারীকে যথেচ্ছাচারিতার সুযোগ দেয়া– এটা যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না, ইসলামী আইনের দৃষ্টিতে তো নয়ই। ইসলামের দৃষ্টিতে বিনা অপরাধে কাউকে শাস্তি দেয়া জুলুম। আর জুলুম হচ্ছে হারাম। এমনিভাবে ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ কেন কোন অবলা প্রাণীর স্বাধীনতাও খর্ব করা বৈধ নয়। এ কারণেই কোন বণ্য পশু-পাখিকে নিছক শখের বশে খাঁচায় বন্দী করে রাখা জায়েয নয়। যাহোক বিশেষ ক্ষমতা আইন কোনো সুস্থ দৃষ্টিতেই বৈধ নয়। এটা সকলেই বোঝে। আর বোঝে বলেই যখন যে দল ক্ষমতার বাইরে থাকে তখন তারা এ আইনের বিরুদ্ধে অল্প-বিস্তর দায়সারা গোছের বক্তব্য-ভাষণ দিয়েও থাকে। কিন্তু সেই দলই যখন ক্ষমতার মসনদে বসে তখন তারা এ আইন নিষিদ্ধ করার কোনোই উদ্যোগ নেয় না। কারণ এমন

www.maktabatulabrar.com

যথেচ্ছারিতার সুযোগ কেন হাতছাড়া করা হবে! তাহলে সারকথা এই দাঁড়াল যে, বিশেষ ক্ষমতা আইন তুলে দেয়া উচিত– এটা রাষ্ট্রীয় অঙ্গনের এমন এক বিষয় যা জেনে-বুঝেও করা হয় না।

পুলিশ রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধ করা

রাষ্ট্রীয় অঙ্গনের যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে আর একটা হল পুলিশ রিমান্ডের নির্যাতন বন্ধ করার বিষয়। পুলিশ রিমান্ডের নির্যাতন বর্বর যুগকেও হার মানায়। উলঙ্গ করে উপর দিকে পা দিয়ে ঝুলিয়ে পেটানো হয়। বলতেও শরম বোধ হয় পুরুষাঙ্গে রশি বেঁধে ইট ঝুলিয়ে দেয়া হয়। সুঁচ গরম করে নখের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। প্লাস দিয়ে টেনে নখ তুলে ফেলা হয়। হাতুড়ি দিয়ে গিরায় গিরায় পেটানো হয়। এরকম বর্বর ও অমানবিক অনেক কিছু পুলিশ রিমান্ডে করা হয়। রিমান্ডকর্মে দায়িত্বরত পুলিশদের তাই লাঠি, ছড়ি, ডাণ্ডাবেড়ি এসব তো আছেই, সেই সঙ্গে হাতুড়ি, প্লাস, লেপ সেলাই করা সুই, ইট, রশি ইত্যাদি অদ্ভুত সব সামগ্রীর প্রয়োজন পড়ে। সবই দলই জানে ও বোঝে যে, এগুলো বর্বর, অমানবিক, কিন্তু যে দল ক্ষমতায় থাকে তারা প্রতিপক্ষকে দমন করার মোক্ষম অস্ত্র ভেবে এর বিরুদ্ধে আইন করে না। আর যে দল ক্ষমতার বাইরে থাকে তারাও এর বিরুদ্ধে তেমন জোরালো কণ্ঠে সোচ্চার হয় না এই ভেবে যে, ভবিষ্যতে আমরা ক্ষমতায় গেলে তখন তো আমাদেরও এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। এভাবে, কি ক্ষমতাসীন দল কি বিরোধী দল কেউই রিমান্ড নামক এই অমানবিক ও বর্বর কর্মকাণ্ড নির্মূলের জন্য উদ্যোগী হয় না, সকলেই তাকে জামাই-আদরে পেলে-পুষে রাখে। তাহলে সারকথা এই দাঁড়াল যে, পুলিশ রিমান্ডের নামে এই অমানবিক ও বর্বর কর্মকাণ্ড বন্ধ করা উচিত একথা জেনে-বুঝেও তা করা হয় না।

ক্রস ফায়ার নামক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা

রাষ্ট্রীয় অঙ্গনের যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না কিংবা বলা যায় করা হচ্ছে না, তার মধ্যে আর একটা হল ক্রস ফায়ার নামক বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা। যখন র‍্যাববাহিনী কর্তৃক প্রথম দিকে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এই সিস্টেম চালু হয় এবং বহু দাগী খুনী সন্ত্রাসীকে হত্যা করা হতে থাকে, তখন অনেকেই এটাকে সরাসরি কিংবা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু আমি তখন মাসিক কা'বার পথে একটি প্রবন্ধে এর বিরুদ্ধে অল্প-বিস্তর কিছু লিখেছিলাম, যার সারকথা ছিল– এখন র‍্যাব কর্তৃক ক্রস ফায়ারের নামে দাগী খুনী সন্ত্রাসীদের হত্যা করা হচ্ছে বিধায় সাময়িক বিচারে এটা সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য মনে হলেও ভবিষ্যতের আশংকায় এটা সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ কে গ্যারান্টি দিবে যে, ভবিষ্যতে ক্ষমতাসীনদের বিরোধী দমনের অন্যায় লিপ্সা পূরণ করার কাজে এই ধারা ব্যবহৃত হবে না। (২০১৪–১৬ সালে যা হয়েছে, হচ্ছে তা আমার আশংকা অমূলক না হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণ হয়ে থাকবে।) এ ব্যাপারে আর বেশি ব্যাখ্যায় না গিয়ে সংক্ষেপে এতটুকুই বলতে চাচ্ছি, এখনই এটা বন্ধ করা উচিত। সকলেই এ বিষয়টা বুঝছেন, অনেকে সম্প্রতি বলাও শুরু করেছেন, কিন্তু যাদের বন্ধ করার ক্ষমতা তারা তা করছেন না, অর্থাৎ, জেনে-বুঝেও তা করা হচ্ছে না।

হরতাল- অবরোধ নিষিদ্ধ করা

রাষ্ট্রীয় অঙ্গনের যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে আর একটা হল হরতাল- অবরোধ নিষিদ্ধ করার বিষয়। যদিও কিছু লোক বলতে চায় যে, জনগণ যদি হরতাল-অবরোধের ব্যাপারে একমত থাকে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে তারা হরতাল-অবরোধ পালন করে এবং হরতাল-অবরোধ পালন করার সময় কারও জান-মালের ক্ষতি সাধন করা না হয়, তাহলে এরূপ হরতাল অবরোধ ডাকা অবৈধ হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হল সাধারণত নির্দিষ্ট কোন হরতাল- অবরোধের ব্যাপারে সমস্ত জনগণ একমত হয় না এবং একমত না হওয়া সত্ত্বেও জান-মাল ও ইজ্জত-আব্রুর ভয়ে হরতাল পালন করতে হয় অর্থাৎ, অনিচ্ছা সত্ত্বেও গাড়ী ঘোড়া, দোকান-পাট ও যানবাহন বন্ধ রাখতে হয় এবং এতে করে বহু লোকের আয়-উপার্জন বন্ধ থাকায় তাদেরকে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। এভাবে কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা যেহেতু যুক্তিযুক্ত ও জায়েয নয়, অতএব যে হরতাল- অবরোধের কারণে এটা হয় তাও অনিবার্য কারণেই

www.maktabatulabrar.com

অযৌক্তিক ও নাজায়েয হবে। যখন যে দল ক্ষমতায় থাকে তারা হরতাল-অবরোধের বিরুদ্ধে বক্তব্য-ভাষণ দিয়েও থাকে, কিন্তু আইন করে হরতাল-অবরোধ নিষিদ্ধ করে না এই ভেবে যে, ভবিষ্যতে আমরা ক্ষমতার বাইরে থাকলে তখন তো আমাদেরও এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে। তাহলে সারকথা এই দাঁড়াল যে, হরতাল- অবরোধ খারাপ তা জেনে-বুঝেও নিষিদ্ধ করা হয় না।

এছাড়াও ক্ষমতার অপব্যবহার করা উচিত নয়, ক্ষমতায় গিয়ে দেশের সম্পদ উজাড় করে দিয়ে নিজেদের আখের গোছানো উচিত নয়, নির্বাচনে কারচুপি করে ক্ষমতায় টিকে থাকার বা যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়, কারণে- অকারণে বিরোধী দলকে ঠেঙ্গানো উচিত নয়, যৌক্তিক অযৌক্তিক যেভাবেই হোক সরকারের সবকিছুর সমালোচনা করার মনোবৃত্তি রাখা উচিত নয়। এগুলো বর্জন করা উচিত, কিন্তু বর্জন করা হয় না। রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে এরূপ আরও বহু বিষয় রয়েছে যা বর্জন করা উচিত কিন্তু জেনে-বুঝেও তা বর্জন করা হয় না।

মহিলা গৃহকর্মী বিদেশে পাঠানো বন্ধ করা

রাষ্ট্রীয় অঙ্গনের যেসব বিষয় জেনে-বুঝেও করা হয় না তার মধ্যে একটা হল মহিলা গৃহকর্মী বিদেশে পাঠানো বন্ধ করার বিষয়। কে না জানে আজ আমাদের যে মা-বোনদের বিদেশে গৃহকর্মীর ভিসায় পাঠানো হচ্ছে– বিশেষত আরব দেশে– তাদেরকে নিয়োগদাতারা যৌনকর্মী হিসেবে, ক্রিতদাসী হিসেবে ব্যবহার করছে। নিয়োগকর্তা, নিয়োগকর্তার পুত্র, বন্ধু-বান্ধব সব একাকার হয়ে অবাধে তাদের শ্লীলতাহানি করছে। পত্র-পত্রিকা ও নেটে এ নিয়ে প্রচুর লেখালেখিও হয়েছে, হচ্ছে। বিষয়টা একেবারেই ওপেন সিক্রেট। কিন্তু রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তারা –যারা সোচ্চার হলে এ বিষয়টার প্রতিকার হতে পারে তারা– জেনে-বুঝেও মুখে কুলুপ এঁটে রাখছেন। তারা প্রতিকার হতে পারে এমনভাবে কিছু বলছেনও না, আবার মা-বোনদের বিদেশে গৃহকর্মীর ভিসায় পাঠানো বন্ধও করছেন না। এর দ্বারা শুধু ঐ নারীদেরই ইজ্জত হানি হচ্ছে তা নয়, গোটা জাতির ইজ্জত হানি হচ্ছে। এমনিতেই আমাদের লোকজন আরব

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দেশগুলোতে রাস্তা-ঘাট পরিষ্কার করা ও সুইপারি করার মত নিম্নমানের কাজগুলো করে বিধায় তাদের কাছে আমাদের মুখ ছোট হয়ে আছে। এজন্য আমাদেরকে মিসকীন বলেও সম্বোধন করা হয়ে থাকে। এই অপমানজনক সম্বোধন আমাদেরকে শুনে যেতে হয়। তার সঙ্গে যোগ হয়েছে শুধু পয়সার লোভে আমাদের মা-বোনদেরকে তাদের হাতে সপে দেয়ার মত নীচতা। আমাদের অভাব রয়েছে সত্য, আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার দরকার রয়েছে সত্য, কিন্তু সেই অভাব দূর করতে হবে কি আমাদের মা-বোনদের ইজ্জত-আব্রুর বিনিময়ে? তা কি গোটা জাতির ইজ্জত-সম্মান জলাঞ্জলি দিয়ে? আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে আমরা আত্মমর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকাকে প্রাধান্য দিব কি না। ধিক সেই বৈদেশিক মুদ্রাকে যা আমাদেরকে হেয় করে তোলে, আমাদের মান-মর্যাদা ইজ্জত-আব্রুকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়!

"জেনে-বুঝেও যা করা হয় না" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল–

- ছাত্রজীবনের সময়কে যথাযথভাবে কাজে লাগানো উচিত।
- ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার অনেক আগ থেকেই পড়াশুনা বাড়িয়ে দেয়া উচিত।
- শিক্ষকদের শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই পাঠদানে গতি আনয়ন করা উচিত।
- যৌবন বয়সেই ইবাদত-বন্দেগীতে মনোযোগী হওয়া উচিত।
- কোন বিষয়েই আগামীর চক্করে না পড়ে, কাল নয় আজই শুরু করা উচিত। অতএব বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনের মূল্যায়ন করা উচিত, অসুস্থতা আসার পূর্বে সুস্থতার মূল্যায়ন করা উচিত, অভাব আসার পূর্বে সচ্ছলতার মূল্যায়ন করা উচিত, ব্যস্ততা আসার পূর্বে অবসরের মূল্যায়ন করা উচিত। সর্বোপরি মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনের মূল্যায়ন করা উচিত।
- রাগের মাথায় স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের বিরুদ্ধে প্রান্তিক কোন পদক্ষেপ নেয়া উচিত নয়।

www.maktabatulabrar.com

- শুরু থেকেই স্ত্রী ও সন্তানদের দ্বীনের পথে চালানোর উদ্যোগ নেয়া চাই।
- স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে, মাতা-পিতা ও সন্তানাদি একে অপরকে সালাম দেয়া চাই।
- বিশেষ ক্ষমতা আইন তুলে দেয়া চাই।
- পুলিশ রিমান্ডের নির্যাতন বন্ধ করা চাই।
- ক্রস ফায়ারের নামে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা চাই।
- হরতাল- অবরোধ নিষিদ্ধ করা চাই।
- মহিলা গৃহকর্মী বিদেশে পাঠানো বন্ধ করা চাই।

জেনে-বুঝেও এসব জিনিসকে দীর্ঘায়িত করা উচিত নয়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যা জানি না, বুঝি না তা জানার ও বুঝার এবং যা জানি ও বুঝি তা আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

জেনে-বুঝেও যা বলা হয় না

পূর্বের পরিচ্ছেদে "জেনে-বুঝেও যা করা হয় না" শিরোনামে আমাদের জীবনের এমন কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা জানা-বুঝা সত্ত্বেও করা হয় না। আমাদের জীবনে এমন অনেক বিষয়ও রয়েছে যা সত্য, ন্যায়ানুগ, যুক্তিযুক্ত তদুপরি প্রয়োজনীয়ও, তবুও সেগুলো বলা হয় না। সত্য, ন্যায়ানুগ ও প্রয়োজনীয় জানা সত্ত্বেও সেগুলো না বলে মুখে কুলুপ এঁটে রাখা হয় অর্থাৎ, জেনে-বুঝেও তা বলা হয় না। এখানে "জেনে-বুঝেও যা বলা হয় না" শিরোনামে এমন কিছু বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে চাই।

জানা-বুঝা সত্ত্বেও প্রয়োজনীয় স্থানে সত্যকথা ব্যক্ত না করা অত্যন্ত ক্ষতিকর পরিণাম দাঁড় করাতে পারে। যারা এরূপ করে তারা দোষ এড়াতে পারে না। আমাদের পূর্বসূরী আকাবির তথা বড় মনীষীদের একজন এভাবে বলেছিলেন,

إن الساكت عن الحق شيطان أخرس، والمتكلم بالباطل شيطان ناطق.

(القول البين الأظهر في الدعوة)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, যে লোক সত্য কথা ব্যক্ত না করে চুপ থাকে সে হচ্ছে বোবা শয়তান। আর যে অন্যায় কথা বলে সে হচ্ছে মুখরা শয়তান।

তবে উল্লেখ্য যে, কথা সত্য ও সঠিক হলে সব স্থানেই তা ব্যক্ত করতে হবে এমনটা জরুরি নয়। সত্য কথা বলার প্রয়োজন দেখা দিলে এবং তা ব্যক্ত করাতে কোন বড় ধরনের সমস্যা হবে না জানলে তখনই তা ব্যক্ত করা জরুরি। অনেক সময় সত্য ব্যক্ত করলে ছোটখাট সমস্যা দেখা দিতে পারে। এরূপ ছোটখাট সমস্যাকে উপেক্ষা করেই সত্য কথা ব্যক্ত করে দেয়া চাই। শরীয়তের দৃষ্টিতে এরূপ সত্য কথা ব্যক্ত করাতে ছওয়াবও রয়েছে। এক হাদীছে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কোন্ জেহাদ শ্রেষ্ঠ? তিনি জওয়াবে ইরশাদ করেছিলেন,

«كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.» (رواه أحمد برقم ١٨٧٣٠ وإسناده صحيح)

অর্থাৎ, জেনে রাখ জালেম শাহীর সামনে সত্য কথা ব্যক্ত করা শ্রেষ্ঠতম জেহাদ বলে গণ্য। (মুসনাদে আহমাদ: হাদীছ নং ১৮৭৩০)

জেনে-বুঝেও বলা হয় না– এর তালিকা অনেক দীর্ঘ। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করছি। যেমন:

বর্তমান আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান গোষ্টি বিশেষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস

বর্তমানে প্রচলিত আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযান মূলত গোষ্টি বিশেষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস। সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানের নামে আমেরিকা ও তার দোসররা সারা দুনিয়ায় মুসলিম নিধনের নিষ্ঠুর যজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। মুসলিম সমাজকে জঘন্য চিত্রায়িত করার জন্য মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব আলেম-উলামাকে সন্ত্রাসী, জঙ্গী ইত্যাকার ভিত্তিহীন, অবান্তর ও জঘন্য অপবাদমূলক বুলিবচনে বিভূষিত করছে। মাদ্রাসা মসজিদকে সন্ত্রাসের আখড়া, অস্ত্রের কারখানা, জঙ্গী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ইত্যাদি আখ্যায়িত করছে। আর মুসলিম দেশগুলোর কর্ণধাররা আমেরিকা ও তার দোসরদের খুশি রাখার জন্য কিংবা বলা যায় তাদের তুষ্টি সাধন করে ক্ষমতায় থাকার লালসায় অথবা ক্ষেত্র বিশেষে নিরপদ্রুব থাকার মানসে

www.maktabatulabrar.com

তাদের সুরে সুর মিলিয়ে যাচ্ছে। দুনিয়ার কেউই যে তাদের বিরুদ্ধে বলছে না তা নয়, কিন্তু যারা বললে কিছুটা হলেও লাভ হত তারা নীরব থাকছেন। অথচ তাদের স্পষ্ট ভাষায় বলা উচিত ছিল, আমেরিকা আজ সারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় সন্ত্রাসী। যেসব ছুতানাতা অজুহাত দিয়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশে তারা আক্রমণ চালাচ্ছে, তা কোনক্রমেই ভিন্ন একটা জনগোষ্ঠির উপর আক্রমণের কারণ হিসাবে যথেষ্ঠ নয়। তদুপরি তাদের কথিত অজুহাতও পরবর্তীতে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হচ্ছে। ১৯৯০ সালে পরিচালিত ইরাক আক্রমণের কথিত অজুহাত তাদেরই বাচনিক অসত্য বলে আখ্যায়িত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার টুইন টাওয়ারে আক্রমণ হল। এই টুইন টাওয়ার ভাঙ্গার দায় চাপিয়ে আফগানিস্তান আক্রমণের যে অজুহাত দাঁড় করানো হয়েছিল তাও বিতর্কের আবর্তেই রয়ে গেছে। সারা বিশ্ব যেখানে ইসরাঈল কর্তৃক ফিলিস্তীনীদের নিধন ও বসতভিটা থেকে তাদের উৎখাতের চেষ্টাকে সন্ত্রাস আখ্যায়িত করছে, সেখানে আমেরিকা তাদের আদর-যত্নে পেলে-পুষে রাখছে। বরং ইসরাঈল যখন ফিলিস্তীনীদের উপর আক্রমণ শুরু করে আর সারা বিশ্ব তার নিন্দা জানাতে থাকে, সেই মুহূর্তে আমেরিকা কোন রাখঢাক না রেখেই সকলকে জানান দিয়ে ইসরাঈলের প্রতি সামরিক সাহায্য বাড়িয়ে দেয়। এই একটা বিষয়ই তো আমেরিকার সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ত্রাসী আখ্যায়িত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

আলেম সমাজ আদৌ সন্ত্রাসী বা জঙ্গী নন

ধর্মপ্রীয় মুসলমান বিশেষভাবে আলেম সমাজকে তারা সন্ত্রাসী জঙ্গী আখ্যায়িত করছে। কিন্তু আলেম সমাজ আদৌ সন্ত্রাসী বা জঙ্গী নন। আমেরিকা ও তাদের দোসরদের প্রচারিত সন্ত্রাস-বিষয়ক ধারণা বিশ্ববাসীকে গলাধকরণ করানোর প্রচেষ্টার পূর্বে শুধু আমাদের দেশেই নয় পৃথিবীর কোনো দেশে কোন আলেমের নামে কোনো আদালতে সন্ত্রাসের মামলা হয়েছে বলে কেউ দেখাতে পারবে না। (ছিটেফোটা বিষয় ব্যতিক্রম হয়েই থাকে।) বরং সব দেশের মুসলানরাই তাদের আলেম সম্প্রদায়কে তুলনামূলক নিরীহ, ভদ্র ও সুশীল লোক বলে গণ্য

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

করে থাকে। অথচ আজ তাঁদেরকেই সন্ত্রাসী রূপে চিত্রিত করার হীন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর আমরা জানা-বুঝা সত্ত্বেও তার বিরুদ্ধে জোরালো গলায় কিছু বলা থেকে বিরত থাকছি।

মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী তৈরি হয় না

মাদ্রাসাতে সন্ত্রাসী তৈরি হয় না। মাদ্রাসা থেকে ফারেগ হওয়া হাজার হাজার আলেম পাওয়া যাবে যারা সারা জীবনে সরাসরি একটা পটকাও চর্ম চোখে দেখেননি। কোন দিন একটা বন্দুক বা পিস্তল হাত দিয়ে ছুয়েও দেখেননি। শত বছরের ইতিহাসে এসব মাদ্রাসায় কোনো দিন অস্ত্রযুদ্ধ হয়নি। গোলাগুলি ফোটাফুটি হয়নি। এমনকি কোনো দিন একটা পটকা পর্যন্ত ফোটেনি। অথচ কলেজ-ভার্সিটিতে অস্ত্রের মহড়া, গোলাগুলি, ফোটাফুটি, কাটাকাটি নিত্য দিনের ব্যাপার। সে হিসাবে তো কেউ বললে কলেজ ভার্সিটিকে অস্ত্রের কারখানা বলতে পারে, বলতে পারে কলেজ ভার্সিটিতে সন্ত্রাসী তৈরি হয়। কলেজ ভার্সিটি বন্ধ করে দেয়া উচিত। তা কেউ বলে না। অথচ উল্টো মাদ্রাসার নিরীহ শিক্ষক ও তালিবে ইলমদের সন্ত্রাসী আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর জেনে-বুঝেও জোরালো গলায় একথাগুলোর প্রতিবাদ জানানো হচ্ছে না।[১]

এদেশের মাদ্রাসাগুলোকে অস্ত্রের কারখানা বলে প্রমাণিত করার জন্য আমেরিকার তল্পীবাহী ভাবশীষ্যরা অনেক চেচামেচি করলেও তার কোনো প্রমাণ তারা দেখাতে পারেনি। কিছু প্রমাণ যা তারা দেয়ার চেষ্টা করেছে, তা রীতিমত হাস্যকর ছেলেমিপনা ছাড়া আর কিছু নয়। এরূপ দু' একটা প্রমাণের কথা উল্লেখ করছি, হাস্যকর কি না তার বিচার পাঠকবর্গই করবেন। একবার দৈনিক জনকণ্ঠে মাদ্রাসা যে অস্ত্রের কারখানা তা প্রমাণ করার জন্য এক মাদ্রাসার কোরবানীর ছুরিগুলোকে একটা ঝুড়িতে সাজিয়ে পত্রিকায় ছেপে দেয়া হয়েছিল যে, দেখুন এই যে অস্ত্রের ভাণ্ডার! অথচ জনগণের কুরবানীর জানোয়ার জবাই করার প্রয়োজনেই মাদ্রাসায় এসব ছুরি রাখা হয়। কোনো দিন এসব ছুরির অপব্যবহার হয়েছে বলেও কেউ দেখাতে পারবে না। প্রয়োজনের তাগিদে প্রত্যেকের বাসাবাড়িতে দা, বটি, ছুরি, চাকু কত কিছুই থাকে। এরূপ প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখায় কেউ কি বাসাবাড়িগুলোকে অস্ত্রের কারখানা বলে চালিয়ে দিতে পারে?

১. এ লেখাটি যখন লিখেছিলাম, তখন পর্যন্ত মাদ্রাসার ছাত্র শিক্ষকদেরকে জঙ্গি সন্ত্রাসী বলেই আসা হচ্ছিল। কিন্তু আল-হামদু লিল্লাহ ২০১৬ সালে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জান খান ও আইজি জনাব বেনজীর আহমদ সাহেব স্পষ্ট ভাষায় বলেন যে, আমরা তদন্তপূর্বক জেনেছি কওমী মাদ্রাসায় কোন জঙ্গী সন্ত্রাসী নেই। বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় তাদের এ বক্তব্য প্রকাশিত হয়।

www.maktabatulabrar.com

আর একবার এক পত্রিকায় এক মাদ্রাসার বোর্ডিংয়ে রান্নার জ্বালানী কাঠ হিসাবে জমা করে রাখা গরাণ কাঠকে লাঠিসোটার স্তুপ বলে সচিত্র রিপোর্ট করা হয়েছিল। আর কারও বাসায় বা পাঠাগারে ধর্মীয় বই-পত্র পাওয়া গেলে সেগুলোকে জঙ্গী বই-পত্র বলে জঙ্গী প্রমাণের গোঁয়ার্তুমি তো অহরহই করা হচ্ছে। এদেশের শত বছরের ইতিহাসে কোনো মাদ্রাসায় একটা পটকা ফুটতেও কেউ দেখেনি। তাহলে কী করে মাদ্রাসা অস্ত্রের কারখানা হয়ে গেল?

অনেকে আবার জেহাদ ও জঙ্গীবাদকে এক সমান্তরালে এনে দেখানোর অপচেষ্টায় লিপ্ত। কারও কাছে জেহাদ বিষয়ক বই-পত্র পাওয়া গেলে যেন তাকে জঙ্গী আখ্যায়িত করার মোক্ষম হাতিয়ার জুটে যাচ্ছে। এমনকি কোন কোন দুর্মুখ কুরআন থেকে জেহাদ বিষয়ক আয়াতসমূহ বাদ দেয়ার কথা পর্যন্ত বলার দুঃসাহস পাচ্ছে এই ভ্রান্ত চিন্তা থেকে যে, এগুলো দ্বারা জঙ্গীবাদ উজ্জীবিত হচ্ছে। অথচ জেহাদ ও জঙ্গীবাদ তথা সন্ত্রাসবাদ এক কথা নয়। জেহাদের প্রবর্তন হয়েছে ইসলামের বিরুদ্ধে ব্যবহার হওয়া শক্তিকে প্রতিহত করার জন্য এবং ইসলামী কর্মকাণ্ড নিরপদ্রুবভাবে চলার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য, সন্ত্রাসীপনার জন্য নয়।

ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিত

জেনে-বুঝেও যা বলা হচ্ছে না, তার মধ্যে আর একটা বিষয় হল ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করার বিষয়। এই যে কলেজ ভার্সিটিতে অস্ত্রের মহড়া, গোলাগুলি, ফোটাফুটি, হল দখল নিয়ে মারামাটি কাটাকাটি, এর

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ হল ছাত্র-রাজনীতি। দলের প্রভাব বিস্তার, দলীয় কোন্দল এসব থেকেই এগুলো হচ্ছে। এটা কোন অস্পষ্ট বিষয় নয়। তবুও ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিত একথা জোরালোভাবে বলা হচ্ছে না। এটাও এমন এক বিষয় যা জেনে-বুঝেও বলা হচ্ছে না। বলা হচ্ছে না এ কারণে যে, তাহলে রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের জন্য জীবন দেয়ার সস্তা লোক থাকে না। ছাত্রসমাজ তথা যুবসমাজের রক্ত গরম থাকে। তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে যে কোনো সময় আন্দোলনে নামিয়ে দিয়ে জীবন বিসর্জন দেয়ানো সহজ, বয়স্ক দলীয় নেতা কর্মীদের দ্বারা যে কাজ নেয়া সহজ নয়। রাজনৈতিক দলের নেতারা যুবকদের যৌবনের শক্তি ও উচ্ছলতাকে ব্যবহার করে নিজেদের দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়, নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। যুব সমাজের শক্তি ও তারুণ্যকে ব্যবহার করার জন্য যুব সমাজকে তারা নানান চটকদার কথা বলে প্ররোচিত করে। কখনও বলে, যুব সমাজই শক্তি, যুগে যুগে যুবসমাজই রক্ত দিয়ে সমাজের পরিবর্তন এনেছে, যুগে যুগে তারাই প্রাণ দিয়েছে, অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এসব কথা শুনে যুবসমাজের রক্ত টগবগ করে ওঠে। তারা তাদের তারুণ্যকে বিসর্জন দিতে পতঙ্গের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ে। এই সুবিধাটা হাতছাড়া হয়ে যাবে বলেই ছাত্র-রাজনীতির বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে না। কে না জানে ছাত্রজীবন তাদের আন্দোলনের সময় নয়, এখন তাদের লেখাপড়ার সময়। এখন তাদের জীবন বিসর্জন দেয়ার সময় নয়, এখন তাদের জীবন গড়ার সময়। এখন তাদের নেতৃত্ব চর্চার সময় নয়, এখন তাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জনের সময়। সকলেই এটা জানে, বোঝে, কিন্তু জেনে-বুঝেও তা বলা হচ্ছে না।

বহু পুরুষ নারী কর্তৃক নির্যাতিত হয়

জেনে-বুঝেও যা বলা হচ্ছে না, তার মধ্যে আর একটা বিষয় হল নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতনের বিষয়। পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতনের খবর তিল পরিমাণ হলেও সেটাকে তাল করে দেখানো হচ্ছে, কিন্তু হাজার

www.maktabatulabrar.com

সংসারে নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতিত হলেও সেকথা কেউ মুখ ফুটে উচ্চারণ করছে না। তবে এখানে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতন হয় বেশিরভাগ শারীরিক আর নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতন হয় বেশিরভাগ মানসিক। নারীদের পক্ষে আইন বেশি শক্ত থাকায় নারীরা পুরুষদের অবাধ্য হতে দুঃসাহস পায়। সেই দুঃসাহস থেকে তারা পুরুষদের মাথায় চড়ে বসে, ঝাঁঝালো ব্যবহার শুরু করে দেয়, কথায় আচরণে অবাধ্য হয়ে ওঠে, স্বামীর শাসন অমান্য করা শুরু করে দেয়। অথচ পারিবারিক শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা ও আদর্শ পরিবার গড়ে তোলার স্বার্থেই স্ত্রীর স্বামীর শাসনাধীনে থাকা সংগত। যদি স্ত্রী স্বামীর মাথায় চড়ে যায় এবং বে-আদব হয়ে যায়, তাহলে স্বামীর প্রতি তার আনুগত্য লোপ পাবে, পরিবারের শান্তি-শৃঙ্খলা বিনষ্ট হবে। স্ত্রীকে এমন হতে দেয়া পরিবারের অনিবার্য ক্ষতি ডেকে আনবে। এজন্যই স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এত ভালবাসা কাম্য নয় যে, তাকে শাসন-ই করতে পারবে না, সে আদব-বিবর্জিত হয়ে উঠবে। ভালবাসার সাথে সাথে আদব দান এবং বিজ্ঞচিত ও পরিমিত শাসনও করতে বলা হয়েছে। স্ত্রীকে আদব দান এবং এমন শাসন করাও স্বামীর কর্তব্য, যাতে স্ত্রী লাইনচ্যুত হয়ে না যায়, যাতে সে বে-আদব হয়ে না ওঠে। স্ত্রীকে কিভাবে শাসন করতে হবে, তার পদ্ধতিও কুরআন শরীফে বলে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা যে সমস্ত নারীদের অবাধ্য হওয়ার ও মাথায় চড়ে যাওয়ার আশংকা কর, (যখন এরকম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে যায়) তখন তোমরা (সংশোধনের নিমিত্তে পর্যায়ক্রমে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ কর। প্রথমে) তাদেরকে উপদেশ দাও, (এতেও সংশোধন না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে) তাদেরকে বিছানায় ত্যাগ কর, (এতেও সংশোধন না হলে তৃতীয় পর্যায়ে) তাদেরকে (আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এরকম মৃদু)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

মারধর কর। (সূরা নিছা: ৩৪) (এতেও সংশোধন না হলে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে, দুই পক্ষের স্যালিশে আন্তরিকভাবে নিষ্পত্তির চেষ্টা করলে আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিল পয়দা করে দিবেন।)

এ আয়াতে স্ত্রীর উপর স্বামীর শাসন কর্তৃত্ব জনিত বিধি বর্ণিত হয়েছে। এতে স্বামীকে স্ত্রীর মুরব্বীর অবস্থানে রাখা হয়েছে। এভাবে ইসলাম পারিবারিক মুরব্বী-মান্যতার বিধান প্রবর্তন করেছে। অথচ আমাদের দেশের প্রচলিত নারী-আইন নারীকে এই অবস্থান থেকে সরিয়ে দিয়েছে। আর এক শ্রেণীর এন জি ও-এর লোকেরা পুরুষের কর্তৃত্ব থেকে নারীকে বের করে আনার নানান কুমন্ত্রণা তো অহরহ দিয়েই যাচ্ছে। অনেকেই বিষয়টা উপলব্ধি করছে, কিন্তু বলিষ্ঠ আওয়াজে তার বিরুদ্ধে বলা হচ্ছে না। জেনে-বুঝেও বিষয়টা কেউ জোরালোভাবে বলছেন না এই ভয়ে যে, পাছে না আবার নারীবাদীরা কোমরে আঁচল জড়িয়ে তার বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়ে।

উল্লেখ্য, স্বামীরা কীভাবে স্ত্রী কর্তৃক নির্যাতিত হয় তার আরও বিবরণ জানার জন্য সামনে "তবুও বলতে হয় তুমি কত ভাল" শিরোনামের লেখাটি পড়ুন।

নারী নেতৃত্ব ইসলামে সমর্থিত নয়

জেনে-বুঝেও যা বলা হয় না এরূপ বিষয় তো রয়েছে অনেক। তার মধ্যে সংক্ষেপে আর একটা বিষয়ের উল্লেখ করছি। তা হল ইসলাম নারী নেতৃত্ব সমর্থন করে না। বোখারী শরীফের ৪৪২৫ ও ৭০৯৯ নং হাদীছে স্পষ্টত বলা হয়েছে,

«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً.»

অর্থাৎ, "যে সম্প্রদায় কোন নারীর উপর তাদের নেতৃত্ব অর্পন করে তারা আদৌ সফলতা লাভ করতে পারবে না।" অন্য ধর্মাবলম্বীদের কথা বাদ দিলাম মুসলিম বিশ্বের অনেকেও মহানবীর এ কথার বাস্তবতা হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করছে, তারা বিষয়টা জানে, বোঝে, কিন্তু জেনে-বুঝেও যথাযথভাবে বলছে না, কিংবা বলা যায় বলতে পারছে না।

মসজিদ-মাদ্রাসার স্টাফদের বেতনে অবিচার চলছে

জেনে বুঝেও যা বলা হয় না– এ পর্যায়ে আর একটা বিষয় উল্লেখ করেই ক্ষান্ত করছি। বিষয়টা হল মসজিদ-মাদ্রাসার স্টাফদের বেতন প্রসঙ্গ। কে না জানে গর আলেম কমিটি দ্বারা পরিচালিত মসজিদ-মাদ্রাসা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের স্টাফদের বেতন-ভাতায় অবিচার হয়। গর আলেম পরিচালকবৃন্দ সাধারণত বলে থাকেন ইনকাম বাড়লে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হবে। ইনকাম বৃদ্ধির পূর্বে তারা উপযুক্ত ও আবশ্যক পরিমাণ বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করতে সাহস পান না। অথচ মানুষের দান ও সহযোগিতা নির্ভর প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক নিয়ম হল প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন দেখেই মানুষ দানের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন যতটুকু, আমদানীও সে অনুপাতেই হয়ে থাকে। মানুষের মনও সেভাবেই গড়ে ওঠে, আল্লাহ তাআলাও সেভাবে ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকেন। তাহলে ইনকাম বাড়লে বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করা হবে– গর আলেম পরিচালকদের এই চিন্তা বাস্তবানুগ চিন্তা নয়। ইনকাম না বাড়লে উপযুক্ত বেতন-ভাতা নির্ধারণ না করার যুক্তি একটা বাস্তবতাবিরোধী স্থূল যুক্তি। এই চিন্তা ও যুক্তির ফলে এমনই হয়ে থাকে যে, পূর্বাহ্নে ইনকামও বাড়ে না, স্টাফদের বঞ্চনা থেকেও মুক্তি লাভ হয় না।

তাছাড়া বহু প্রতিষ্ঠানেই দেখা যায় ইনকাম বাড়লেও বেতন-ভাতা বাড়ানো হয় না। বুঝা গেল আসলে এর পেছনে পরিচালনা কমিটির এই মানসিকতা কাজ করে থাকে যে, হুজুরদের বেতন-ভাতা বৃদ্ধি করলে প্রতিষ্ঠানের কী উন্নতি হল? বরং বর্দ্ধিত অর্থ প্রতিষ্ঠানের কোন বৈষয়িক কাজে লাগাতে পারাকেই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি মনে করা হয়।

প্রয়োজনীয় বেতন-ভাতা না দেয়ায় একদিকে পরিচালকবৃন্দ পাপী হয়ে দাঁড়ায়, অন্য দিকে ন্যায্য বেতন-ভাতা থেকে বঞ্চিত স্টাফদের মানসিক ক্ষুব্ধতা প্রতিষ্ঠানকেও ক্ষতিগ্রস্ত করে তোলে, যার দায়ও পরিচালকবৃন্দ এড়াতে পারেন না। মসজিদ-মাদ্রাসার কমিটিকে মনে রাখতে হবে, ন্যায্য বেতন-ভাতা থেকে স্টাফদের বঞ্চিত করলে তাদের পাপ হবে। এভাবে তারা ছওয়াবের আশায় মসজিদ-মাদ্রাসা পরিচালনা করতে এসে উল্টো পাপী হয়ে দাঁড়াবেন। এ বিষয়টা যে কেউ বোঝে না

www.maktabatulabrar.com

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

তা নয়, অনেকেই জানে, বোঝে, কিন্তু জেনে-বুঝেও এ ব্যাপারে জোরালোভাবে তারা তেমন সোচ্চার হয় না। অদ্ভুত ব্যাপার হল আমরা দেখেছি কমিটির বাইরে থাকা অবস্থায় যারা এ ব্যাপারে একটু আধটু সোচ্চার থাকেন সেই তারাই যখন কমিটিতে যান তখন তারাও কাকতালীয়ভাবে চুপ হয়ে যান বা অন্যদের সুরে সুর মেলাতে শুরু করেন।

"জেনে-বুঝেও যা বলা হয় না" শিরোনামের আলোচনার সারকথা হল সত্য, ন্যায়ানুগ ও প্রয়োজনীয় জানা সত্ত্বেও তা ব্যক্ত না করে মুখে কুলুপ এঁটে রাখা অন্যায়। অতএব আমাদের জোরালোভাবে নিম্নোক্ত কথাগুলো ব্যক্ত করা চাই।

- কথিত সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানের হোতা আমেরিকা ও তার দোসররাই আজ বিশ্বের প্রকৃত বড় সন্ত্রাসী।
- মুসলমান জাতি বিশেষভাবে আলেম সমাজ সন্ত্রাসী জঙ্গী নন।
- জেহাদ ও জঙ্গীবাদ এক কথা নয়।
- মসজিদ মাদ্রাসাতে সন্ত্রাসী তৈরি হয় না বরং নিরীহ, ভদ্র ও ধর্মপ্রাণ মানুষ তৈরি হয়।
- মসজিদ মাদ্রাসা অস্ত্রের কারখানা কিংবা জঙ্গী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নয়।
- ছাত্র-রাজনীতি বন্ধ করে দেয়া উচিত।
- নারী বিষয়ক আইনে ভারসাম্য এনে নারী কর্তৃক পুরুষ নির্যাতনের উৎস বন্ধ করা চাই।
- নারী নেতৃত্ব থেকে মুক্তি চাই।
- গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য মসজিদ-মাদ্রাসার স্টাফদের উপযুক্ত বেতন/ভাতা নির্ধারণ করা চাই।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যা সত্য বলে জানি ও বুঝি প্রয়োজনীয় স্থানে তা ব্যক্ত করার তাওফীক দান করুন। আমাদেরকে সঠিক চিন্তা-চেতনা দান করুন। আমীন!

এতক্ষণ "জেনে-বুঝেও যা বলা হয় না" শিরোনামের অধীনে যে ধরনের বিষয় উল্লেখ করলাম, সেই ধরনের আরও কিছু বিষয় উল্লেখ

www.maktabatulabrar.com

করার রয়েছে, এখন তার কিছুটা উল্লেখ করতে যাচ্ছি। এখন যেগুলো উল্লেখ করতে যাচ্ছি সেগুলোও মূলত জেনে বুঝেও বলা হয় না পর্যায়ের। তবে পার্থক্য এই যে, সেগুলোতে শুধু জেনে-বুঝে বলা থেকে ক্ষান্ত থাকা হয় তা-ই নয় বরং সেগুলো মন্দ হওয়া সত্ত্বেও উল্টো সেগুলো সম্বন্ধে বলতে হয় ভাল। যেমন:

তবুও বলতে হয় তুমি কত ভাল!

আমাদের সমাজে এমন অনেক দাজ্জাল স্বামী আছে যারা স্ত্রীদের প্রতি নিত্য জুলুম-নির্যাতন চালায়। অথচ সেই স্ত্রীরা তা মুখ ফুটে কারও কাছে বলতেও পারে না, পাছে না আবার জুলুম নির্যাতন বেড়ে যায় এই অজুহাতে যে, আমার বদনাম করলি কেন? এমনকি স্বয়ং স্বামীকেও কিছু বলতে পারে না এই ভয়ে যে, তাহলে স্বামী একেবারে ঘর ছাড়া করে দিতে পারে যে, আমি এত খারাপ! তাহলে তোর যে নাং পছন্দ হয় তার কাছে চলে যা। অবশ্য স্ত্রীও যদি তেমন দাজ্জালনী হয় কিংবা তেমন ভদ্র শালীন খান্দানের না হয় এবং দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় আর সামাজিক লজ্জা-শরমের বিষয়টাও মাথায় না থাকে। তাহলে কোমরে শাড়ির আঁচল পেঁচিয়ে সেও স্বামীকে দুহাত দেখে নিতে পারে, যদি তার ঘর ভাঙ্গার পরের সম্ভাব্য জটিলতা নিয়ে কোন ভাবান্তর না থাকে। তবে বস্তিবাসিনী কিছু ব্যতিক্রমী নারী ছাড়া এমনটা কমই দেখা যায়। নিরীহ খান্দানী নারীদের পক্ষে কিংবা যারা সামাজিক লজ্জা-শরমের বিষয়টি মাথায় রাখে তাদের পক্ষে কিংবা যেকোনো মূল্যেই হোক ঘর রক্ষার চিন্তা যাদের মাথায় প্রবল থাকে তাদের পক্ষে সাধারণত স্বামীকে দুহাত দেখে নেয়ার মত এমনটা ক্ষীপ্ত হওয়া সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। সেরূপ নারীকে নীরবে স্বামীর জুলুম-নির্যাতন সয়েই যেতে হয়। আর স্বামীর মন্দ কথা, মন্দ আচরণ এমনকি জুলুম-নির্যাতন সত্ত্বেও তাকে বলে যেতে হয় তুমি যে কত ভাল! এ–ই হল "তবুও বলতে হয় তুমি কত ভাল!"

সমাজের এই শ্রেণীর নারীরা অনেকটা অসহায়। তবে পুরোপুরি অসহায় নয় এজন্য যে, তাদের পক্ষে বলার মত অনেক লোক দাঁড় না

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

হলেও কিছু লোক অবশ্যই দাঁড় হয়। এই নারীরা চিৎকার করে তাদের জুলুম-নির্যাতনের কাহিনী জানান দিতে না পারলেও নীরবে চোখের জল ফেলতে পারে। সেই চোখের জলে তাদের কাহিনী অন্যদের পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। এক সময় অল্প-বিস্তর হলেও তাদের পক্ষে বলার লোক দাঁড় হয়। এলাকার মোড়ল-মাতবররা দাঁড় হয়, সামাজিক বিচার হয়। সাংবাদিক-রিপোর্টাররা দাঁড় হয়, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি প্রিন্ট মিডিয়া এবং রেডিও টেলিভিশন, ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি ইলেক্ট্রোনিক মিডিয়ায় তাদের কাহিনী আসে। এভাবেও কখনও কখনও সেই নারীরা অল্প-বিস্তর হলেও প্রতিকার পায়। আবার অনেক সময় আইনের আশ্রয় নিলেও তারা প্রতিকার পায়। কারণ নারী অবলা অসহায়– এই অজুহাতে আইন তাদের পক্ষেই বেশি জোরালো ও সক্রীয়। কিন্তু সমাজের যে পুরুষরা স্ত্রীদের দ্বারা নির্যাতিত হয়, সেই পুরুষরা একটু কাঁদতেও পারে না, দু'একজন ব্যতিক্রম ছাড়া এরকম পুরুষরা কোনোভাবে কাউকে জানান দিতেও পারে না। তাদের কাহিনী চির অজানার অন্তরালেই রয়ে যায়। কেউ তাদের পক্ষে এগিয়ে আসে না। আইনও তাদের পক্ষে না থাকায় আইনের আশ্রয়ও তারা নিতে পারে না। কোনোভাবেই তারা প্রতিকার পায় না। স্ত্রীরা তাদের প্রতি জুলুম-নির্যাতন করেই যেতে থাকে আর তাদেরকে বলে যেতে হয়, ওগো গিন্নী, তুমি যে কত ভাল!

কেউ ভাবতে পারেন পুরুষরা আবার নির্যাতিত হয় কী করে? তাহলে শুনুন পুরুষরা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয় না, তারা নির্যাতিত হয় মানসিকভাবে। একজন লোকের কাহিনী বলি, বিষয়টার কিছুটা খোলাসা হবে। আমি তখন নাখালপাড়া বাইতুল আতীক জামে মসজিদে (ছাপড়া মসজিদে) ইমামত করি। একদিন গভীর রাতে সমাজের একজন নামী-দামী মানুষ এসে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুললেন। প্রথমেই আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলেন। বললেন, হুজুর! আমি এই গভীর রাতে আসার কারণ হল অন্য সময় এলে আমার সঙ্গে আরও লোকজন এসে পড়ত, হয়তো সাংবাদিক-রিপোর্টাররাও এসে পড়ত। আমি যে বিষয়টার জন্য এসেছি তা ফাঁস হয়ে যেত। আর তা

www.maktabatulabrar.com

হলে আমার অপমানের অন্ত থাকত না। আমি যে কতটা মানসিক যন্ত্রণায় আছি তা আমি আপনাকে কীকরে বোঝাব? আমাকে বাঁচার মত একটা পরামর্শ দিন। আমি বাঁচতে না চাইলে আত্মহত্যা করে মরব তারও উপায় নেই, তাহলেও আমার বিষয়টা পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি মিডিয়াতে এসে যাবে, সমাজের মানুষ জানবে, তাহলে আমার ছেলে-মেয়েরা সমাজে মুখ দেখাবে কীকরে? ওদের দিকে তাকিয়ে আমি আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে পারছি না। আবার আমার স্ত্রী যা করে যাচ্ছে তা সহ্যও করতে পারছি না। কাউকে মুখ খুলে কিছু বলতেও পারছি না, পাছে না আবার ব্যাপকভাবে তা জানাজানি হয়ে যায়। একাকী কাঁদলেও যে প্রতিকার হবে বিষয়টা তেমনও নয়। বিষয়টা হল আমার স্ত্রী আমার ছোট ভাইয়ের সাথে অবৈধ দৈহিক সম্পর্ক চর্চা করে যাচ্ছে। আমি বাধা দেয়া সত্ত্বেও মানছে না। শাসন করতে গেলে, কিংবা কিছু ভাল-মন্দ বলতে গেলে চোখের জল নাকের জল এক করে চিৎকার করে কাঁদা জুড়ে দিতে যাচ্ছে, তুমি আমাকে অহেতুক সন্দেহ করছ! আমি এই জীবন রাখব না। আত্মহত্যার হুমকি দিচ্ছে এই বলে যে, আমি মানুষকে জানান দিয়ে আত্মহত্যা করব, আমি মানুষকে বলে যাব, স্বামীর টর্চার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার পথ বেছে নিলাম। সে আরও যে আমার কতটা অবাধ্য হয়ে চলছে! সামাজিক মান-ইজ্জতের ভয়ে কোনো বিষয়েই তাকে শাসন করতে পারছি না, আবার না জোর গলায় চিৎকার দিয়ে বসে আর মানুষ জেনে ফেলে স্ত্রী আমার অবাধ্য। মানুষ আমাদের পারিবারিক বিপর্যয়ের কথা জেনে যাবে এটাকেও আমি আমার জন্য চরম অপমানের মনে করছি, যা আমার সহন ক্ষমতার বাইরে। আমার স্ত্রী বোঝে আমি সামাজিক মান-ইজ্জতের ভয়ে তার ব্যাপারে উচ্চ-বাচ্য করতে পারব না। এটাকেই আমার দুর্বলতা ভেবে সে এভাবে আমার অবাধ্য হয়ে উশৃঙ্খল হয়ে চলার দুঃসাহস পাচ্ছে। এভাবে আমি চরম মানসিক নির্যাতনের মধ্যে আছি। হুজুর! আমার এখন কী উপায়? আমি তখন তাকে যে কৌশল শিখিয়ে দিয়েছিলাম তা এখানে আর উল্লেখ করলাম না। এ ঘটনা বলে শুধু এতটুকু দেখাতে চাইলাম এ-ই হল স্ত্রী

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কর্তৃক স্বামীকে মানসিক নির্যাতনের একটু নমুনা। এ-ই হল স্ত্রীর হাজার দোষ ও নির্যাতন সত্ত্বেও স্বামীকে বলে যেতে হয় তুমি কত ভাল! এ-ই হল "তবুও বলতে হয় তুমি কত ভাল!"

আর একজন লোকের কাহিনী বলি, তাহলে স্বামীরা কীভাবে স্ত্রীদের দ্বারা মানসিকভাবে নির্যাতিত হয় তা আরও খোলাসা হবে। লোকটি খুব নিরীহ প্রকৃতির জ্ঞানী মানুষ। স্ত্রীটা অত্যন্ত চটা মেজাযের। পদে পদে ভুল করে থাকে। আর ভুল ধরতে গেলেই বাঁধে বিপত্তি। তাদের দু'জনের কিছু কথোপকথন শুনুন।

স্ত্রী ছেলেমেয়েকে সর্বক্ষণ ঝাঁঝালো ভাষায় বকাঝকা করে বলে স্বামী একদিন বলল: এভাবে সর্বক্ষণ ছেলেমেয়েদের সাথে ঝাঁঝালো স্বরে কথা বললে, প্রত্যেকটা পদে এভাবে ছেলেমেয়েদের বকাঝকা করলে ছেলেমেয়েদের স্বভাব কর্কষ হয়ে উঠবে, ওদের মেজায খিটখিটে হয়ে যাবে। একটু নরম ভাষায় কি বলা যায় না?

: আমি নরম ভাষায় কথা বলতে জানি না।

: না জানলে এখন থেকে জানার চেষ্টা কর, শেখার চেষ্টা কর। এখনও তো জানার শেখার চেষ্টা করা যায়। মানুষের শেখার বয়স তো মৃত্যু পর্যন্ত।

: আমি জানি না, আমি মূর্খ মেয়ে, তা এমন মূর্খ মেয়েকে বিয়ে করেছিলে কেন?

: আহা গিন্নী, তুমি ভুল বুঝছ কেন, আমি তো তোমার না জানার জন্য তোমাকে তিরস্কার করছি না। আমি তো তোমাকে বলছি না মূর্খ। মানুষের কি ভুল হয় না? শিক্ষিত জ্ঞানী লোকদেরও তো ভুল হতে পারে। তুমি কি ভুলের উর্ধ্বে? তুমি আমি কেউই ভুলের উর্ধ্বে নই। তোমার কোন ভুল হলে তা শুধরে দেয়াও কি খারাপ? একটু বোঝার চেষ্টা কর প্লিজ!

: আমার এত ভুল, আমি এত না-বুঝ, তাহলে আমাকে তালাক দিয়ে দাও। তুমি কোন জ্ঞানী বুদ্ধিমতী মেয়ে বিয়ে করে তাকে নিয়ে ঘর-সংসার কর। আমি তোমার ঘর-সংসার করার যোগ্য না।

www.maktabatulabrar.com

: (মনে মনে ভাবল, এত মোলায়েমভাবে পালিশ দিয়ে কথা বলেও লাইনে আনা গেল না, তাহলে কি ঝগড়াই করতে হবে। না, যাকগে) আচ্ছা, আমারই ভুল হয়েছে, তুমি সঠিক রয়েছো।

এ-ই হল স্ত্রীর হাজার দোষ সত্ত্বেও স্বামীকে বলে যেতে হয়, তুমি কত ভাল! এ-ই হল "তবুও বলতে হয় তুমি কত ভাল!"

এরপর বেশ কয়েক বছর গড়িয়ে গেল। সর্বক্ষণ ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে উঠতে বসতে বকাঝকা ও অন্যায় শাসানীর ফলে সত্যিই এক সময় ছেলে-মেয়েদের স্বভাব খিঠখিটে হয়ে উঠল। তারা মায়ের সঙ্গে কর্কষ ব্যবহার করতে শুরু করল। তখন স্ত্রীর ভুল বুঝতে পারার দিন এল। কিন্তু স্ত্রীর বুঝ এল না। একদিন স্ত্রী তার সঙ্গে মেয়ের কর্কষ ব্যবহার করার মুহূর্তে স্বামীকে বলে উঠল,

: শুধু আমারই ভুল ধরতে পার, শুধু আমাকেই সংশোধন করতে পার, ছেলেমেয়েরা কর্কষ ব্যবহার করে তা ছেলেমেয়েদের ভুল ধর না কেন?, ছেলেমেয়েদেরকে সংশোধন কর না কেন? স্বামী ভাবল এখন যদি বলি, এটা তো তোমার কর্মনীতির ফসল, তোমারই ভুলের খেসারত, তাহলে মেয়ে আরও লাই পেয়ে যাবে। মেয়ের সামনে এভাবে তার মাকে শাসালে এ দেখে সে মায়ের সঙ্গে আরও দুর্ব্যবহার করতে উৎসাহিত হবে। আবার যদি মেয়েকে শাসাতে যাই, তাহলে মেয়ে বুঝবে আম্মু তো আমাদের প্রতি অবিচার করেই থাকেন, আব্বুও আমাদের প্রতি অবিচার করলেন, যাকগে এই বাড়ি আর থাকব না, যেদিকে দু' চোখ যায় সেদিকেই চলে যাব। কিংবা এরূপ অবস্থায় নারী জাতি অনেক সময় আত্মহত্যার পথও বেছে নেয়। যদি মেয়ে সেরূপ কিছু ভাবে! স্বামী বেচারা ভাবতে লাগল এখন আমি কাকে কী বলতে পারি? এরই মধ্যে স্ত্রী বলে উঠল,

: এখন তো চুপ থাকবে, এভাবে ছেলেমেয়ের লাই দিয়ে তুমিই ওদের খারাপ করেছো।

: তুমি সোজাটা বোঝ না গিন্নী, এই হল আমার দুঃখ!

: না, আমরা বাঁকাটাই বুঝি, জান না আমরা বাঁকা হাড়ের তৈরি?

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

: আহা-রে! আমি তো তোমাকে বাঁকা বলিনি, সব নারী কি আর সমান? তোমার কিছু গুণ না থাকলে কি আর আমি তোমাকে এত পছন্দ করি?

এ-ই হল স্ত্রীর হাজার দোষ সত্ত্বেও স্বামীকে বলে যেতে হয়, তুমি কত ভাল! এ-ই হল "তবুও বলতে হয় তুমি কত ভাল!"

এভাবে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর গড়াতে থাকে। স্বামী তার সঙ্গে কৃত স্ত্রীর আচরণ তো সহ্য করেই যায়, কোনো প্রতিকার করতে পারে না, উপরন্তু চোখের সামনে স্ত্রী ছেলেমেয়েদের বিগড়ে দিচ্ছে, তারও কোনো প্রতিকার করতে পারে না, শুধুই মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করে যেতে থাকে। এভাবে স্ত্রী ঐই স্বামীকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে যেতে থাকে। এ-ই হল স্ত্রীদের দ্বারা স্বামীরা কীকরে মানসিকভাবে নির্যাতিত হয় তার কিঞ্চিত বিবরণ।

যে স্বামীরা স্ত্রীদের নির্যাতন করে, তাদের নির্যাতনের হাতিয়ার হল হাত, পা, লাঠি-সোটা– মাত্র এই কয়েকটা। আর যে স্ত্রীরা স্বামীদের নির্যাতন করে তাদের নির্যাতনের হাতিয়ার মাশাআল্লাহ বহু রকমের। তার মধ্যে কয়েকটা হলঃ চিৎকার করে কাঁদন জুড়ে দেয়া, তোমার ঘর করব না বলে হুমকি দেয়া, আত্মহত্যার হুমকি দেয়া, যেদিকে দুই চোখ যায় সেদিকে চলে যাওয়ার হুমকি দেয়া, ছোট ছেলেমেয়েদের মারধর করে ঘরের মধ্যে হুলস্থূল কাণ্ড বাধিয়ে দেয়া, রান্না-বান্না বন্ধ করে দেয়া, অঘোষিত অনশন শুরু করা ইত্যাদি। এছাড়া মুখে কুলুপ এঁটে রাখা, চেহারায় কাল মেঘের সমাবেশ ঘটানো, বিছানায় গিয়ে নিতম্বের দিক প্রদর্শন– এসব আটপৌরে হাতিয়ার তো রয়েছেই। গোঁয়ার-গোবিন্দ স্বামী হলে ভিন্ন কথা, নতুবা সামাজিক মান-মর্যাদার ব্যাপারে যে স্বামীরা সচেতন, ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যত চিন্তায় ঘর রক্ষার জন্য যে স্বামীরা ত্যাগ স্বীকারের পথ বেছে নেয়াকেই প্রাধান্য দিতে চায়, সে স্বামীদের পক্ষে এসব হাতিয়ারের মোকাবেলা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তারা ঐ স্ত্রীদের কাছে হার মেনে নেয় আর মানসিক যন্ত্রণায় মনে মনে কাঁতরাতে থাকে।

www.maktabatulabrar.com

যা মনে হয় বুঝি আসলে বুঝি না

মানুষের মেধা ও ধারণাক্ষমতা সীমিত। তাই একজনের পক্ষে সবকিছু বুঝা সম্ভব নয়। সব বিষয়ে একজনের জ্ঞান থাকা সম্ভব নয়। এটা এমন একটা মোটা কথা যা বেশি ব্যাখ্যা করে বোঝানোর দরকার পড়ে না। একজন মানুষের সবকিছু জানা থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। অথচ আমাদের অনেকেরই ভাবখানা এমন যেন সবকিছুই বুঝি। যেমনঃ রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি সকলেই যেন বুঝি, সকলেই তাই রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে মন্তব্য করি। চিকিৎসা শাস্ত্রও যেন সকলেই বোঝে বলে মনে হয়, তাই কেউ এ ব্যাপারে মন্তব্য করতে কম যায় না। আপনি আপনার কোন রোগ-ব্যধির কথা কয়েকজন লোকের সামনে ছাড়ুন, দেখবেন কেউ সে ব্যাপারে মুখ খুলতে বাদ থাকবে না। একেকজন একেক রকম চিকিৎসার সাজেশন দিতে থাকবে, যেন প্রত্যেকেই এ শাস্ত্রের দক্ষ ব্যক্তি। এভাবে যেকোনো লোকের কাছে যেকোনো বিষয়ে জানতে চাইলে সে বিষয়ে তার জানা না থাকলেও মন্তব্যে তিনি পিছিয়ে থাকবেন না। কেউ যেন এ কথা বলতে নারাজ, আমার এ বিষয়ে ভাল জানা নেই, যারা এ বিষয়ে ভাল জানেন, বোঝেন তাদের কাছে রুজু করুন। বিশেষ করে ধর্মীয় কোন বিষয় এলে তো মাশা আল্লাহ সবাই যেন বড় বড় মুহাদ্দিছ, মুফাসসির, মুফতী বনে বসেন। মন্তব্য করতে কেউ কারও থেকে কম চান না। অথচ নিয়ম ছিল যিনি যে শাস্ত্রের ব্যক্তি নন সে ব্যাপারে তিনি মুখ বন্ধ রাখবেন। যে বিষয়ে জানা নেই সে বিষয়ে জানি না বলাই হচ্ছে জ্ঞানের পরিচয়। কেননা তিনি কোন্‌টা জানা নেই তা জানেন, তাই তার জ্ঞান আছে ধরা হবে। পক্ষান্তরে যে বিষয়ে জানা নেই সে বিষয়ে জান্তার অভিব্যক্তি ঘটানো– এটা একদিকে যেমন প্রতারণা অন্যদিকে নির্বোধ হওয়ার পরিচায়ক। কেননা তিনি যে জানেন না একথা তার জানা নেই। তাই তিনি নির্বোধই বটে। এজন্যই হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন,

مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلْ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلْ اللَّهُ أَعْلَمُ، فَإِنَّ مِنْ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَمُ لَا أَعْلَمُ. فَإِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ﴿**قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ.**﴾ (صحيح البخاري حديث رقم ٤٧٧٤.)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, কোন বিষয়ে কারও জানা থাকলে সে তা বলবে। আর যার জানা নেই সে বলবে, "আল্লাহই ভাল জানেন।" কেননা যে বিষয়ে জানা নেই সে বিষয়ে জানি না বলাই হচ্ছে জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন, "তুমি বলে দাও, আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা লৌকিকতা করে। (বোখারী: হাদীছ নং ৪৭৭৪)

এ রেওয়ায়েতের শেষে কুরআনের আয়াতের বরাতে "আমি ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত নই যারা লৌকিকতা করে" কথাটা বৃদ্ধি করে ইংগিত করা হয়েছে যে, না জানা সত্ত্বেও জানার ভাব দেখানো– এটার লোক প্রচলন রয়েছে, এটা এক ধরনের লৌকিকতা, আর এমন লৌকিকতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ নয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ فَقَالَ : **نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ**. (بخاري برقم ٧٢٩٣)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হযরত ওমর (রা.)–এর নিকট ছিলাম। তখন তিনি বলেছিলেন, আমাদেরকে লৌকিকতা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

(বোখারী; হাদীছ নং ৭২৯৩)

এতক্ষণ আলোচনা করা হল কোন বিষয় জানা না থাকলে সে বিষয়ে চুপ থাকতে হয় কিংবা প্রয়োজনে লৌকিকতা বর্জন করে অকপটে বলে দিতে হয় আমার জানা নেই। অনেক সময় কোন মজলিসে কোন একটা বিষয় উত্থাপিত হয়েছে, যে বিষয়ে অনেকেরই কম-বেশ জানা আছে, সেরূপ ক্ষেত্রে কী করণীয়? সেরূপ ক্ষেত্রে করণীয় হল সে বিষয়টা যার বেশি জানা আছে তাকেই সে বিষয়ে বলতে দিবে। অর্থাৎ, যে বিষয়ে যে ব্যক্তি বেশি দক্ষ সে বিষয়ে তাকেই বলতে দিবে। এ থেকে বুঝা গেল যারা আলেম নয়, দ্বীনী বিষয়ে উলামায়ে কেরামের সামনে তারা চুপ থাকবে, উলামায়ে কেরামকেই সে বিষয়ে বলতে দিবে। কেননা

www.maktabatulabrar.com

দ্বীনী বিষয়ে তাদের চেয়ে উলামায়ে কেরামই অধিক অবগত। তাই তারা দ্বীনী বিষয়ে উলামায়ে কেরামের আগে বেড়ে কোন কথা বলবে না। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾.

অর্থাৎ, হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের আগে বেড়ে যেয়ো না (অর্থাৎ, আগে বেড়ে কোন কিছু বল না, আগে বেড়ে কোন কিছু করো না।) [সূরা হুজুরাত: ১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, উলামায়ে কেরাম রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওয়ারিছ। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ক্ষেত্রে যে হুকুম উলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও সেই হুকুম। অতএব আল্লাহর রসূলের আগে বেড়ে কথা বলা যেমন নিষেধ তেমনি (দ্বীনী বিষয়ে) উলামায়ে কেরামের আগে বেড়েও কথা বলা নিষেধ।

না বুঝে দৌড়-ঝাপ দেয়ার প্রবণতা

না বুঝে দৌড়-ঝাপ দেয়ার প্রবণতা অনেকের। এটা অনেক সময় চিন্তার ভুলের কারণেও হয় আবার চেতনার ভুলের কারণেও হয়।

চিন্তার ভুলের কারণে না বুঝে দৌড়-ঝাপ দেয়ার উদাহরণ হল বর্তমান যুগে জেহাদের নামে ইসলাম-বিরোধীদের উপর ব্যক্তিগত বা দলগতভাবে আক্রমণ করা, তাদের হত্যা করা। এ ক্ষেত্রে চিন্তার ভুলটা হল তারা জেহাদ কি তা ভাল করে চিন্তা করে দেখেনি তথা ভাল করে বোঝেনি। জেহাদের শর্ত-শরায়েত কি তা তারা জানে না। তাদের মধ্যে ইসলামের জন্য চেতনা জাগ্রত হয়েছে, ইসলামের জন্য দরদ উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। এই চেতনা ও দরদ ঠিক হলেও ইসলাম-বিরোধীদের মোকাবেলা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে তাদের সুষ্ঠু জ্ঞানের অভাব রয়েছে। তাই তারা ব্যক্তিগতভাবে বা দলগতভাবে ইসলাম-বিরোধীদের নিধনের যে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে তা সঠিক নয়। যারা ইসলামের শত্রুদের মারার জন্য আত্মঘাতি হামলা চালায় এবং নিজেদের হাতে নিজেদের জীবনের বিনাশ ঘটায় তাদের চিন্তায়ও ভুল রয়েছে। কারণ আত্মহত্যা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কোনভাবেই ইসলাম-সমর্থিত নয়। তারা মনে করছে জীবন দিতে পারলেই বড় কিছু করা হল। কিন্তু নিজের হাতে নিজের জীবন দেয়া যে আত্মহত্যা এটা তারা বুঝতে ভুল করছে। তাই এটাও চিন্তার ভুলের পর্যায়ভুক্ত। ইসলামের জন্য জীবন দেয়ার চেতনা ভাল, কিন্তু জীবন দেয়ার সঠিক পদ্ধতি কি তা তারা বুঝতে ভুল করছে। তাই এটা তাদের বুঝ তথা চিন্তার ভুল।

আর চেতনার ভুলের কারণে না বুঝে দৌড়-ঝাপ দেয়ার উদাহরণ তো আমাদের নিত্য জীবনে অহরহ দেখা যায়। আপনার চাকর, অফিসবয়, খাদেম বা ছাত্রকে কোন একটা কিছু করার অর্ডার দিয়েছেন, সে অর্ডার ভাল করে শোনার পূর্বেই অর্ডার পালন করার জন্য দিল দৌড়, আর করে আসল ভুল। যেভাবে কাজটি চেয়েছেন সেভাবে সে তা করে আসতে পারল না, ভুল করে এল। এক্ষেত্রে আপনার চাকর বা অফিসবয় বা খাদেম বা ছাত্রের মধ্যে চিন্তার কোন ভুল ছিল না। আপনার আদেশ শিরোধার্য, আপনার আদেশ তাকে মানতে হবে- এই চিন্তায় তার কোন ভুল নেই। কিন্তু নির্দেশ মানার চেতনা তথা জযবা, আবেগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সময়ের আগে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। এটাই হচ্ছে চেতনার ভুল। পূর্ণ নির্দেশ ভাল করে বুঝার পর যদি কাজটা সম্পন্ন করার চেতনা উজ্জীবিত হত, তাহলে চিন্তা ঠিক থাকার পাশাপাশি চেতনাও সঠিক সময়ে উজ্জীবিত হওয়ায় ঠিক হত, তাহলে কাজটাও সুচারুরূপে সম্পন্ন হত।

সময়ের আগে চেতনা উজ্জীবিত হওয়ার আর একটা উদাহরণ হল প্রচলিত একটা প্রবাদ। "চিলে কান নিয়ে গেছে" শুনে সাথে সাথেই চিলের পেছনে দৌড় দেয়া হচ্ছে সেই প্রবাদ। চিলে যদি কান নিয়েই যায় তাহলে তা উদ্ধার করার জন্য দৌড় দেয়ার চিন্তা তো ভুল নয়। কিন্তু ভুল হল সত্যি সত্যি কান নিয়ে গেছে কি না তা ভাল করে না বুঝেই দৌড় দেয়া। এখানে কান উদ্ধার করার চিন্তা ভুল নয় বরং কান উদ্ধার করার চেতনা তথা জযবা, আবেগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা সময়ের আগেই উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে– এভাবে এটা চেতনার ভুল।

www.maktabatulabrar.com

না বুঝে দৌড়-ঝাপ দেয়ার প্রবণতা আমাদের মধ্যে অনেক বেশি। জীবনের বহু ক্ষেত্রে এর প্রতিফলন দেখা যায়। যেমন:

ইসলামের নামে হরতাল অনশন ইত্যাদি ডাকা হল, না বুঝেই দৌড়-ঝাপ শুরু হয়ে গেল। শুধু ইসলাম শব্দ শুনেই দৌড়-ঝাপ শুরু হয়ে গেল। হরতাল, অনশন আদৌ জায়েয কি না তা না বুঝেই দৌড়-ঝাপ শুরু হয়ে গেল।

ইসলামের নামে জেহাদের ডাক দেয়া হল, দৌড়-ঝাপ শুরু হয়ে গেল, আদৌ ভেবে-চিন্তে দেখা হল না কে ডাক দিল, যে জেহাদের ডাক দিয়েছে সে জেহাদের ডাক দেয়ার অথরিটি কি না, কেন ডাক দিল তার উদ্দেশ্যে কোন গলদ আছে কি না, শর্ত শরায়েত ইত্যাদির বিচারে এটা সত্যিকার জেহাদ বলে আখ্যায়িত হবে কি না ইত্যাদি।

ইসলামের জন্য জীবন দিতে হবে, ইসলামের শত্রুকে নিধন করতে হবে তা আত্মঘাতি হামলা করে হলেও– এমন আহবান শুনে দৌড়-ঝাপ শুরু হয়ে গেল, আদৌ ভেবে দেখা হল না এভাবে ব্যক্তিগতভাবে বা বিশেষ কোন দলীয় ব্যানারে কাউকে হত্যা করার অনুমতি ইসলামে আছে কি না, কিংবা এভাবে আত্মঘাতি হামলা করে নিজেকেও মেরে ফেলা যে আত্মহত্যা, আর ইসলাম আত্মহত্যার অনুমতি দেয়নি। সহীহ হাদীছে স্পষ্টভাষায় যে আত্মহত্যা করবে তার জাহান্নামে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।

না বুঝে জেহাদে ঝাপিয়ে পড়া হচ্ছে অন্ধত্বের পতাকাতলে লড়াই করা, এবং এরূপ লড়াইয়ে মৃত্যুবরণ পাপের মৃত্যুবরণ। এ ব্যাপারে সুনানে ইবনে মাজার এক সহীহ হাদীছে এসেছে–

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : «**مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَّةٍ يَدْعُوْ إلى عَصَبِيَّةٍ أَوْ يَغْضَبُ لِعَصَبِيَّةٍ فَقِتْلَتُه جَاهِلِيَّةٌ.**»

(سنن ابن ماجة حديث رقم ٣٩٤٨)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অন্ধত্বের পতাকাতলে লড়াই করে –গোত্রীয় বা দলীয় চেতনার দিকে আহবান জানায়, কিংবা

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

গোত্রীয় বা দলীয় চেতনায় আক্রোশী হয়ে ওঠে– তার মৃত্যু জাহিলী যুগের মৃত্যু তথা কুফ্‌রী মৃত্যু। (ইবনে মাজা, হাদীছ নং ৩৯৪৭)

এ হাদীছে যে অন্ধত্বের পতাকাতলে লড়াই করার কথা বলা হয়েছে, মুহাদ্দিছীনে কেরাম তার ব্যাখ্যায় বলেছেন, অর্থাৎ, উদ্দেশ্য না বুঝে লড়াই করা। যাদের ডাকে যুদ্ধে যোগ দেয়া হবে তাদের অবস্থা অস্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও তাদের ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের সংগে মিলে লড়াই করা।

না বুঝে দৌড়-ঝাপ দেয়ার আর একটা উদাহরণ হল– এবার অমুক মার্কায় অমুক ব্যক্তি নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে, বা অমুক দলের প্রার্থী অমুক, ব্যস হুজুগের মাথায় তার পেছনে দৌড়-ঝাপ শুরু হয়ে গেল, ধুমছে তাকে ভোট দেয়া শুরু হল। ভেবে দেখা হল না, ভোট সম্পর্কিত মাসআলা অনুসারে তাকে ভোট দেয়া আদৌ ঠিক হবে কি না। ঠিক না হলে তার পেছনে দৌড়-ঝাপ দেয়াও তো ঠিক নয়।

এসব বিষয় হচ্ছে না বুঝেই এবং ভেবে-চিন্তে না দেখেই দৌড়-ঝাপ দেয়ার এক একটা জ্বলন্ত উদাহরণ।

যাদের বন্ধু ভাবা হয় আসলে বন্ধু নয়

ঈমানদার ও মুত্তাকী-পরহেযগার মানুষ ব্যতীত অন্য কেউ মুমিনের বন্ধু হতে পারে না। মুমিন ঈমানদার ও মুত্তাকী-পরহেযগার মানুষ ব্যতীত অন্য কাউকে বন্ধু বানাতে পারে না, অন্য কাউকে বন্ধু ভাবতে পারে না। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ.﴾

অর্থাৎ, মু'মিনদের বন্ধু তো হবে আল্লাহ, আল্লাহর রসূল এবং ঐসব দ্বীনদার পরহেযগার মানুষ যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয়। (সূরা মায়িদাঃ ৫৫)

অন্য এক আয়াতে কাফের মুশরিক ও ধর্ম বিরোধী লোকদেরকে বন্ধু বানাতে নিষেধ করা হয়েছে, যারা ধর্ম নিয়ে উপহাস করে তাদেরকেও বন্ধু বানাতে নিষেধ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

www.maktabatulabrar.com

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُم هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُم وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ.﴾

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! পূর্ববর্তী কিতাবীদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস্য বানায়, যারা কাফের, তাদেরকে তোমরা বন্ধু বানিও না। (সূরা মায়িদাঃ ৫৭)

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُم أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِنْكُم فَإِنَّه مِنْهُم إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.﴾

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা! তোমরা ইয়াহুদ নাসারাদেরকে বন্ধু বানিও না। ওরা একে অপরের বন্ধু। কেউ তাদেরকে বন্ধু বানালে সে তাদেরই দলভুক্ত গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ এমন জালেমদেরকে সঠিক পথ দেখাবেন না। (সূরা মায়িদাঃ ৫১)

কাফের, মুশরিক, ইয়াহুদ, নাসারা ও ধর্ম বিরোধীদেরকে বন্ধু বানানো নিষেধ এ সম্পর্কিত বহু আয়াত রয়েছে। মুসলমানদের বন্ধুত্ব হবে একমাত্র মুসলমানদের সাথে, ধর্মপ্রাণ মানুষদের সাথে, আল্লাহওয়ালা মানুষদের সাথে। ইসলামে এটার গুরুত্ব অনেক, অথচ অনেকেই এটাকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে না। ফলে যারা বন্ধু নয় তাদেরকে বন্ধু ভেবে বসে, আর যারা প্রকৃত বন্ধু তাদের থেকে দূরে সরে থাকে। চিন্তার ভুলের কারণেই এমনটা হয়ে থাকে। এটা এমন ভুল যা জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তাআলা আমাদের রক্ষা করুন। পরকালে বিপদগ্রস্ত হয়ে যেন আমাদের বলতে না হয়,

﴿يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا.﴾

অর্থাৎ, হায় আমার ধ্বংস, হায় আফসোস অমুককে যদি বন্ধু না বানাতাম! (সূরা ফুরকানঃ ২৮)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যেগুলো শেখা ফরয/ওয়াজিব অথচ সেগুলো শেখার প্রয়োজনই বোধ করা হয় না

যেগুলো শেখা ফরয/ওয়াজিব অথচ সেগুলোকে ফরয/ওয়াজিব মনে করা হয় না এবং সেগুলো শেখার প্রয়োজনই বোধ করা হয় না– এমন জিনিস আমাদের জীবনে রয়েছে অনেক। তার মধ্যে এখানে বিশেষ কয়েকটা প্রসঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে।

আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা করা প্রসঙ্গ

যেগুলো শেখা ফরয/ওয়াজিব অথচ সেগুলোকে ফরয/ওয়াজিব মনে করা হয় না, তথা সেই পর্যায়ের গুরুত্ব দেয়া হয় না, তার মধ্যে একটা হল– আবশ্যক পরিমাণ কুরআন-হাদীছের ইল্ম (জ্ঞান) অর্জন করার বিষয়। আবশ্যক পরিমাণ কুরআন-হাদীছের ইল্ম (জ্ঞান) অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরযে আইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ। আবশ্যক পরিমাণ জ্ঞান (যা প্রত্যেকের উপর ফরযে আইন) বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয় এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজনীয় লেন-দেন ও কায়-কারবার সম্পর্কিত বিষয়াদির মাসআলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহকাম জানা। হাদীছে এসেছে–

«طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ». (رواه ابن ماجة برقم ٢٢٤. وفي الزوائد : إسناده ضعيف ، لضعف حفص بن سليمان . وقال السيوطي : سئل الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله تعالى عن هذا الحديث ، فقال: إنه ضعيف ، أي سندا . وإن كان صحيحا ، أي معنى . وقال تلميذه جمال الدين المزى : هذا الحديث روى من طرق تبلغ رتبة الحسن . وهو كما قال . فإني رأيت له خمسين طريقا وقد جمعتها في جزء . انتهى كلام الامام السيوطي .)

অর্থাৎ, (দ্বীনী) ইল্ম শিক্ষা করা প্রত্যেক মুসলমান (নর হোক বা নারী)–এর উপর ফরয। (ইবনে মাজা: হাদীছ নং ২২৪)

www.maktabatulabrar.com

কুরআন মাজীদ পাঠ শিক্ষা করা প্রসঙ্গ

যেগুলো শেখা ফরয/ওয়াজিব অথচ সেগুলোকে ফরয/ওয়াজিব মনে করা হয় না তথা সেই পর্যায়ের গুরুত্ব দেয়া হয় না তার মধ্যে আর একটা হল– সহীহভাবে কুরআন পাঠ করতে শেখার বিষয়। সহীহভাবে কুরআন পাঠ করা তথা তাজবীদ ও তারতীল সহকারে তিলাওয়াত করা ওয়াজিব। অতএব তাজবীদ সহকারে কুরআন পাঠ করতে শেখাও ওয়াজিব। মনে রাখতে হবে ইবাদতের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হচ্ছে নামায। এই নামাযে কেরাত পাঠ করা ফরয। এই ফরয সহীহভাবে আদায় করতে হলে অবশ্যই সহীহভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখতে হবে। কিন্তু আফসোসের বিষয় আমরা অনেক মুসলমান নামায পড়ার গুরুত্ব উপলব্ধি করি কিন্তু সহীহভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে শেখার গুরুত্ব উপলব্ধি করি না। ফলে দেখা যায় লক্ষ মুসলমান নামায পড়েন, কুরআন তেলাওয়াতও করেন কিন্তু তাদের কুরআন তেলাওয়াত সহীহ নয়।

তায্কিয়া তথা আধ্যাত্মিক সাধনা প্রসঙ্গ

যেগুলো ফরয/ওয়াজিব অথচ সেগুলোকে ফরয/ওয়াজিব মনে করা হয় না তার মধ্যে আর একটা হল তায্কিয়া তথা আত্মশুদ্ধির বিষয়। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শরীয়তের বিধি-বিধান দুই ধরনের। যথা:

১. জাহিরী বিধি-বিধান তথা শরীরের সাথে বা অর্থ-সম্পদের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান, যেমন– নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, সদকা, ফেতরা, কুরবানী ইত্যাদি।
২. বাতিনী বিধি-বিধান তথা মনের সাথে সম্পর্কিত বিধি-বিধান, যেমন– ইখলাস, সবর, সহিষ্ণুতা, তাওয়াজু', তাওয়াক্কুল, তাকওয়া, শোকর ইত্যাদি অর্জনীয় আত্মিক বিষয়াদি, আর রিয়া, হুব্বে মাল, বখীলী, লোভ-লালসা, অহংকার, আত্মম্ভরিতা, হাছাদ, বুগ্য ইত্যাদি বর্জনীয় আত্মিক বিষয়াদি।

এই দ্বিতীয় প্রকার বিধি-বিধানের উপর আমল করা তথা মনের সাথে সম্পর্কিত করণীয় বিষয়াদি করা ও বর্জনীয় বিষয়াদিকে বর্জন করার অপর নাম "তায্কিয়া" তথা আত্মশুদ্ধি।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনের দিকে ইংগিত করে এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.» (رواه البخاري في باب فضل من استبرأ لدينه حديث رقم ٥٢)

অর্থাৎ, জেনে রাখ শরীরে একটা মাংসখণ্ড রয়েছে সেটা যখন ঠিক থাকে গোটা শরীর ঠিক থাকে, আর সেটা যখন অকেজো হয়ে যায় গোটা শরীর অকেজো হয়ে যায়। জেনে রাখ সেটা হচ্ছে কলব তথা হৃৎপিণ্ড। (বোখারী শরীফ, হাদীছ নং ৫২)

এ হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বোঝাতে চেয়েছেন, জাহিরী কলব তথা হৃৎপিণ্ড ঠিক না থাকলে যেমন গোটা শরীর অকেজো হয়ে যায়, শরীরের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত কর্মকাণ্ড নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি একটা বাতিনী কলব তথা মন রয়েছে সেটা ঠিক না থাকলে তার সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আমলও অঠিক হয়ে যায়। অর্থাৎ মনের শুদ্ধি না ঘটালে মনের সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আমলও অশুদ্ধ হয়ে যায়। সারকথা এ হাদীছে আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন বর্ণনা করা হয়েছে।

এই তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির প্রয়োজন ও গুরুত্ব কেন তা আমি চার আঙ্গিকে তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি।

এক:

শরীয়তে তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব এত বেশি যে, আল্লাহ তাআলা এই আত্মশুদ্ধির কার্যক্রমকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ.﴾ (الآية ١٦٤ من سورة آل عمران)

অর্থাৎ, আল্লাহ তো মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের নিজেদেরই মধ্য থেকে একজন রসূল প্রেরণ করেছেন, যে তাদের নিকট তাঁর আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, তাদের তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) করে এবং তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়। আর নিশ্চয়ই তারা এর পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিল। (সূরা আলে ইমরান: ১৬৪)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ.﴾ (الآية ١٥١ من سورة البقرة)

অর্থাৎ, আমি তোমাদের মধ্যে এমন একজন রসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে, তোমাদের তাযকিয়া (আত্মশুদ্ধি) করে এবং তোমাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেয়। আর তোমরা যা জানতে না তা তোমাদেরকে শিক্ষা দেয়। (সূরা বাকারা: ১৫১)

এই দুই আয়াতে উল্লেখিত "তাযকিয়া" (পবিত্র করা) কথাটার ব্যাখ্যা মুফাসসিরীনে কেরাম এভাবে করেছেন– কুফর, শিরক, যাবতীয় পাপ ও মন্দ চরিত্র থেকে পবিত্র করা এবং উত্তম চরিত্র ও উত্তম কর্ম দ্বারা শুচি-শুদ্ধ হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। তায্কিয়ার এ ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় আত্মশুদ্ধির বিষয়ও এর অন্তর্ভুক্ত। যাহোক আয়াতদ্বয়ে তিলাওয়াত ও তালীমের পাশাপাশি তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির কার্যক্রমকেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিশেষ দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যা দায়িত্ব উলামা ও সুলাহায়ে কেরামেরও তাই দায়িত্ব। কেননা উলামা ও সুলাহা হলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিছ, নায়েব বা প্রতিনিধি। আর বলা বাহুল্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, উলামা ও সুলাহা কর্তৃক এ দায়িত্ব এ জন্যই পালন করা যে, উম্মত সেটাকে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবে এবং তদনুযায়ী যা করার তা করবে এবং যা বর্জন করার তা বর্জন করবে।

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

দুই:

তায্‌কিয়া তথা আত্মার সাথে সম্পর্কিত করণীয় বিষয় করা ও বর্জনীয় বিষয় বর্জন করা –এক কথায় বাতিনী বিধি-বিধানের উপর আমল করা– ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয়, যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী বিধি-বিধানের উপর আমল করা ওয়াজিব পর্যায়ের বিষয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী বিষয়াদির নির্দেশ প্রদান করেছেন, তেমনি ইখলাস, সবর, সহিষ্ণুতা, তাওয়াজু', তাওয়াক্কুল, তাকওয়া, শোকর ইত্যাদি বাতিনী বিষয়াদিরও নির্দেশ প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ কর্তৃক কোন বিষয়ের নির্দেশ প্রদান সে বিষয় ওয়াজিব হওয়াকেই বোঝায়। নিম্নে বাতিনী বিধি-বিধান ওয়াজিব হওয়া সম্পর্কিত কয়েকটি আয়াত লক্ষ করুন।

(১) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ.﴾ (الآية ١١٩ من سورة التوبة)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা তাকওয়া অর্জন কর এবং (যারা কথায় ও কাজে) সত্যপন্থী তাদের সাহচর্য অবলম্বন কর। (সূরা তাওবা: ১১৯)

(২) ﴿إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.﴾ (الآية ١٧٥ من سورة آل عمران)

অর্থাৎ, নিশ্চয় এই হচ্ছে তোমাদের সেই শয়তান যে (তোমাদেরকে) তার অনুসারীদের ভয় দেখায়; কিন্তু যদি তোমরা মুমিন হও তবে তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। (সূরা আলে ইমরান: ১৭৫)

(৩) ﴿فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ.﴾ (الآية ١٥٠ من سورة البقرة) وقوله : ﴿وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ.﴾ (الآية ٤٠ من سورة البقرة)

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, অতএব তোমরা তাদেরকে ভয় করো না বরং আমাকেই ভয় কর। (সূরা বাকারা: ১৫০) আর তোমরা আমাকেই ভয় কর। (সূরা বাকারা: ৪০)

(৪) ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ.﴾ (الآية ٥ من سورة البينة)

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছে আল্লাহ আনুগত্যে ইখলাসের অধিকারী হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। (সূরা বাইয়্যেনাহ: ৫)

(৫) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.﴾ (الآية ٢٠٠ من آل عمران)

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা সবর অবলম্বন কর, মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।
(সূরা আলে ইমরান: ২০০)

(৬) ﴿إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ.﴾ (الآية ٨٤ من سورة يونس)

অর্থাৎ, যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখো, তবে তাঁরই উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর যদি তোমরা আত্মসমর্পনকারী হতে চাও।
(সূরা ইউনুস: ৮৪)

(৭) ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ.﴾ (الآية ١٥٢ من سورة البقرة)

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব। আর তোমরা আমার শোকর আদায়কারী হও না-শোকরগোযার হয়ো না। (সূরা বাকারা: ১৫২)

এসব আয়াতে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক যথাক্রমে তাকওয়া, খাওফ ও খাশিয়্যাত (আল্লাহ-ভীতি), ইখলাস, সবর, তাওয়াক্কুল ও শোকরের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। আর বিধিবদ্ধ মূলনীতি অনুসারে কোন বিষয়ে নির্দেশ সে বিষয় ওয়াজিব হওয়াকে বোঝায়। অতএব প্রমাণিত হল তায্‌কিয়া সংক্রান্ত এসব বিধান ওয়াজিব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। এসব আয়াতে তায্‌কিয়ার যেসব বিষয় করণীয় সে সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল। এবার তায্‌কিয়ার যেসব বিষয় বর্জনীয় সে সম্পর্কিত কয়েকটি ভাষ্য (হাদীছ) লক্ষ করুন।

(১) عن جُنْدَبٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «**مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللهُ بِهِ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللهُ بِهِ.**» (أخرجه البخاري في باب الرياء والسمعة حديث رقم ٦٤٩٩)

অর্থাৎ, হযরত জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছুম্‌আ তথা শোনানোর জন্য করে আল্লাহ তারটা শুনিয়ে দেন এবং যে রিয়া তথা লোক দেখানোর জন্য করে আল্লাহ তারটা দেখিয়ে দেন। (বোখারী, হাদীছ নং ৬৪৯৯)

(২) عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: «**لاَ يَزَالُ قَلْبُ الْكَبِيرِ شَابًّا فِي اثْنَتَيْنِ: فِي حُبِّ الدُّنْيَا وَطُولِ الأَمَلِ.** » (أخرجه البخاري في كتاب الرقاق حديث رقم ٦٤٢٠)،

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, বৃদ্ধদের অন্তর দুনিয়ার মহব্বত ও দীর্ঘ আশা– এই দুই ব্যাপারে সর্বদা জওয়ান থাকে। (বোখারী, হাদীছ নং ৬৪২০)

(৩) عن أنس بن مالك قال : قال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «**يَهْرُمُ بْنُ آدَمَ وَيَبْقَى مِنْهُ اِثْنَتَانِ – اَلْحِرْصُ وَطُوْلُ الْأَمَلِ.**» (السنن الكبرى للبيهقي حديث رقم ٦٦٠٣)

অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বনী আদম বৃদ্ধ হয়ে যায় তবে তার দুটো জিনিস রয়ে যায় (যা বৃদ্ধ হয় না) তা হল লোভ-লালসা ও দীর্ঘ আশা। (বায়হাকী কৃত আস-সুনানুল কুবরা, হাদীছ নং ৬৬০৩)

(8) عن أبي بكر الصديق عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «**لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ ولا مَنَّانٌ ولا بَخِيلٌ**». (رواه الترمذي حديث رقم ١٩٦٣ وقال: هذا حديث حسن غريب.)،

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না ফেরেববাজ, আর না দান করে যে খোঁটা দেয় সে, আর না বখীল। (তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৬৩)

(৫) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ– بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ– عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– قَالَ : «**لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ**». (رواه مسلم برقم ١٤٨)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে যার্‌রা পরিমাণ (অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ) অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম, হাদীছ নং ১৪৮)

(৬) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَوْصِنِي، قَالَ : «**لَا تَغْضَبْ**». فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ : «**لَا تَغْضَبْ**». (رواه البخاري في صحيحه برقم ٦١١٦)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করল, আমাকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নসীহত করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি গোস্বা করো না। সে কয়েকবার তার ঐ একই আবেদন জানাল

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (প্রত্যেকবারই) বললেন, তুমি গোস্বা করো না। (বোখারী, হাদীছ নং ৬১১৬)

(৭) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَإِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ».(رواه أبو داود حديث رقم ٤٨٩٥)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা হাছাদ (পরশ্রীকাতরতা) থেকে বেঁচে থাক। কেননা হাছাদ নেক আমলাদিকে এমনভাবে গ্রাস করে ফেলে যেমন আগুন জ্বালানী কাঠকে গ্রাস করে ফেলে। (আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৮৯৫)

এসব হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথাক্রমে ছুম্‌আ তথা মানুষকে শোনানোর উদ্দেশ্যে আমল করা, রিয়া তথা মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে আমল করা, হুবের জাহ ও মাল তথা সম্মান ও সম্পদ প্রীতি, হির্‌স তথা লোভ-লালসা, অহংকার, গোস্বা ও হাছাদ (পরশ্রীকাতরতা) ইত্যাদি বিষয়ে সতর্ক করেছেন। এই সতর্কীকরণ বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকা ওয়াজিব হওয়াকে প্রতিপন্ন করে।

তিন:

তায্‌কিয়া তথা বাতিনী বিধি-বিধান বর্জন করা দ্বারা জাহান্নাম অবধারিত হয়ে দাঁড়ায় যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী আহকাম বর্জন করলে জাহান্নাম অবধারিত হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ তাআলা যেমন নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী আহকাম বর্জন করলে জাহান্নামের ধমক ও শাসানী প্রদান করেছেন, তেমনি তায্‌কিয়া অর্জন না করলে তথা বাতিনী বিধি-বিধান বর্জন করলেও জাহান্নামের ধমক ও শাসানী প্রদান করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে,

﴿أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ، وَيُنَجِّي اللهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.﴾ (الآيات ٦٠-٦١ من سورة الزمر)

www.maktabatulabrar.com

অর্থাৎ, তাকাব্বুরকারীদের আবাসস্থল কি জাহান্নাম নয়? আল্লাহ তাকওয়ার অধিকারীদেরকে সফলতা সহকারে উদ্ধার করবেন; না দুঃখ-কষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করবে আর না তারা চিন্তিত হবে। (সূরা যুমার: ৬০-৬১)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তায্‌কিয়া তথা বাতিনী বিধি-বিধান বর্জন করলে জাহান্নামের ধমক ও শাসানী প্রদান করেছেন। এ পর্যায়ের কয়েকটি হাদীছ লক্ষ করুন।

(১) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– عَنِ النَّبِيِّ – صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – قَالَ : «لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ». (رواه مسلم برقم ١٤٨)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে যার্‌রা পরিমাণ (অতি ক্ষুদ্র পরিমাণ) অহংকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসলিম, হাদীছ নং ১৪৮)

(২) عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ – رَضِيَ اللهُ عَنْهُ– قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيه وسَلَّم : «... لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَيِّئُ الْمَلَكَةِ ...». (رواه البزار في مسنده حديث رقم ٤٣ في مسند زيد بن أرقم)

অর্থাৎ, হযরত যায়দ ইবনে আরকাম (রা.) হযরত আবূ বকর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অধীনস্থ দাস-দাসীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করে যে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। (মুসনাদে বাযযার, হাদীছ নং ৪৩)

(৩) عن أبي بكر الصديق عن النبي صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خِبٌّ ولا مَنَّانٌ ولا بَخِيلٌ». (رواه الترمذي حديث رقم ١٩٦٣ وقال: هذا حديث حسن غريب.)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত– নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জান্নাতে প্রবেশ করবে না ফেরেববাজ, আর না দান করে যে খোঁটা দেয় সে, আর না বখীল। (তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৬৩)

(8) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ – رَضِيَ الله عَنْهُ– قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «**لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْكُمْ إِلاَّ رَحِيمٌ**»، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ، كُلُّنَا رَحِيمٌ، قَالَ : **لَيْسَ رَحْمَةُ أَحَدِكُمْ نَفْسَهُ وَأَهْلَ بَيْتِهِ حَتَّى يَرْحَمَ النَّاسَ**. (الآداب للبيهقي برقم ٣٣)

অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম (একদিন) ইরশাদ করলেন, তোমাদের মধ্যে যে দয়ালু নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাদের প্রত্যেকেই তো দয়ালু। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, শুধু নিজের প্রতি এবং নিজের পরিবারবর্গের প্রতি দয়া করলেই চলবে না, যতক্ষণ না গোটা মানবজাতির প্রতি দয়া করবে। (বায়হাকী কৃত আল-আদাব, হাদীছ নং ৩৩)

চার:

মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী যেমন জাহিরী বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভরশীল, তেমনি মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী বাতিনী বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপরও নির্ভরশীল।

প্রথম বিষয়ের দলীল আল্লাহর বাণী–

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ

www.maktabatulabrar.com

لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾

(الآيات ١-٩ من سورة المؤمنون)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই মু'মিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী, যারা অনর্থক কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকে, যারা যাকাত দানে সক্রিয়, আর যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। নিজেদের স্ত্রী বা মালিকানাভূক্ত দাসীদের থেকে ব্যতিক্রম। কেননা (এতে) তারা নিন্দনীয় হবে না। তবে কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে এমন লোকেরা হবে সীমালংঘনকারী। এবং যারা তাদের (দায়িত্ব গৃহীত) আমানতসমূহ ও অঙ্গীকার রক্ষা করে, আর যারা নিজেদের নামাযসমূহের পাবন্দী করে। (সূরা মুমিনূন: ১–৯)

এসব আয়াতে মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী, জাহিরী বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভরশীল– এ কথা বর্ণিত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিষয়ের দলীল আল্লাহর বাণী–

﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ (الآيات ٧-١٠ من سورة الشمس)

অর্থাৎ, শপথ নফ্সের এবং তাঁর যিনি তাকে সুসমঞ্জস করেছেন, অতঃপর তাতে সৎকর্ম ও অসৎকর্মের চেতনা সঞ্চারিত করেছেন। যে তাকে (সেই নফ্সকে) পরিশুদ্ধ করবে সে অবশ্যই সফলকাম হবে। আর যে তাকে কলুষিত করবে সে অবশ্যই ব্যর্থ হবে। (সূরা শাম্স: ৭–১০)

এসব আয়াতে মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী, বাতিনী বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপর নির্ভরশীল– এ কথা বর্ণিত হয়েছে।

এক স্থানে জাহিরী ও বাতিনী উভয় ধরনের বিধি-বিধান অনুযায়ী আমল করার উপর মানুষের সফলতা ও কামিয়াবী নির্ভরশীল থাকার কথা একসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى.﴾ (الآيات ١٤-١٧ من سورة الأعلى)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, নিশ্চয় সে সফলকাম হবে যে পবিত্র হয় এবং তার প্রতিপালককে স্মরণ করে ও নামায পড়ে। কিন্তু তোমরা পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকো। অথচ আখেরাত উত্তম ও চিরস্থায়ী।

(সূরা আ'লা: ১৪-১৭)

যাহোক এতক্ষণের আলোচনায় প্রতীয়মান হল, তায্‌কিয়া তথা আত্মশুদ্ধির বিষয়টা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিষয়টা আদৌ এমন নয় যেমনটা কিছু লোক মনে করে থাকে। তারা এটাকে পশ্চাতে নিক্ষেপ করেছে, এর যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। তারা নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহিরী বিধানাবলীর গুরুত্ব দিয়ে থাকে, তারা বিশ্বাস করে এগুলো জরুরি, এগুলো মান্য করা ব্যতীত নাজাত হবে না। কিন্তু বাতিনী বিধানাবলীকে তেমন গুরুত্বের মনে করে না, সেগুলোর প্রতি তেমন বিশ্বাস রাখে না। অথচ জাহিরী বাতিনী উভয় ধরনের বিধানেরই গুরুত্ব সমান, যেমন আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।

তায্‌কিয়া তথা আত্মশুদ্ধির গুরুত্ব প্রমাণিত হওয়ার পর প্রশ্ন থেকে যায় এই তায্‌কিয়া তথা আত্মশুদ্ধি কীভাবে অর্জন করা যাবে। এ ব্যাপারে শুধু জ্ঞান অর্জন, আগ্রহ ও নিয়ত থাকলেই কি চলবে, না এর জন্য আরও কিছুর প্রয়োজন রয়েছে। এর উত্তর হল- জ্ঞান অর্জন, আগ্রহ, নিয়ত অবশ্যই জরুরি, কিন্তু তা পূর্ণাঙ্গ যথেষ্ট নয়। কেননা অনেক সময় কোন ব্যক্তির মধ্যে আত্মিক রোগ থাকা সত্ত্বেও সে তা টের পায় না। আর টের না পেলে কীভাবে ইসলাহ বা সংশোধন করবে? কখনও এমন হয় যে, কিছু একটা রোগ আছে অনুভব করলেও সেটা যে কী রোগ তা যথাযথ নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। হয়তো রয়েছে অহংকার অথচ সেটাকেই সে মনে করছে তাওয়াজু। এটা হল তাওয়াজুর সুরতে অহংকার। কিংবা হয়তো রয়েছে বংশীয় বা গোত্রীয় গোঁড়ামী অথচ সেটাকেই সে ধর্মীয় আত্মমর্যাদা মনে করে বসে আছে। কিংবা ধর্মীয় কোন ব্যাপারে বাড়াবাড়ি রয়েছে অথচ সেটাকেই সে ধর্মের উপর মজবূতী বা দৃঢ়তা মনে করে বসে আছে। অথবা কোন বিষয়কে ধর্মীয় ছাড় মনে করে বসে আছে অথচ সেটা ধর্মের ছাড় নয় বরং সেটা হল ধর্মের ব্যাপারে তার শিথীলতা বা প্রান্তিকতা। এভাবে রোগ নির্ণয়ে প্রচুর

www.maktabatulabrar.com

বিভ্রান্তির শিকার হওয়ার অবকাশ রয়েছে। তদুপরি সব আত্মিক রোগের চিকিৎসাও এক নয়। একজনের বেলায় যে চিকিৎসা পদ্ধতি যুৎসই অন্যের বেলায় সেটা তেমন যুৎসই নয়। এমনিভাবে একই চিকিৎসা ব্যবস্থা সর্বাবস্থায় কার্যকরী হয় না, এক অবস্থায় যে পদ্ধতি চলে অন্য অবস্থায় সে পদ্ধতি তেমন কার্যকর না। এভাবে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যবস্থা নির্ণয়ে অনেক সুক্ষ্ম জ্ঞান ও সুক্ষ্ম দৃষ্টির প্রয়োজন হয়। এই শাস্ত্রের পর্যাপ্ত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক ব্যতীত অন্যরা সেসব সুক্ষ্ম পার্থক্য নির্ণয় করতে অনেক সময় সক্ষম হয় না। তাই প্রয়োজন দেখা দেয় বিজ্ঞ মুসলিহ (ইসলাহকারী) তথা শাইখে তরীকতের সুহবত বা সাহচর্য গ্রহণের। শাইখে তরীকত তার এই শাস্ত্রের সুক্ষ্ম জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে রোগ নির্ণয় করে তার যথাযথ চিকিৎসা বলে দিতে সক্ষম হন। এ থেকেই সালিহ ও মুসলিহ ব্যক্তি তথা শাইখে তরীকতের সাহচর্য গ্রহণের প্রয়োজন প্রমাণিত হয়। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই মুসলিম সমাজে পীর-মুরীদির পদ্ধতি চালু হয়েছে। এটাকেই আরবীতে বলে, "সুহ্‌বাতুস্ সালিহীন" তথা নেককার পরহেযগার লোকদের সাহচর্য গ্রহণ।

সালিহ ও মুসলিহ ব্যক্তি তথা শাইখে তরীকতের সাহচর্য গ্রহণের প্রয়োজনের দিকে ইশারা করা হয়েছে নিম্নোক্ত আয়াতে-

﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ.﴾

অর্থাৎ, তুমি আমাদেরকে সিরাতে মুস্তাকীমে পরিচালিত কর, তাদের পথে যাদের প্রতি তুমি অনুগ্রহ করেছো। (সূরা ফাতিহা: ৬)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা "সিরাতে মুস্তাকীম" (সঠিক পথ)-এর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, সেটা হল আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ। আর অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বলে বোঝানো হয়েছে নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহীনকে। যেমন অন্য আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿فَأُوْلَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ.﴾ (الآية ٦٩ من سورة النساء)

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অর্থাৎ, তারা হল ঐসব লোক যাদেরকে আল্লাহ অনুগ্রহপ্রাপ্ত করেছেন। তারা হল নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সালিহগণ। (সূরা নিছা: ৬৯)

এখানে লক্ষণীয় যে, আল্লাহ তাআলা "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সঠিক পথ–এর পরিচয় দিতে গিয়ে এভাবে বলেননি যে, "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সঠিক পথ হল কুরআন-সুন্নাহর পথ। অথচ এভাবে বললে কথাটি বোঝার জন্য সহজ ছিল। কিন্তু তিনি সেভাবে না বলে বলেছেন, "সিরাতে মুস্তাকীম" বা সঠিক পথ হল অনুগ্রহপ্রাপ্তদের পথ। এভাবে বলে ইশারা করা হয়েছে যে, সিরাতে মুস্তাকীম চিনতে হলে রিজালুল্লাহ তথা অনুগ্রহপ্রাপ্তদের সাহায্যে চিনতে হবে। সিরাতে মুস্তাকীম চেনার জন্য, বৃহত্তর অর্থে হেদায়েতের জন্য শুধু কিতাবুল্লাহ তথা আল্লাহর কিতাবই যথেষ্ট নয় রিজালুল্লাহর (আল্লাহর পথের খাঁটি ব্যক্তিবর্গের)ও প্রয়োজন রয়েছে। কিতাবুল্লাহকে বুঝতে হবে রিজালুল্লাহর ব্যাখ্যার আলোকে। সিরাতে মুস্তাকীমের দুআর পর এই রিজালুল্লাহর উল্লেখ দ্বারা ইশারা করা হয়েছে, সিরাতে মুস্তাকীমে চলতে হলে রিজালুল্লাহ তথা আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্তদের, ভিন্ন ভাষায় আল্লাহর পথের খাঁটি ব্যক্তিদের সঙ্গে থাকতে হবে, তাদের সুহবত তথা সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে। এটাই হল সুহবাতুস সালিহীন–এর প্রয়োজন বর্ণনা। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী তাফসীরে কাবীরে বলেছেন,

وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول –إلى مقامات الهداية والمكاشفة– إلا إذا اقتدى بشيخ يَهْدِيْهِ إلى سواء السبيل ويُجَنِّبُه عن مواقع الأغاليط والأضاليل، وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق، وعقولُهُم غيرُ وافيةٍ بإدراك الحق وتمييزِ الصواب عن الغلَط، فلا بدّ من كامل يَقْتَدِي به الناقص حتى يتقوى عقلُ ذلك الناقصِ بنور عقل ذلك الكامل؛ فحينئذٍ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات.

অর্থাৎ, এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, মুরীদের পক্ষে হেদায়েত ও দ্বীন বিকাশমানতার স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে হলে শায়খের অনুসরণ বৈ

গত্যন্তর নেই। শায়খ তাকে সঠিক পথের নির্দেশনা দিবেন, তাকে ভুল-ভ্রান্তির স্থান থেকে দূরে রাখবেন। শায়খের অনুসরণ বৈ গত্যন্তর নেই এ কারণে যে, অনেক মানুষেরই প্রচুর ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকে, এবং তাদের বুদ্ধি-বিবেচনা সঠিক আর অঠিকের মাঝে পার্থক্য নির্ণয়ে পূর্ণ পারঙ্গম হয় না। তাই ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির পক্ষে ত্রুটিমুক্ত ব্যক্তি তথা কামেল ব্যক্তির অনুসরণ করা জরুরি হয়ে দাঁড়ায়, যাতে ঐই কামেল ব্যক্তির পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের জ্যোতিতে ঐই ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তির বুদ্ধি-বিবেচনা জ্যোতির্মান ও শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে আর এভাবে সে পরিপূর্ণতা ও সৌভাগ্যের উচ্চ সোপানে উপনীত হতে পারে।

সুহবাতুস সালিহীন–এর প্রয়োজন জ্ঞাপক আরও স্পষ্ট দলীল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللّهَ وَكُونُوْا مَعَ الصَّادِقِينَ.﴾ (الآية ١١٩ من سورة التوبة)

অর্থাৎ, হে মুমিনরা! তোমরা তাকওয়া অর্জন কর এবং সত্যপন্থীদের সাহচর্য অবলম্বন কর। (সূরা তাওবা: ১১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুমিনদের তাকওয়া অর্জনের নির্দেশ প্রদানের পর সত্যপন্থীদের সাহচর্য অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন। আর সত্যপন্থী বলতে বোঝায় যারা তাদের দীন, নিয়ত, আমল ও মুআমালা মুআশারা সবকিছুতে সত্যের উপর থাকেন। সহজ কথায় আমরা যাদেরকে বুযুর্গ বলে থাকি। এভাবে আয়াতে ইশারা করা হয়েছে, তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রে সুহবাতুস সালিহীন তথা বুযুর্গদের সাহচর্যের বিশেষ কার্যকরী প্রভাবে রয়েছে। বস্তুত সালিহীন তথা বুযুর্গদের সাহচর্য শুধু তাকওয়া অর্জনের ক্ষেত্রেই কার্যকরী প্রভাব ফেলে না, বরং দ্বীনী সব ধরনের চেতনা উদ্রেক করে দেয়ার ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে থাকে। নিম্নের তিনটি হাদীছের বক্তব্য দেখুন।

(١) عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الأُتْرُجَّةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِى لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلاَ رِيحَ لَهَا، وَمَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْهُ شَىْءٌ أَصَابَكَ مِنْ رِيحِهِ، وَمَثَلُ جَلِيسِ السُّوءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْكِيرِ إِنْ لَمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ مِنْ دُخَانِهِ». (رواه أبو داود في باب من يؤمر أن يجالس حديث رقم ٤٨٢١، وسكت عنه هو والمنذري بعده.)

অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে মুমিন কুরআন তেলাওয়াত করে তার উদাহরণ হল গোড়া লেবুর মত, যার ঘ্রাণও সুন্দর স্বাদও সুন্দর। আর মুমিন যে কুরআন তেলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হল খেজুরের মত, যার স্বাদ সুন্দর কিন্তু তার কোনো ঘ্রাণ নেই। আর যে পাপী ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করে তার উদাহরণ হল রায়হানা (ফুল বা লতা)-এর মত, যার ঘ্রাণ সুন্দর কিন্তু তার স্বাদ তিক্ত। আর যে পাপী কুরআন তেলাওয়াত করে না তার উদাহরণ হল মাকাল ফলের মত, যার স্বাদও তিক্ত আবার তার কোনো ঘ্রাণও নেই। যে নেককার লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা হয়, সেই নেককার লোকের উদাহরণ হল যেন এক মেশকওয়ালা, তার থেকে মেশক লাভ করতে না পারলেও তার ঘ্রাণ তুমি পাবে। আর যে বদকার লোকদের সাহচর্য গ্রহণ করা হয়, সেই বদকার লোকের উদাহরণ হল যেন এক হাপরওয়ালা, তার থেকে কয়লার কালি না লাগলেও ধোঁয়া তো লাগবেই।

(আবূ দাউদ, হাদীছ নং ৪৮২১)

(২) عن أَبِي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ كَمَثَلِ صَاحِبِ

www.maktabatulabrar.com

الْمِسْكِ وَكِيرِ الْحَدَّادِ لَا يَعْدَمُكَ مِنْ صَاحِبِ الْمِسْكِ إِمَّا تَشْتَرِيهِ أَوْ تَجِدُ رِيحَهُ، وَكِيرُ الْحَدَّادِ يُحْرِقُ بَدَنَكَ أَوْ ثَوْبَكَ أَوْ تَجِدُ مِنْهُ رِيحًا خَبِيثَةً.» (رواه البخاري في باب في العطار وبيع المسك حديث رقم ٢١٠١)

অর্থাৎ, হযরত আবূ মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে নেককার বা বদকার লোকের সাহচর্য গ্রহণ করা হয় সেই নেককার ও বদকারের উদাহরণ হল (যথাক্রমে) মেশকওয়ালা ও কর্মকারের হাপরের মত। মেশকওয়ালা থেকে তোমার কিছু না পাওয়া হবে না; হয় তার থেকে মেশক ক্রয় করবে নতুবা তার ঘ্রাণ তো পাবেই। আর কর্মকারের হাপর হয় তোমার শরীর বা কাপড় জ্বালাবে কিংবা অন্তত তার উৎকট গন্ধ তো পাবেই। (বোখারী, হাদীছ নং ২১০১)

(৩) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم : مَنْ ذَكَّرَكُمْ بِاللَّهِ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِي عَمَلِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالآخِرَةِ عَمَلُهُ.» (المطالب العالية باب مثل الجليس الصالح برقم ٢٧٧٣، {لعبد بن حميد وأبي يعلى}. وهذا الإسناد رواته ثقات كما في إتحاف الخيرة برقم ٦٠٥٩

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা যাদের সাহচর্য গ্রহণ করি তাদের মধ্যে সর্বোত্তম কে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, যার দর্শন তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথা তোমাদের আমলের মধ্যে বর্দ্ধন ঘটায় এবং যার আমল তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(আল-মাতালিবুল আলিয়া, হাদীছ নং ২৭৭৩)

সারকথা, সুহবাতুস সালিহীন– তথা বুযুর্গদের সাহচর্য তাকওয়াসহ দীনী সব ধরনের চেতনা উদ্রেক করে দেয়ার ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে। অতএব তাযকিয়া তথা আত্মশুদ্ধি অর্জনের জন্য সুহবাতুস

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সালিহীন তথা বুযুর্গদের সাহচর্য অবলম্বনের প্রয়োজন ও ফায়দা অনস্বীকার্য। এই বুযুর্গদের সাহচর্য গ্রহণকেই বলা হয় পীর-মুরীদী। আর যে শাস্ত্রে কুরআন সুন্নাহর আলোকে ও পূর্বসূরী বুযুর্গদের অনুসৃত নীতিমালার আলোকে পীর-মুরীদির নিয়ম-নীতি ও আত্মশুদ্ধির পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয় সে শাস্ত্রকে বলা হয় "তাসাওউফ"। শায়খ মুহাম্মাদ আমীন কুরদী নকশবন্দী (রহ.) তাসাওউফ-এর সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন–

"التصوفُ هو عِلْمٌ يُعْرَفُ به أحوالُ النفس محمودُها ومذمومُها وكيفيةُ تطهيرها من المذموم منها وتحليتِها بالاتصاف بمحمودِها."

অর্থাৎ, তাসাওউফ হচ্ছে এমন শাস্ত্র যার দ্বারা আত্মার ভাল-মন্দ চরিত্র সম্বন্ধে জানা যায় এবং মন্দ চরিত্র থেকে আত্মাকে পবিত্র করার উপায় ও ভাল চরিত্রে আত্মাকে মণ্ডিত করার কৌশল বুঝা যায়।

যাহোক, তাসাওউফ ও তাযকিয়ার উদ্দেশ্যের দিকে তাকালে এ কথা আমাদের সামনে অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে ফুটে ওঠে যে, তাসাওউফ ও তায্কিয়ার আমল-শোগলে লিপ্ত হওয়া শরীয়তে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর দ্বারা দীনের আমল ও শরীয়তের আদবসমূহ পরিপূর্ণতা লাভ করে, যা ব্যক্তিকে ইহ্ছানের মাকামে (স্তরে) পৌঁছে দেয়, যে ইহ্ছানের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রসিদ্ধ হাদীছে জিব্রীলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ.»

অর্থাৎ, "ইহ্ছান" হল তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে দেখছ, বস্তুত তুমি আল্লাহকে না দেখলেও তিনি তো তোমাকে দেখছেন। (বোখারী) এই ইহ্ছানের মাকামই হচ্ছে তাসাওউফের পথের সালেকদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

হে আল্লাহ, আমাদেরকে তাসাওউফ ও তাযকিয়ার আমল-শোগলে লিপ্ত করে আত্মাকে কলুষমুক্ত করার ও আত্মিক গুণাবলীতে

www.maktabatulabrar.com

বিভূষিত হওয়ার তাওফীক দান করুন। হককে হক হিসেবে বুঝে তার অনুসরণ করার ও বাতিলকে বাতিল হিসেবে চিহ্নিত করে তা থেকে বিরত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

তাযকিয়া সংক্রান্ত আলোচনার শেষে ভারসাম্য রক্ষামূলক একটা কথা না উল্লেখ করলে নয়। আমাদের আলোচনার সারকথা হল তাযকিয়া হাসেল করা তথা আত্মশুদ্ধি ফরয। আর তাযকিয়া অর্জনের পথে শায়খে তরীকতের হাতে বায়আত হওয়া তথা পীর ধরা বিশেষ উপকারী। (যদি পীর হক্কানী পীর হন।) পীর ধরা কিংবা বায়আত হওয়া ফরয/ওয়াজিব নয়। বরং এটাকে সুন্নাত বলা যায়। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কতিপয় সাহাবী থেকে বিভিন্ন ধরনের নেক আমল করার ও বিভিন্ন ধরনের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার জন্য বায়আত গ্রহণ করেছেন। সব সাহাবী থেকে তা করেননি। এতে বোঝা গেল এটা ফরয ওয়াজিব নয়। ফরয ওয়াজিব হলে সকলের থেকে বায়আত নিতেন। যেহেতু কতিপয় সাহাবী থেকে হলেও বায়আত নিয়েছেন, তাই বায়আতকে সুন্নাত বলা যেতে পারে। বেশ স্পষ্ট করেই দুটো কথা বুঝা চাই। এক. তাযকিয়া হাসেল করা তথা আত্মশুদ্ধি ফরয। দুই. তাযকিয়া বা আত্মশুদ্ধির জন্য বায়আত বা মুরীদ হওয়া উপকারী, তবে ফরয/ওয়াজিব নয়। কেউ যদি নিজেই নিজের আত্মিক ত্রুটি-বিচ্যুতি নির্ণয় পূর্বই নিজেই সংশোধন করতে সক্ষম হন তাহলেও চলবে, তবে এ কাজের জন্য একজন মুরব্বী মুসলিহ ধরা হলে সুবিধা লাভ হয়। তাই বায়আত হওয়া বা মুরীদ হওয়া ফরয/ওয়াজিব নয় তবে উপকারী।

"যেগুলো শেখা ফরয/ওয়াজিব অথচ সেগুলো শেখার প্রয়োজনই বোধ করা হয় না" শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল–

১. আবশ্যক পরিমাণ দ্বীনী ইল্ম শিক্ষা করা ফরয, অথচ সেটাকে ফরয মনেই করা হয় না, তার প্রয়োজনই বোধ করা হয় না।
২. কুরআন মাজীদ সহীহ করে পড়া শেখা ফরয, অথচ সেটাকে ফরয মনেই করা হয় না, তার প্রয়োজনই বোধ করা হয় না।
৩. তাযকিয়া হাছিল করা তথা আধ্যাত্মিক সাধনা ফরয, অথচ সেটাকে ফরয মনেই করা হয় না, তার প্রয়োজনই বোধ করা হয় না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

যেগুলো যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন কিন্তু প্রয়োজন মনে করা হয় না

আমাদের জীবনে অনেক বিষয়ই এমন আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন রয়েছে এবং আমরা যাচাই-বাছাই করেও থাকি। যেমন: বাজার সওদা করার সময় জিনিসপত্র যাচাই-বাছাই করে নেয়ার প্রয়োজন মনে করা হয়, চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক সঠিক কি না, যোগ্য কি না তা যাচাই-বাছাই করে নেয়ার প্রয়োজন মনে করা হয়, বিয়ে শাদীর সময় ছেলে-মেয়ে সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করে নেয়ার প্রয়োজন মনে করা হয়, এগুলো সবই ঠিক আছে। কিন্তু আমাদের জীবনে আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করে নেয়ার প্রয়োজন কিন্তু তা করা হয় না। যেমন একটা বিশেষ বিষয় আমি উল্লেখ করতে চাই। তাহল– কাউকে উস্তাদ বানাতে চাইলে তার সম্বন্ধে যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন। কিন্তু তা করা হয় না। অবলীলায় উস্তাদ হিসেবে কাউকে মেনে নেয়া হয়। তাই কারও ওয়াজ-নসীহত শুনতে হলে তার সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করা হয় না। কারও লেখা বই-পত্র পাঠ করতে হলে তার সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করা হয় না। ইন্টারনেট ফেসবুক টুইটার ইত্যাদি থেকে অবলীলায় শিক্ষা গ্রহণ করা হয় কোন যাচাই-বাছাই করা হয় না। যার থেকে ওয়াজ-নসীহত শোনা হয় তাকেও উস্তাদ বানানো হয়। যার লেখা বই-পত্র পাঠ করা হয় তাকেও উস্তাদ বানানো হয়। তাই তাদেরকে উস্তাদ হিসেবে গ্রহণ করে তাদের থেকে কিছু শেখার পূর্বে তাদের সম্বন্ধে যাচাই-বাছাই করে নেয়া চাই। প্রশ্ন উঠবে কী যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে, কীভাবে যাচাই-বাছাই করতে হবে, তাদের সম্বন্ধে কী কী জেনে নিতে হবে? এ সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য নিচের লেখাটি পড়ুন।

ওয়াজ-নসীহত, বইপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফেসবুক প্রভৃতি থেকে ধর্মীয় বিষয় শেখার ক্ষেত্রে করণীয়

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আবশ্যক পরিমাণ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরযে আইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ। আবশ্যক পরিমাণ জ্ঞান (যা প্রত্যেকের

www.maktabatulabrar.com

উপর ফরযে আইন) বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয় এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেকের জন্য তার প্রয়োজনীয় লেন-দেন ও কায়-কারবার সম্পর্কিত বিষয়াদির মাসআলা-মাসায়েল ও হুকুম-আহকাম জানা। আবশ্যক পরিমাণের চেয়ে অতিরিক্ত ইল্ম যা অন্যেরও উপকারার্থে প্রয়োজন, তা হাছিল করা ফরযে কেফায়া অর্থাৎ, কতক লোক তা অর্জন করলে সকলের পক্ষ থেকে দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়।

প্রয়োজন পরিমাণ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান অর্জন করা যেহেতু ফরয, তাই কুরআন-হাদীছের জ্ঞানার্জন সতর্কতার সঙ্গেই সম্পন্ন হতে হবে। কারণ ফরয বিষয় অবশ্যই সতর্কতার বিষয়। সতর্কতার সঙ্গে তা না হলে যথাযথভাবে ফরয আদায় না হওয়ায় গোনাহ থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে না। সেই সঙ্গে সু-শিক্ষার পরিবর্তে কু-শিক্ষা, হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী এসে যাওয়ার মাধ্যমে হিতে বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। তাই সতর্কতার সঙ্গেই এই জ্ঞান অর্জনের কাজ নিষ্পন্ন হওয়া চাই। কার থেকে এই জ্ঞান অর্জন করতে হবে, কীভাবে করতে হবে তা সযত্ন সতর্কতার সঙ্গেই নিষ্পন্ন হওয়া চাই। যার থেকে যা কিছু শোনা যাবে, যেখানে যা কিছু লেখা পাওয়া যাবে কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই যদি তা গ্রহণ করা হয়, তাহলে অবশ্যই তা হবে সতর্কতার পরিপন্থী। তাই প্রত্যেক মুসলমানেরই জানা উচিত কার থেকে এবং কীভাবে এই জ্ঞান অর্জন করতে হয় এবং কোন্ পন্থায় জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে কী কী করণীয়। অতএব এ পর্যায়ে দুই ধরনের আলোচনা সামনে আনা প্রয়োজন। ১. ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার পন্থা কি কি ২. সেই পন্থাগুলোতে জ্ঞান অর্জন করার নিয়ম-নীতি ও শর্ত কি কি। এ পর্যায়ে ওয়াজ-নসীহত, বইপত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট, ফেসবুক প্রভৃতি থেকে ধর্মীয় বিষয় শেখার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আলোচনা পেশ করা হবে।

ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার পন্থা প্রধানত দু'টি। **এক.** কোন ব্যক্তি থেকে শুনে শেখা তথা ব্যক্তির ক্লাস বা পাঠদানের আসর থেকে শুনে কিংবা ব্যক্তির ওয়াজ, বয়ান ও বক্তব্য-ভাষণ শুনে শেখা। রেডিও টেলিভিশন থেকে শুনে শেখাও শুনে শেখার অন্তর্ভুক্ত। ক্যাসেট বা সিডি

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

থেকেও শেখাও এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। **দুই.** কোন ব্যক্তির লেখা পাঠ করে শেখা তথা কোন ব্যক্তির লেখা বই-পুস্তক থেকে শেখা। পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার, বিবৃতি, মতামত, মন্তব্য, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি থেকে শেখাও এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির লেখা থেকে শেখাও এ পর্যায়েরই অন্তর্ভুক্ত। সংক্ষেপে বলা যায়, ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার পন্থা প্রধানত দু'টি। যথা:– ব্যক্তি থেকে শেখা, কিতাব-পত্র থেকে শেখা।

যে কেউ উপরোক্ত পন্থাদ্বয়ের যে পন্থায়ই ধর্মীয় বিষয় শিখতে চায় তার জন্য কিছু নিয়ম-নীতি ও শর্ত রয়েছে। অবলীলায় যে কারও কথা শুনে কিংবা যে কারও লেখা পাঠ করে ধর্মীয় বিষয় শেখা বিহিত নয়। তাতে সু-শিক্ষার পরিবর্তে কু-শিক্ষা এসে যেতে পারে, হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী এসে যেতে পারে। তদুপরি তাতে ফরয দায়িত্ব যথাযথভাবে নিষ্পন্ন না হওয়ায় ফরয তরকের গোনাহ থেকেও নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে না, যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই সু-শিক্ষার স্বার্থে, কু-শিক্ষা থেকে রক্ষার পাওয়ার মানসে এবং গোনাহ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার উদ্দেশ্যে কোন্ পন্থায় ধর্মীয় বিষয় শেখার কি নিয়ম-নীতি ও শর্ত সে সম্বন্ধে জানা আবশ্যক। নিম্নে কুরআন-হাদীছের আলোকে শিক্ষা অর্জনের প্রধান দুটো উপায় তথা ব্যক্তি থেকে শেখা ও কিতাব-পত্র থেকে শেখার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী সম্বন্ধে কিছু আলোচনা পেশ করা হল।

*** ব্যক্তি থেকে শেখা প্রসঙ্গে**

কোন ব্যক্তি থেকে শেখার অর্থ হল তাকে উস্তাদ বানানো। আর কাউকে উস্তাদ বানানোর পূর্বে তার সম্বন্ধে অন্তত তিনটা বিষয় আগেই জেনে নিতে হবে। সে তিনটা বিষয় হল–

১. তিনি হকপন্থী কি না, তার আকীদা-বিশ্বাস সহীহ কি না, অর্থাৎ, তিনি সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না তা যাচাই করে নিতে হবে। বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী কোনো লোককে উস্তাদ বানানো যায় না। মুসলিম শরীফের মুকাদ্দামায় (ভূমিকা অংশে) রেওয়ায়েত আছে– হযরত ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন,

www.maktabatulabrar.com

﴿إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانْظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ.﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় (কুরআন-হাদীছের) এই জ্ঞান দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কিত বিষয়। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন গ্রহণ করছো (অর্থাৎ, কার থেকে দ্বীনী ইল্ম গ্রহণ করছো) তা যাচাই করে নিয়ো। (মুসলিম)

২. তিনি ভাল জাননেওয়ালা তথা যোগ্য আলেম কি না। যদি আলেম না হয়ে থাকেন তাহলে কোন যোগ্য আলেমের সাহচর্যে থেকে ধর্ম শিক্ষা করে ধর্মীয় শিক্ষার বিশুদ্ধ মানে উত্তীর্ণ হয়েছেন কি না– এ বিষয়টা যাচাই করে নিতে হবে। যিনি আলেম নন বা ধর্মীয় শিক্ষার বিশুদ্ধ মানে উত্তীর্ণ নন, এমন লোক থেকে কিছু শেখা হলে অজ্ঞ লোক থেকে শিখলে যা হয় তা-ই হবে। অজ্ঞ লোক নিজেও বিভ্রান্ত, অন্যরাও তার দ্বারা বিভ্রান্ত হয়। এরূপ অযোগ্য লোককে উস্তাদ বানানোর নিষেধাজ্ঞা বুঝে আসে বোখারী শরীফের নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

«إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنْ الْعِبَادِ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُءُوسًا جُهَّالًا فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا.» (صحيح البخاري برقم ١٠٠)

অর্থাৎ, আল্লাহ বান্দাদের অন্তর থেকে ইল্ম ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলম তুলে নিবেন না, বরং আলেমদের তুলে নেয়ার মাধ্যমে ইল্মকে তুলে নিবেন। তারপর যখন কোনো আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না, লোকেরা অজ্ঞ লোকদের ধর্মীয় গুরু বানাবে। তাদের কাছে ধর্মীয় বিষয় জানতে চাইবে। তারা সুষ্ঠু জ্ঞান ছাড়াই সমাধান বলে দিবে। ফলে তারা তো বিভ্রান্তিতে রয়েছেই অন্যদেরও বিভ্রান্ত করবে। (বোখারী, হাদীছ নং ১০০)

৩. তিনি ইল্ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। আদর্শবান ব্যক্তি না হলে তার বক্তব্যে কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যার প্রতিফলন না-ও ঘটতে পারে। এ জাতীয় ব্যক্তিদের অনেকে নিজেদের বে-আমলী ও আদর্শহীনতাকে ঢাকা দিয়েই কুরআন-

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন– ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। আমরাও নিত্য তা প্রত্যক্ষ করে থাকি। তাই আমলহীন ব্যক্তির বক্তব্য থেকে ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা নিরাপদ নয়। তাছাড়া তা'লীম বা শিক্ষাদানের সঙ্গে শিক্ষকের নৈতিক চরিত্র তথা তারবিয়াত, তায্‌কিয়া ও আদর্শস্থানীয় হওয়ার বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। শিক্ষকের মধ্যেই যদি শিক্ষার প্রতিফলনের অভাব থাকে তাহলে শিক্ষার্থীর উপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়াটা অনিবার্য। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দায়িত্বের প্রতি ইঙ্গিত করতে গিয়ে তাই আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে তা'লীম ও তায্‌কিয়া বিষয় দু'টোকে পাশাপাশি উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ.﴾

অর্থাৎ, তিনি (রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং তাদের তায্‌কিয়া (পরিশুদ্ধি) করবেন। (সূরা বাকারা: ১২৯)

বলা বাহুল্য, অন্যদের তাযকিয়া তথা পরিশুদ্ধি যখন করবেন, নিজের মধ্যেও অবশ্যই পরিশুদ্ধি থাকবে। কেউ অন্যদের ভাল হওয়ার জন্য বলবে আর নিজে ভাল হবে না, তার বিরুদ্ধেও কুরআনে কারীমে বক্তব্য এসেছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা মানুষকে নেক কাজের কথা বল আর নিজেদেরকে ভুলে যাও? (সূরা বাকারা: ৪৪)

এ আয়াতে যারা অন্যদেরকে ওয়াজ-নসীহত করবে বা শিক্ষা দিবে তাদেরকে ঐ বিষয়ের আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং যারা এরূপ করবে না তাদের শাসানো হয়েছে। তাহলে এ আয়াত থেকেও বুঝা গেল, শিক্ষকের ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি হওয়া চাই।

আমল ও নৈতিক চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ হল ইল্‌ম বা শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের প্রায়োগিক দিক। আর মনস্তাত্ত্বিকভাবেই শিক্ষার্থী শিক্ষালব্ধ

www.maktabatulabrar.com

জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক উপযোগিতা দেখতে চায়। এ বিষয়টিও তার প্রেষণার উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে থাকে। আর শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতার ব্যবহারিক উপযোগিতা দেখার প্রথম ক্ষেত্র হল শিক্ষকের বাস্তব ও ব্যবহারিক জীবন। তাই শিক্ষকের ব্যবহারিক জীবনে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রয়োগ না দেখলে শিক্ষার্থীর প্রেষণা বলবতি হয় না। অধিকন্তু ক্ষেত্র বিশেষে শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষণীয় বিষয়ের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে বিরূপ প্রতিচ্ছায়া পড়তে পারে। তাই শিক্ষকের ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি হওয়া আবশ্যক।

"ব্যক্তি থেকে শেখা" শিরোনামে এ পর্যন্ত কাউকে উস্তাদ বানানোর পূর্বে তার সম্বন্ধে অন্তত যে তিনটা বিষয় আগেই জেনে নিতে হয় যাচাই করে নিতে হয় সে সম্বন্ধে বিস্তারিত প্রমাণ-ভিত্তিক আলোচনা পেশ করা হল। সংক্ষেপে– কোন ব্যক্তি থেকে শেখার আগে ঐ ব্যক্তি সম্বন্ধে তিনটা বিষয় জেনে নিতে হয়। যথা:– ১. তিনি সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না। ২. তিনি ভাল জাননেওয়ালা কি না। ৩. তিনি ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। নিজের পক্ষে এসব বিষয় যাচাই করা সম্ভব না হলে এ ব্যাপারে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সহযোগিতা নিতে হবে।

অতএব, কোন ব্যক্তির ক্লাস বা পাঠদান থেকে কিংবা কারও ওয়াজ, বয়ান ও বক্তব্য-ভাষণ শুনে শেখার পূর্বে তাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়গুলো জেনে বুঝে নিন। রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সিডির বক্তাদের সম্বন্ধেও সেগুলো ভালভাবে জেনে বুঝে নিন। আপনি যদি তাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়াবলী তাহকীক-তদন্ত ছাড়াই, যথাযথভাবে না জেনেই তাদের কথা অবলীলায় গ্রহণ করেন তাহলে আপনার জন্য তা ভালোর পরিবর্তে মন্দের তথা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব আপনার হেদায়েত লাভ কিংবা হেদায়েত রক্ষার স্বার্থে অবলীলায় কোন ব্যক্তিকে বা রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সিডির বক্তাদেরকে উস্তাদ বানাবেন না, তথা তাদের কথা গ্রহণ করবেন না।

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

এ পর্যায়ে উল্লেখ্য যে, আজকাল বাজারে গ্রহণযোগ্য অগ্রহণযোগ্য নির্বিশেষে সব ধরনের ওয়ায়েজ ও বক্তাদের ক্যাসেট বা সিডি পাওয়া যায়, আর দেখা যায় মানুষ কোনো বাছ-বিছার ছাড়াই এসব ক্যাসেট ও সিডি ক্রয় করে আনে এবং তা থেকে শেখা শুরু করে দেয়। অনেক মানুষ দোকান থেকে মোবাইলে ওয়াজ লোড করে আনে এবং অবলীলায় তা শুনে তা থেকে শেখা শুরু করে দেয়। কিংবা কোথাও ওয়াজ-মাহফিল হচ্ছে জানল, ব্যস সে মাহফিলে গিয়ে কথা শুনল, গ্রহণ করল, আমল শুরু করে দিল। এসব ক্ষেত্রে যাচাই করা হয় না কার বক্তব্যের কাসেট, কার বক্তব্যের সিডি, কার ওয়াজ, কার বয়ান, তিনি আদৌ মানোত্তীর্ণ কি না, গ্রহণযোগ্য কি না।

রেডিও টেলিভিশনে যারা ধর্ম সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন তাদের সম্বন্ধেও অনেক শ্রোতা উপরোক্ত তিনটা শর্তের আলোকে তারা উত্তীর্ণ কি না তা পরখ করে নেন না। পরখ করা ছাড়াই অবলীলায় তাদের কথা গ্রহণ করেন। রেডিও টেলিভিশন কর্তৃপক্ষও প্রায়শই ধর্ম সম্বন্ধে আলোচক নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ নীতির আদৌ তোয়াক্কা করেন না। তারা সযত্নে যেগুলো দেখেন তা হল আলোচকের চেহারা ফটোজেনিক কি না, তাকে দেখতে স্মার্ট লাগে কি না, তার গলার ভয়েস সুন্দর কি না, উপস্থাপন আকর্ষণীয় কি না ইত্যাদি। এ ছাড়া গ্রুপিং লবিং ইত্যাদি কতকিছুর ভিত্তিতে যে তারা লোক নির্বাচন করেন তা তারাই ভাল জানেন। তারা এ বিষয়গুলো দেখুক তাতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যদের তেমন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু মানুষের হেদায়েত বা গোমরাহীর সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়, সঠিক বা ভুল পরিবেশনের সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়, হক না-হকের সাথে সম্পর্কিত যে বিষয়– সে বিষয়গুলো তারা চিন্তায় না রেখেই অবলীলায় ধর্মীয় বিষয়ের আলোচক নির্ধারণ করবেন, এভাবে অনেক ক্ষেত্রে হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীর বিস্তার ঘটাবেন, তাতে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও বিশুদ্ধ পন্থার বিস্তারপ্রয়াসী মুসলমানদের আপত্তি থাকাই স্বাভাবিক। আমরা রেডিও, টেলিভিশন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে বিবেচনায় রাখার অনুরোধ জানাচ্ছি।

www.maktabatulabrar.com

এখানে টেলিভিশন কর্তৃপক্ষ ধর্ম সম্বন্ধে আলোচক নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রায়শই যে নীতি অবলম্বন করে থাকেন সে সম্বন্ধে কিছু কথা বলা হল। এ পর্যায়ে রেডিও-টেলিভিশনের শ্রোতা দর্শকদের সম্বন্ধেও কিছু কথা বলতে চাই। রেডিও, টেলিভিশনের অনেক শ্রোতা দর্শকের অবস্থা হল তারা বক্তার বাহারি টুপি, বিশাল আকারের পাগড়ি, জুব্বা, আসকান, চেহারার আকর্ষণ, নামের শুরুতে উপাধির বহর, টাইটেল ইত্যাদি দেখে-শুনে মনে করেন বাপরে বাপ সাংঘাতিক বড় আলেম, কত ডিগ্রী, কী নূরানী চেহারা! এভাবে তারা মুগ্ধ হয়ে পড়েন, ভক্তিতে বিগলিত হয়ে পড়েন। তারা আরও মনে করেন ভাল আলেম না হলে কি এসব লোক রেডিও, টেলিভিশনে চান্স পেতেন? এই শ্রেণীর শ্রোতা দর্শকদের উদ্দেশে বলছি, বাহারি টুপি, পাগড়ি, জুব্বা, আসকান, চেহারার আকর্ষণ– এগুলো ভাল আলেম হওয়া দূরের কথা আদৌ আলেম হওয়ারই দলীল নয়। রেডিও, টেলিভিশনে চান্স পাওয়াও যোগ্য আলেম হওয়ার দলীল নয়। রেডিও, টেলিভিশনে বক্তা নির্বাচিত হওয়ার কিছু সূত্র তো পূর্বে উল্লেখও করা হয়েছে। আর উপাধি ডিগ্রীর প্রকৃত বাস্তবতা কি তারা যাচাই করেছেন? না করে থাকলে কীভাবে উপাধি ডিগ্রীর বহর দেখে নুয়ে পড়েন?

কেউ যেন ভুল না বোঝেন তাই এখানে উল্লেখ করা সংগত মনে হচ্ছে যে, রেডিও, টেলিভিশনের পর্দায় যারা আসেন তাদের কেউই যোগ্য নয়, গ্রহণযোগ্য নয় তা আমাদের বলা উদ্দেশ্য নয়। হয়তো তাদের মধ্যে অনেকেই যোগ্য ও গ্রহণযোগ্য প্রমাণিত হবেন। আমরা যা বলছি তা হল রেডিও, টেলিভিশনের বক্তাদের কথা গ্রহণ করার পূর্বে তাদের সম্বন্ধে জেনে নিন তারা যোগ্য কি না, গ্রহণযোগ্য কি না, অর্থাৎ, তারা সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না, তারা ভাল জাননেওয়ালা কি না, তারা ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। এসব বিষয় যাচাই-বাছাই না করে অবলীলায় তাদের কথা গ্রহণ করবেন না।

যাহোক কোন বক্তা, ওয়ায়েজ, ভাষণদাতা, রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সিডির বক্তা প্রমুখদের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে তাদের

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ব্যাপারে উপরোক্ত তিনটা বিষয় ভালভাবে জেনে বুঝে নিন। তাহকীক-তদন্ত এবং যথাযথভাবে বাছ-বিচারের পর কোন বক্তা, ওয়ায়েজ, ভাষণদাতা কিংবা রেডিও, টেলিভিশন, ক্যাসেট, সিডির বক্তাগণ উস্তাদ বানানোর যোগ্য বিবেচিত হলেই তাদেরকে উস্তাদ বানাতে পারেন এবং সেমতে তাদের কথা শুনে শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারেন, অন্যথায় নয়।

"ব্যক্তি থেকে শেখা" পর্যায়ের এতক্ষণের আলোচনার সারকথা হিসাবে বলা যায়,

- অবলীলায় কোন ব্যক্তিকে উস্তাদ বানাবেন না।
- অবলীলায় যে কারও ধর্মবিষয়ক ভাষণ-বক্তব্য শুনবেন না।
- অবলীলায় রেডিও, টেলিভিশনকে উস্তাদ বানাবেন না।
- অবলীলায় ক্যাসেট, সিডিকে উস্তাদ বানাবেন না।
- অবলীলায় আপনার মোবাইলে যে কারও ওয়াজ, বয়ান লোড করে তা শুনবেন না।
- অবলীলায় ওয়াজ মাহফিলের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন না।
  এসব কিছুর পূর্বে সর্বাগ্রে যাচাই-বাছাইয়ের কাজটা সেরে নিবেন।

*** কিতাব-পত্র থেকে শেখা প্রসঙ্গে**

কারও লিখিত কিতাব-পত্র পাঠ করে শেখার অর্থও উক্ত কিতাব-পত্রের লেখককে উস্তাদ বানানো। অতএব পূর্বে কাউকে উস্তাদ বানানোর আগে তার সম্বন্ধে যে তিনটা বিষয় জেনে নেয়ার কথা বলা হয়েছে, এক্ষেত্রেও সেগুলো প্রযোজ্য। অর্থাৎ, কারও লিখিত কিতাব-পত্র পাঠ করে ধর্মীয় বিষয় শিখতে হলে তার লেখক সম্বন্ধে তিনটা বিষয় আগেই জেনে নিতে হবে। বিষয় তিনটা একটু ভিন্নভাবে আবার উল্লেখ করার প্রয়োজন বোধ করছি।

১. তিনি হকপন্থী কি না, তার আকীদা-বিশ্বাস সহীহ কি না, অর্থাৎ, তিনি সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না তা জেনে নিতে হবে। কোন বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী লোককে উস্তাদ বানানো যাবে না। অতএব কোন বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী লেখকের লেখাও পাঠ করা যাবে না। বিজ্ঞ আলেম নন– এমন ব্যক্তির জন্য কোন বাতিলপন্থী ও বাতিল মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের লিখিত বা প্রচারিত বই-পত্র পাঠ করা ঠিক নয়। বিজ্ঞ আলেম নন– এরূপ ব্যক্তিদের জন্য বিধর্মীদের কিতাব যেমন: তাওরাত, ইঞ্জীল, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি পাঠ করাও জায়েয নয়। অনেকে যুক্তি দিয়ে থাকেন, আমরা পাঠ করে ভালটি গ্রহণ করব মন্দটা গ্রহণ করব না, তাহলে কী অসুবিধা? এ যুক্তি এজন্য গ্রহণযোগ্য নয় যে, ভাল/মন্দ সঠিকভাবে বিচার করার মত পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাব থাকায় তারা হয়ত মন্দটাকেই ভাল ভেবে গ্রহণ করে বিভ্রান্তি ও গুমরাহী-র শিকার হয়ে পড়বেন।

২. তিনি ভাল জাননেওয়ালা তথা যোগ্য আলেম কি না। যদি আলেম না হয়ে থাকেন তাহলে তিনি কোন যোগ্য আলেমের সাহচর্যে থেকে লিখেছেন কি না বা লিখে কোন যোগ্য আলেম দ্বারা সত্যিকার অর্থে সম্পাদনা বা যাচাই-বাছাই করিয়ে নিয়েছেন কি না।

৩. জেনে নিতে হবে তিনি ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। আদর্শবান ব্যক্তি না হলে তার লেখায় কুরআন-সুন্নাহর সঠিক ব্যাখ্যার প্রতিফলন না-ও ঘটতে পারে। এ জাতীয় লেখকদের অনেকে নিজেদের বে-আমলী ও আদর্শহীনতাকে ঢাকা দিয়েই কুরআন-সুন্নাহর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়ে থাকেন– ইতিহাসে তার বহু প্রমাণ রয়েছে। আমরাও নিত্য এটা প্রত্যক্ষ করে থাকি। তাই আমলহীন লেখকের লেখা থেকে ধর্মীয় বিষয় শেখা নিরাপদ নয়।

"কিতাব-পত্র থেকে শেখা" শিরোনামে এ পর্যন্ত কারও লেখা কিতাব-পত্র পাঠ করার পূর্বে তার সম্বন্ধে অন্তত যে তিনটা বিষয় আগেই জেনে নিতে হয়, যাচাই করে নিতে হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল। সংক্ষেপে– কোন লেখকের লেখা থেকে শেখার আগে

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

ঐ লেখক সম্বন্ধে তিনটা বিষয় জেনে নিতে হয়। যথা:- ১. তিনি সঠিক চিন্তাধারার লোক কি না। ২. তিনি ভাল জাননেওয়ালা কি না। ৩. তিনি ইল্‌ম অনুযায়ী আমলের অধিকারী তথা আদর্শবান ব্যক্তি কি না। নিজের পক্ষে এসব বিষয় যাচাই করা সম্ভব না হলে এ ব্যাপারে সঠিক জাননেওয়ালাদের সহযোগিতা নিন, বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সহযোগিতা নিন।

যাহোক, কোন ব্যক্তির লেখা বই-পুস্তক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার, বিবৃতি, মতামত, মন্তব্য, লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার পূর্বে উপরোক্ত তিনটা বিষয় ভালভাবে জেনে বুঝে নিন। ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদিতে যারা ধর্মীয় বিষয়ে লেখেন তাদের সম্বন্ধেও উপরোক্ত বিষয়গুলো ভালভাবে জেনে বুঝে নিন। আপনি যদি তাদের সম্বন্ধে উপরোক্ত বিষয়াবলী তাহকীক-তদন্ত ছাড়াই, যথাযথভাবে না জেনেই তাদের লেখা অবলীলায় গ্রহণ করেন তাহলে আপনার জন্য তা ভালোর পরিবর্তে মন্দের তথা হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব আপনার হেদায়েত লাভ কিংবা হেদায়েত রক্ষার স্বার্থে অবলীলায় যেকোনো গ্রন্থের লেখক কিংবা ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির লেখদেরকে উস্তাদ বানাবেন না। বিনা বাছ-বিচারে তাদের লেখার প্রতি আস্থা স্থাপন করবেন না।

এখানে একথাও উল্লেখ্য যে, ইসলামের শত্রুরাও ইসলাম সম্বন্ধে বিভ্রান্তি সৃষ্টির জন্য তাদের লোকদের দিয়ে ইসলামের নামে ইসলাম সম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়ে থাকে। ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইটে, ফেসবুকে, টুইটারেও ইসলামের শত্রু ও ইসলাম বিদ্বেষীরা এরূপ অপপ্রয়াস নিয়ে থাকে, যা আমাদের সকলেরই কমবেশ জানা আছে। তাই অবলীলায় যেকোনো লেখা গ্রহণ করবেন না। তাহকীক-তদন্ত এবং যথাযথভাবে বাছ-বিচারের পর কোন গ্রন্থের লেখক এবং ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদির লেখকরা উস্তাদ বানানোর যোগ্য বিবেচিত

www.maktabatulabrar.com

হলেই তাদেরকে উস্তাদ বানাতে পারেন এবং সেমতে তাদের লেখা পাঠ করে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের উদ্যোগ নিতে পারেন, অন্যথায় নয়।

আজকাল ইন্টারনেট, ফেসবুক ইত্যাদি থেকে বিভিন্ন তথ্য আহরণ সহজ বিধায় ব্যাপকহারে মানুষ এগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে। এটা একদিকে খুশির বিষয় এ জন্য যে, জ্ঞান লাভ সহজতর হয়েছে, ফলে ব্যাপক মানুষ শেখার সুযোগ পাচ্ছে, শিখছে। আবার অন্যদিকে অখুশি এবং আশংকারও বিষয় এ কারণে যে, অনেকেই কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই অবলীলায় বিভিন্ন ওয়েব সাইট বা ফেসবুকে যা পাচ্ছে তাতে আস্থা স্থাপন করে বিভ্রান্তির শিকার হচ্ছে বা হওয়ার উপক্রম হচ্ছে। অনেকেরই অবস্থা এমন- একটা কিছু সম্বন্ধে জানতে মনে চাইল, ব্যস সংশ্লিষ্ট শব্দটা লিখে সার্চ দিয়ে যা বের হল তা-ই গোগ্রাসে গিলে নিল। সংশ্লিষ্ট তথ্য বা তত্ত্ব কে বা কারা পরিবেশন করেছে, তারা আদৌ গ্রহণযোগ্য কি না, তারা খাদ্যের নামে যা পরিবেশন করেছে তা আসলেই খাদ্য না অখাদ্য- এ বিষয়গুলো ভাববার ও বাছ-বিচার করার কোনো প্রয়োজনই তারা অনুভব করে না। বাজার থেকে খাদ্য-খাবার ক্রয় করতে গিয়েও তো আমরা খাঁটি না ভেজাল তা নিয়ে সামান্য হলেও একটু ভেবে নেই, যথাসাধ্য যাচাই-বাছাই করে তারপর ক্রয় করি। ধর্মীয় বিষয়ের জ্ঞান কি এতই হেলাফেলার হয়ে গেল যে, তা নিয়ে মোটেই কিছু ভাববার নেই, মোটেই বাছ-বিচারের প্রয়োজন নেই? তাছাড়া বিভিন্ন মাসআলা-মাসায়েলের ক্ষেত্রে মাযহাবগত কিছু পার্থক্যও রয়েছে। আপনি যার লেখা পড়ছেন, তিনি ভিন্ন মাযহাবের কি না, তিনি ভিন্ন মতবাদের কি না, তা-ও তো যাচাইয়ের প্রয়োজন? একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, তিনি যে মাযহাবেরই হোন ধর্মের কথা হলেই আমরা তা গ্রহণ করতে পারি। এরূপ মনে করা ঠিক নয় এ কারণে যে, তাহলে সেটা হবে যে মাযহাবের যেটা পছন্দ সেটা গ্রহণ করার নীতি, সেটা হল খাহেশাত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

অনুযায়ী চলার নীতি, যা গ্রহণযোগ্য নয়, গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। সংখ্যাগরিষ্ট উলামায়ে কেরামের ঐক্যমতে মাযহাব মানা জরুরি এবং যে মাযহাবই হোক একটিরই অনুসরণ করতে হবে, একেক বিষয়ে একেক মাযহাবের অনুসরণ করা যাবে না। তাই কারও লেখা থেকে কিছু গ্রহণ করতে হলে তিনি আপনার মাযহাবের কি না, আপনার মতবাদের কি না তা-ও যাচাই করার প্রয়োজন। এভাবে যাচাই-বাছাইয়ের প্রয়োজন বহুবিধ কারণে। এসব প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে কোনোরূপ যাচাই-বাছাই ছাড়াই যে কারও লেখা অবলীলায় গ্রহণ করলে আপনার সঠিক পথ প্রাপ্তির নিশ্চয়তা কিংবা সঠিক পথে টিকে থাকার নিশ্চয়তা কীভাবে লাভ হবে?

কেউ যেন ভুল না বোঝেন তাই পরিষ্কার করে বলছি, ইন্টারনেটের ওয়েব সাইট, ফেসবুক, টুইটার ইত্যাদি সবকিছুকে সর্বতোভাবে বর্জন করুন তা বলছি না। আমরা যা বলছি তা হল এগুলো থেকে অবলীলায় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করবেন না, বাছ-বিচার ছাড়া গ্রহণ করবেন না। এগুলো থেকে শিখতে চাইলে আগে যাচাই-বাছাইয়ের পর্বটি সেরে নিন। এগুলো সর্বতোভাবে বর্জনের কথা বলে আমরা যেমন প্রান্তিকতার প্রবক্তা হতে চাই না, তেমনি অবলীলায় এগুলো থেকে সবকিছু গ্রহণ করার মত লাগামহীনতারও সমর্থনকারী হতে চাই না।

"কিতাব-পত্র থেকে শেখা" পর্যায়ের এতক্ষণের আলোচনার সারকথা হিসাবে বলা যায়,

- অবলীলায় কোন গ্রন্থকে উস্তাদ বানাবেন না।
- অবলীলায় ইন্টারনেট, ফেসবুক, টুইটারকে উস্তাদ বানাবেন না।
- অবলীলায় যেকোনো লেখা পড়ে তার প্রতি আস্থা আনবেন না।
- অবলীলায় লিফলেট, প্রচারপত্র ইত্যাদির বক্তব্যে বিশ্বাস স্থাপন করবেন না।

www.maktabatulabrar.com

এসব কিছু করার পূর্বে সর্বাগ্রে যাচাই-বাছাইয়ের কাজটা সেরে নিবেন।

সর্বশেষে সংক্ষেপে বলতে চাই, ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে অসচেতন নয় সচেতন থাকুন। ধর্মীয় শিক্ষার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী মেনে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করুন, সঠিক পন্থায় থাকবেন। যাচাই-বাছাই পূর্বক শিক্ষা গ্রহণ করুন, নিরাপদ থাকবেন।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সবকিছু সঠিকভাবে বুঝার ও মানার তাওফীক দান করুন। আমীন!

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

গ্রন্থ সমাপ্ত

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

গ্রন্থপঞ্জী

গ্রন্থাদির নাম	লেখকগণের নাম
القران الكريم	
الصحيح البخاري	الإمام البخاري
الصحيح للمسلم	الإمام مسلم
السنن لأبي داود	الإمام أبو داود
السنن للترمذي	الإمام الترمذي
السنن لابن ماجة	الإمام ابن ماجة
تهذيب سنن أبي داود	ابن القيم الجوزية
المصنف لابن أبي شيبة	ابن أبي شيبة
المستدرك علي الصحيحين	الحاكم النيسابوري
المسند لأحمد	الإمام أحمد بن حنبل
المعجم الكبير	الطبراني
المعجم الأوسط	الطبراني
المسند لأبي يعلى	أبو يعلى
مسند البزار	الإمام البزار
سنن الدارمي	الإمام الدارمي
شعب الإيمان	الإمام البيهقي
السنن الكبري	الإمام البيهقي
كتاب الآداب	الإمام البيهقي
المطالب العالية	حبيب الرحمن الأعظمي
مجمع الزوائد	نور الدين الهيثمي

www.maktabatulabrar.com

التفسير الكبير	الإمام الرازي
تفسير معارف القران	مفتي محمد شفيع
قيمة الزمن عند العلماء	الشيخ عبد الفتاح أبو غده
فيض القدير	المناوي
تحفة الأحوذي	عبد الرحمن المباركفوري
شرح النووي علي مسلم	العلامة النووي
فتح الباري	الحافظ ابن حجر العسقلاني
المقاصد الحسنة	العلامة السخاوي
مختصر كتاب الاعتصام	الشاطبي
الإتقان في علوم القران	جلال الدين السيوطي
القول البين الأظهر في الدعوة	عبد العزيز بن عبد الله الراجحي
যদি জীবন গড়তে চান	মাওঃ মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

লেখকের আরও কয়েকটি গ্রন্থ

১. আহকামে যিন্দেগী

জীবনের সব ধরনের মাসআলা-মাসায়েলের জন্য। নারী পুরুষ সকলের জন্য। নির্ভরযোগ্য ফেকাহ ও ফতুয়ার কিতাব থেকে সংকলিত এবং সর্বস্তরের উলামা ও সাধারণ লোকদের নিকট গ্রহণযোগ্য সুবিদিত একখানি অনবদ্য গ্রন্থ।

২. ফাযায়েলে যিন্দেগী

নির্ভরযোগ্য হাদীছ ও কুরআনের আলোকে রচিত জীবনের সব বিষয়ের ফাযায়েল সম্বলিত। ঘরে মসজিদে ও মজলিসে তালীমের উপযোগী। ফাযায়েল অধ্যায়ে গ্রহণযোগ্য নয় এমন কোন হাদীছ এ গ্রন্থে আনা হয়নি।

৩. বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড

এ গ্রন্থে একজন ইমামের জন্য সারা বৎসর নিয়মিত বিষয়াদিসহ ইসলামের যাবতীয় বিষয় নিয়ে বয়ান করার মত সব ধরনের বয়ান সন্নিবেশিত হয়েছে। প্রত্যেকটা বয়ানের সাথে রয়েছে এক একটি আরবী খুতবা, যেটি পাঠ করা যেতে পারবে। ওয়ায়েজ ও মুবালিগগণও এ গ্রন্থ থেকে সহযোগিতা নিতে পারবেন। সাধারণ লোকেরাও এ গ্রন্থ থেকে উপকৃত হতে পারবেন।

৪. আহকামুন নিছা

নেককার নারীদের কাহিনী, নারীদের উপযোগী ওয়াজ-নসীহত ও জরুরী মাসায়েল সম্বলিত। গ্রন্থখানি বিশেষভাবে নারীদের তালীমের মজলিসে তালীমের উদ্দেশ্যে রচিত এবং উপকারী প্রমাণিত।

৫. ফিকহুন নিছা

নারী জীবনের সব ধরনের মাসআলা-মাসায়েল জানার জন্য। নারীদের সিলেবাস রূপে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠদানের জন্য। বিশেষ বিশেষ মাসআলার দলীল জানার জন্য। এবং মীরাছ, পর্দা, বহুবিবাহ, তারাবীহ কয় রাকআত ইত্যাদি যেসব বিষয়ে বিরুদ্ধবাদীদের সমালোচনা রয়েছে, সেগুলোর দলীল ও যুক্তিভিত্তিক জবাব জানার জন্য। শিক্ষিতা মহিলাদের জন্য বিশেষ উপযোগী এক অনবদ্য গ্রন্থ।

৬. আহকামে হজ্জ

এ গ্রন্থে হজ্জ, উমরা ও যিয়ারতের মাসায়েল বর্তমান যুগের পেক্ষাপটে আলোচনা করা হয়েছে। হজ্জ ও যিয়ারতের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহের সর্বশেষ অবস্থার বর্ণনা রয়েছে। সে স্থানসমূহের মানচিত্র এবং ছবিও সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে।

www.maktabatulabrar.com

যারা ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যের পীপাসু গ্রন্থটি তাদের পীপাসা নিবরারণ করবে ইনশা আল্লাহ।

৭. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ

এ গ্রন্থে ইসলামের যাবতীয় সহীহ আকীদা এবং এসব আকীদা থেকে বিচ্যুত দেশী বিদেশী, নতুন পুরাতন সব ধরনের সমুদয় বাতিল ফিরকা ও ভ্রান্ত মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা-পর্যালোচনা পেশ করা হয়েছে।

৮. ইসলামী মনোবিজ্ঞান

এ গ্রন্থেই সর্বপ্রথম ইসলামী মনোবিজ্ঞানকে শাস্ত্র আকারে রূপ দেয়া হয়েছে। এ গ্রন্থে ইসলামী বিধি-বিধান ও নীতিমালার মনোবৈজ্ঞানিক কার্যকারিতা এবং ইসলামে মনোবিজ্ঞানের অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ও বর্ণনা সন্নিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থটি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিলেবাসভুক্ত।

৯. কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র

এটি এক পৃষ্ঠার মানচিত্রাবলী। এতে কুরআন, হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসে বর্ণিত স্থানসমূহের অবস্থান, বর্তমান ও প্রাচীন নাম এবং বর্তমান ও প্রাচীন সীমানা চিহ্নিত করে দেখানো হয়েছে।

১০. ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ

এতে লেখালেখির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সব ধরনের বিষয়ের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। মৌলিক রচনার নিয়ম-নীতি ও অনুবাদের নিয়ম-নীতি সম্পর্কে দিক নির্দেশনামূলক বিশদ আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে। বর্ণের নাম ও উচ্চারণ থেকে শুরু করে ভাষা, ব্যাকরণ, সাহিত্য সমালোচনা, কবিতা ও ছড়া রচনার নিয়ম-নীতি, সংবাদ, কলাম ও ফিচার লেখা এবং বাংলা ভাষার অলংকার ইত্যাদি সব বিষয়ের আলোচনা এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বাংলা ভাষায় বহুল ব্যবহৃত শব্দাবলীর উচ্চারণ সম্বলিত একটি তালিকাও সংযুক্ত করা হয়েছে। আর শেষে রয়েছে ভাষা ও সাহিত্য শিখতে আগ্রহীদের জন্য এবং তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক সিলেবাস।

১১. যদি জীবন গড়তে চান

শিশু-কিশোর, যুবক ও বৃদ্ধদের জীবন গড়ার পদ্ধতি। সবশ্রেণীর লোকদের সুখী-সমৃদ্ধ, টেনশনমুক্ত, নিরাপদ, বরকতময় ও নূরানী জীবন গড়ার পদ্ধতি। এটি সকলের জন্য প্রয়োজনীয় এক অনবদ্ধ গ্রন্থ।

১২. চশমার আয়না যেমন

পৃথিবীতে মতবাদ ও মত মতান্তরের অন্ত নেই। কোন একটা বিষয় নিয়ে বিরোধের অন্ত নেই। এই মত বিভিন্নতা বা বিরোধের মূলে রয়েছে কে কোন্ বিষয়কে

Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.

কোন্ অ্যাঙ্গেলে দেখছেন বা কোন্ দৃষ্টিভংগিতে বিচার করছেন সেটা। যার চশমার আয়না যেমন, তিনি সবকিছুকে দেখছেন তেমন। এ বিষয়টার উপরই একটি রম্য রচনার প্রয়াস হল "চশমার আয়না যেমন"।

১৩. কথা সত্য মতলব খারাপ

রম্য রচনায় উগ্র আধুনিকতা এবং সুন্দর সুন্দর কথার মাধ্যমে বদ মতলব সিদ্ধি করা ও প্রতারণা করার অপপ্রয়াসের সমালোচনা।

১৪. তরীকে তালীম

এ পুস্তকটি মাদ্রাসার নেছাবভুক্ত কিতাবাদি শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা এবং শিক্ষাদানের সেই পদ্ধতি অনুসারে পাঠদানের জন্য সহযোগী গ্রন্থসমূহের তালিকা সম্বলিত। পুস্তকটি উর্দূতে রচিত।

১৫. নফ্স ও শয়তানের সাথে মোকাবেলা

নফ্সের যত ধরনের ওয়াছওয়াছা হয়, মনের মধ্যে ঈমান ও ইসলাম সম্বন্ধে এবং ইসলামের বিভিন্ন আমল ও আখলাক সম্বন্ধে যত ধরনের কুট প্রশ্ন ও ওয়াছওয়াছা জাগে এ গ্রন্থে সেসব ওয়াছওয়াছা থেকে উত্তরণের কৌশল এবং সেসব প্রশ্নের প্রশান্তিমূলক জবাব শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

১৬. الاستفادة بشرح سنن ابن ماجه

এটি সুনানে ইবনে মাজা-র এক অনন্য শরাহ। আরবীতে রচিত এ শরাহর বৈশিষ্টসমূহ নিম্নরূপ:

- بيان من أخرج الحديث مُسندا غير ابن ماجة.
- كلام مُوجَزٌ حول أحوال الحديث ورواته.
- شرح المفردات.
- الشرح الإجمالي للحديث لِيُقَرِّب معني الحديثِ وغرضَه ألي الأذهان.
- بيان المباحث المتعلقة للحجيث علي المنهج التدريسي.
- بيان ما يستفاد من الحجيث مُوْجَزًا.
- بيان مطابقةِ الحديث للترجمة.

উল্লেখ্য, শরাহটির বাংলা সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে।

সবরকম যোগাযোগ:
মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

প্রকাশিত হয়েছে মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন রচিত নতুন যুগান্তকরী গ্রন্থ

চিন্তা-চেতনার ভুল

এ গ্রন্থে মৌলিকভাবে যেসব বিষয় জানা যাবে:

- চিন্তা-চেতনা সম্পর্কিত তাত্ত্বিক বিষয়াদি।
- চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার গুরুত্ব।
- চিন্তা-চেতনা দোরস্ত করার উপায়।
- চিন্তা-চেতনার মৌলিক গলদ কি কি তার বিবরণ।
- চিন্তা-চেতনার ভুল কীভাবে মানুষকে বিভ্রান্তির দিকে নিয়ে যায় তার বিবরণ।
- বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশাদার লোকদের বিভিন্ন ভুল চিন্তা-চেতনার বিবরণ।
- ব্যবহারিক জীবনে কোথায় কোথায় চিন্তা-চেতনার ভুল রয়েছে তার বিবরণ।
- ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে কি কি ভুল চিন্তা-চেতনা বিরাজ করছে তার বিবরণ।

www.maktabatulabrar.com
Protected with free version of Visual Watermark. Full version doesn't put this mark.